গল্পমালা

সূচীপত্র

- সহজে কি বড়লোক হওয়া যায়?
- বড়লোক কিসে হয়?
- বানর রাজপুত্র
- পাকা ফলার
- দুঃখীরাম
- ঠাকুরদা
- নরওয়ে দেশের পুরান
- ঠানদিদির বিক্রম
- ঘ্যাঁঘাসুর
- বুদ্ধিমান চাকর
- বেচারাম কেনারাম (নাটক)
- ঝানু চোর চানু
- ছোট ভাই
- কাজির বিচার
- সাতমার পালোয়ান
- কুঁজো আর ভূত
- জাপানী দেবতা
- তিনটি বর
- গুপি গাইন ও বাঘা বাইন
- লাল সুতো আর নীল সুতো
- দুষ্ট দানব
- গল্প নয় সত্য ঘটনা
- জেলা আর সাত ভুত
- বুদ্ধিমান চাকর
- ফিঙে আর কুঁকড়ো
- পণ্ডিতের কথা
- গল্প-সল্প
- তারপর?
- ভুতো আর ঘোঁতো
- গিলফয় সাহেবের অদ্ভুত সমুদ্র-যাত্রা
- খুঁত ধরা ছেলে
- নুতন গল্প
- ভূতের গল্প
- সাগর কেন লোনা?
- ভীতু কামা (জুলু দেশের গল্প)

for more books visit www.rashal.com

সহজে কি বড়লোক হওয়া যায়?

ছেলেবেলায় একটু একগুঁয়েমো প্রায় সকলের থাকে। আমার কথা শুনিয়া কেহ চটিবেন না। চটিলেও বড় একটা অসুবিধা বোধ করিব না। অনেকের অভ্যাস আছে, তাহারা খাঁটি কথা শুনিলে বিরক্ত হয়, কিন্তু কাহাকেও বিরক্ত করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার নিজের দশা দেখিয়াই আমি উপরের কথাগুলিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি।

ছেলেমানুষের একটা রোগ আছে। অনেক কাজ তাহারা আপনা আপনি করিয়া অন্য লোককে বিরক্ত করে, আবার যদি কেহ সেই কাজ তাহাদিগকে করিতে বলিল, অমনি সেই কাজের মিষ্টতাটুকু তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া যায়। দাদা প্রথমে বই পড়িতে শিখিয়াছে, তাহার বইয়ে সন্দর সুন্দর ছবি। পড়িবার সময় দাদা বই খুঁজিয়া পাইত না। আমার চোখে পড়িলেই আমি বইখানা হস্তে করিয়া, কেহ খুঁজিয়া না পায় এমন জায়গায় যাইয়া বসিতাম। শেষে, একদিন শুনিলাম ঐ বইখানা আমারও পড়িতে হইবে। আমার আনন্দের সীমা রহিল না; তখন দৌড়িয়া যাইয়া সঙ্গীদের সকলকে খবরটা দিয়া আসিলাম। পরদিন মাষ্টার আসিলেই বই হাতে করিয়া হাজির। মনে করিলাম, প্রথম ছবিটার কথা আজ হইবে। মাষ্টার প্রথমে ছবির পাতে একটুও আসিলেন না-ছবিশূন্য একটা পাতা উল্টাইয়া, এ, বি, সি, ডি করিয়া কি বলিতে লাগিলেন। তখন হইতে আর সে বই আমার ভাল লাগিল না।।

দাদা স্কুলে যাইবার সময় মাঝে মাঝে আমাকে সঙ্গে করিয়া নিয়া যাইত। দাদাদের মাষ্টার বড় ভালমানুষ। আমি মনে করিলাম, ইস্কুলের সকল মাষ্টারই বুঝি ঐরূপ। বাড়িতে তিন বছর থাকিয়া কয়েকখানা বই শেষ করিলাম। তাহার পর আমাকেও স্কুলে পাঠাইয়া দিল। কয়েক বছর পর বেশ চলিতে চলিতে লাগিলাম; কিন্তু মাষ্টারকে আর তত ভাল লাগে না। কবে বড়মানুষ হইয়া ইস্কুল ছাড়িয়া দিব, এই চিন্তাটা বড় বেশী মনে হইত। তখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি, ইংরেজী যে কয়েকখানা বই পড়িয়াছিলাম, তাহার একখানিতে এক সাহেবের কথা লেখা ছিল। তিনি বাড়ি ছাড়িয়া বিদেশে গিয়াছিলেন, সেখানে অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া শেষটা অনেক টাকা করিয়াছিলেন। সাহেব যে বয়সে ছাড়িয়াছিলেন, মিলাইয়া দেখিলাম আমারও এখন ঠিক সেই বয়স। তবে আর কি চাই! ক্লাসে সতীশের সঙ্গে আমার বড় ভাব; আমি সতীশের সঙ্গে মনের কথাগুলি খুলিয়া বলিয়া ফেলিলাম। কথা শুনিয়া সতীশ যেন আর তার ছোট শরীরটির মধ্যে আঁটে না। তখনই সে লাফাইয়া উঠিল। বোধ হইল বাড়ি হইতে বিদেশে চলিয়া গেলেই বড়লোক হওয়া যাইবে। সতীশ বলিল, 'কালই চল'। কাল চলাটা তত সহজ বোধ হইল না। কিন্তু বেশী দেরী করা হইবে না, সেটা ঠিক করা হইল।

একদিন স্কুল হইতে ছুটি পাইয়া বাড়ি আসিলাম; সতীশও আসিল। বাবা বাড়ি ছিলেন না। বাড়ির অন্যান্য লোকও চুপ করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। চুপি চুপি কয়েকখানা কাপড় দিয়া একটি পুটঁলি বাঁধিলাম। তারপর বাবার বাক্স হইতে কতকগুলি টাকা লইয়া দুজনে চোরের মত বাড়ির বাহির হইলাম। পাছে কেহ আসিয়া ধরে, সেই ভয়ে দুজনে মাঝে মাঝে দৌড়াইতে লাগিলাম। এইরূপে স্যা পর্যন্ত হাঁটিয়া এক বাড়িতে যাইয়া উঠিলাম।

সেই বাড়ির কর্তা আমাদের অবস্থা দেখিয়া বড় দুঃখিত হইলেন। আমাদের সম্বন্ধে যা যা কথা সমস্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমরা কোন কথারই ঠিক উত্তর দিই নাই। স্থানে স্থানে দু-একটি কথা গড়িয়া কহিতে হইল। তিনি আমাদের কথায় বুঝিয়া লইলেন যে, আমরা দুজন পথ হারাইয়া ঘুরিতেছি। বলিলেন, 'কাল আমি একজন লোক দিয়া তোমাদের দুজনকে বাড়ি পাঠাইয়া দিব।'

খাইবার সময় ভদ্রলোকটি আমাদের সম্মুখে বসিয়া থাকিলেন, আহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত উঠিলেন না। একটি কুঠুরিতে আমাদের দুজনের ঘুমাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইল। সেখানে আর কেহ ঘুমাইতে আসিল না। আমি কিছু সুবিধা বোধ করিলাম। ভাবিলাম কর্তা যাহা বলিলেন তাহা কাজে করিলে আর বড়লোক হওয়া হইবে না; সুতরাং কেহ জাগিবার পূর্বে কর্তাকে ধন্যবাদ না দিয়া চলিয়া যাওয়া ঠিক হইল। সতীশকে ডাকিলাম, 'সতীশ! সতীশ!'-সতীশ কথা কয় না। সতীশের চক্ষে জল পড়িতেছে। কর্তার কথায় সতীশের মন ফিরিয়া গেল নাকি? বাস্তবিকই তাই, অনেক পীড়াপীড়ি করার পর বলিল, 'আমি তোমার সঙ্গে যাইব না।' আপনারা কি মনে করিতেছেন? সতীশের কথা শুনিয়া আমার মনের ভাব কিপ্রকার হইল? বড়লোক হওয়ার ইচ্ছাটা আমার এত বেশী হইয়াছিল যে, বাড়ি ছাড়িয়া অবধি আমার বোধ হইতেছিল-যেন বড়লোকের কাছাকাছি একটা কিছু হইয়াছি। সতীশকে আমি কাপরুষ মনে করিতে লাগিলাম। সতীশের মা বাপ আছে, আমারও মা বাপ আছেন। প্রভেদ এই যে, আমি স্বার্থপর; সতীশ তাহা নহে। সতীশের মনে যে-সকল চিন্তা উঠিতেছিল, আমার অন্তঃকরণে তাহা স্থান পাইল না। আমি সতীশের অবস্থা বুঝিতে পারিলাম না। ম বাপের মনে কষ্ট দেওয়া আমার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু নিজের কথা লইয়া এত ব্যস্ত ছিলাম যে তাঁহাদের কথা ভাবিবার অবসরই পাই নাই। নানা চিন্তার মধ্যে ঘুম আসিল।

for more books visit www.rashal.com

ঘুমাইতে ঘুমাইতে স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমি বাড়িতে কি একটা কথা লইয়া মার সঙ্গে রাগারাগি করিয়াছি, মা কত সাধিতেছেন, আমার ভ্রুক্ষেপ নাই; রাগ যেন ক্রমেই বাড়িতেছে। মার চক্ষে জল পড়িতেছে দেখিয়া যেন আমার প্রতিহিংসার ভাবটা চরিতার্থ হইতে লাগিল। আমি দাত খিঁচাইয়া মাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিলাম। মা আমার হাত ধরিতে আসিলেন; আমি পাশের একটা গাছে উঠিতে চেষ্টা করিলাম। হঠাৎ পা পিছলাইয়া পড়িয়া যাইতেছিলাম; এমন সময় আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। স্বপ্নের কথা ভাবিয়া চক্ষে দুফোঁটা জল আসিল; কিন্তু আবার সে বড়লোক হওয়ার কথা। সতীশের মন ফিরিয়া গিয়াছে। সতীশ জাগিয়া আর যাইতে চাহিবে না, হয়ত আমারও যাওয়া হইবে না। রাত হয়ত আর বেশী দেরী নাই; এই বেলা সতীশকে না বলিয়া যাওয়াই ভাল। আমি আস্তে আস্তে উঠিলাম। আমার কাপড় আর টাকাগুলি লইয়া বাহির হইলাম। রাত্রি তখনো অনেক ছিল, কিন্তু আমার বোধ হইতে লাগিল যেন এই ভোর হইয়া আসিতেছে। একটা বড় রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। অনেকক্ষণ হাঁটিলাম, কিন্তু রাত ফুরায় না। রাস্তাটা একটা নদীর ধারে যাইয়া শেষ হইয়াছে; আমিও সেইখানে যাইয়া থামিলাম-তারপর যাই কোথা? রাস্তাটা নিশ্চয়ই ওপার যাইয়া আবার চলিয়াছে, কিন্তু ওপারে যাই কেমন করিয়া? এতক্ষনে রাত ফুরাইল না। হয়ত আরো অনেক দেরী। ঘাটে একখানি নৌকা বাঁধা ছিল-নৌকার ছই নাই। একজন লোককে অনায়াসে ওরূপ নৌকা চালাইতে দেখিয়াছি, আমার বোধ হইতে লাগিল, আমিও পারি। নৌকায় উঠিতে বিলম্ব হইল না। যে লগিটিতে নৌকা বাঁধা ছিল, তাহা তুলিয়া লইলাম। ডাঙ্গায় ভর করিয়া ঠেলিয়া নৌকা জলে ভাসাইয়া দিলাম। জলের গায় এত জোর আগে ভাবি নাই। শোঁ শোঁ করিয়া নৌকার গায় জল বাধিতে লাগিল; নৌকাখানা ঘুরিয়া গেল। হঠাৎ ঘুরিবার সময় তাড়াতাড়ি লগিটি ছাড়িয়া দিলাম। নৌকা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ডাঙ্গা হইতে অনেক দুরে যাইয়া পড়িল-স্রোতে ভয়ানক বেগের সহিত ভাসিয়া যাইতে লাগিল, আমি কিছুকাল হতবুদ্ধি হইয়া থাকিলাম।

বিপদের পরিমানটা প্রথমে তত বুঝি নাই, শেষে কিছু কিছু করিয়া হুঁশ হইতে লাগিল। মাথা ঘুরিয়া গেল। দুহাতে চোখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িলাম। ঢেউগুলি তড়াক তড়াক করিয়া নৌকাখানিকে দোলাইতে লাগিল, তখন মায়ের সেই মুখখানি মনে হইল। কেন বাড়ি ছাড়িয়া আসিলাম? সেই অন্ধকার রাত্রি, ভয়ানক নদী, আর বাড়ির ছোট কুঠুরিটি-সেই কোমল সুন্দর বিছানাটি মনে হইল। দুই চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। সেই আঁধারে পড়িয়া, মা মা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। কেন সতীশের সঙ্গে গেলাম না, তাহাকে কেন ছাড়িয়া আসিলাম?

এইভাবে কতক্ষণ ছিলাম বলিতে পারিব না। হঠাৎ নৌকাখানি একদিকে যাইয়া ঠেকিল। চমকিয়া দেখিলাম, কতকগুলি বড় নৌকা, তাহারি একটাতে আমার নৌকা ঠেকিয়াছে। আমি সেই মূহুর্তের জন্য আশ্বস্ত হইলাম। কিন্তু তার পক্ষেণেই নৌকা হইতে কতকগুলি কালো অর্ধ উলঙ্গ লোক বাহির হইয়া কেঁউ মেঁউ করিয়া কি বলিতে লাগিল। আমি বুঝিতে পারিলাম আমাকে গালি দিতেছে তাহারা আমার কথা বুঝিতে পারিল বলিয়া বোধ হইল না। আরো বেশী গালাগালি দিতে লাগিল। ক্রমে অন্যান্য নৌকার লোক আসিয়া গোলমালে যোগ দিল। আমার কথা শুনিয়া সকলেই ঐ লোকগুলিকে গালি দিতে লাগিল। একটি ভদ্রলোক সেখানে ছিলেন। তিনি দয়া করিয়া আমাকে তাঁহার নৌকায় লইয়া গেলেন, নিজ হাতে আমার পুটলিটি যত্ন সহকারে এককোণে রাখিয়া দিলেন। তারপর আমাকে বলিলেন, 'আমি কা- যাইতেছি; তোমার আপত্তি না থাকিলে আমার সঙ্গে যাইতে পার, আমার বাড়িতে কোন ক্লেশ হইবে না।' আমি তাঁহার সঙ্গেই চলিলাম।

কা- ছোট একটি শহরের মত। অনেক লোক। বড়লোকও অনেকগুলি আছেন। আমি যাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলাম, তাঁহাকে এখানে কালিদাসবাবু বলিব, তিনিও একজন বড়লোক। এই-সব দেখিয়া শুনিয়া আমার পুরাতন রোগ আবার দেখা দিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, এখানে থাকিয়া বড়লোক হওয়া যায় কি? যায় বই কি। না হইলে ইহারা এত বড় গাড়ি চড়ে কি করিয়া? বোধ হইল যেন কালিদাসবাবু বাড়িতে থাকিয়া হঠাৎ একদিন বড়লোক হইয়া যাইব। একদিন কালিদাসবাবু ডাকিলেন। কালিদাসবাবুর উপর প্রথম হইতেই আমার বড় শ্রদ্ধা হইয়াছিল। যখনই তিনি আমাকে ডাকিতেন, তখনই একখানা সুন্দর কিছু উপহার পাইতাম। আমার বয়সের অনেকেই এখন ভাল কাজ করিতেছেন। কিন্তু আমার যেন তখনো শিশু ভাবটা যায় নাই। কালিদাসবাবু তাহা বেশ বুঝিতেন। যাহা হউক আমি কালিদাসবাবুর নিকট যাইয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার নাম ধরিয়া বলিলেন, 'গিরিশ, এখানে তোমার কেমন লাগে?'

'দিব্যি।'

'বটে? তা এখানে থেকে তোমার আর কোথাও যেতে ইচ্ছা হয় না?'

'কোথায় যাব? এখানেই থাকব।'

'তা বেশ বলিয়া কালিদাসবাবু কপাল হইতে চশমা নামাইয়া ছাপার কাগজ পড়িতে লাগিলেন। কাগজের প্রথম পাতে একটি ছবি। আমার সেই সাহেব। অমি একটু আশ্চর্য হইলাম। অনেকদিন পরে কোনো পরিচিত বন্ধুর সাক্ষাৎ পাইলে যেরূপ হয়, আমারও সেইরূপ হইল। একটি

for more books visit www.rashal.com

ছোট কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইল, আমি বলিয়া উঠিলাম, 'আরে।' কালিদাসবাবু কাগজ নামাইয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার অর্থ, ব্যাপারখানা কি?

আমি বলেলাম, 'আজ্ঞে ঐ ছবিটে।'

'ইনি একজন বড়লোক ছিলেন। তোমারও বড়লোক হতে ইচ্ছে হয়, না?'

আমি ভাবিলাম এই বুঝি! হঠাৎ প্রশ্ন হওয়াতে থতমত খাইয়া বলিলাম, 'বড়লোক কি সবাই হয়?'

'হয় বইকি। ইচ্ছে করলে তুমিও হতে পার।'

'আমি পারি?'

'অবিশ্যি। কাল থেকে তোমাকে স্কুলে পাঠিয়ে দেব ভেবেছি। লেখাপড়া না শিখলে বড়লোক হওয়া যায় না। তাই তোমাকে ডেকেছিলাম। কেমন?'

আমার বাতাসের ঘর ভাঙ্গিয়া গেল। যার চোটে বাড়ি ছাড়া, সেই আপদ। আমি কোন কথা কহিলাম না।

কালিদাসবাবু এতে সন্দেহ করেন নাই, সুতরাং কিছু বলিলেন না। এরূপ কথাবার্তা কালিদাসবাবুতে আর আমাতে অনেকদিন হইত। তিনি আমার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। 'সেই রাত্রিতে নৌকায় কেমন করিয়া আসিলে।' বাড়ি কোথা। 'মা-বাপ নাই? ইত্যাদি-আমি প্রায়ই চুপ করিয়া থাকিতাম। কালিদাসবাবুর ইচ্ছা ছিল, সুযোগ পাইলেই আমাকে বাড়ি পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু এসব সম্বন্ধে কোন খবরই আমি তাঁহাকে দিতে চাহিতাম না। তখন তিনি সে-সব বিষয়ে ক্ষান্ত হইয়া সেখানেই আমাকে লেখাপড়া শিখাইবার মনস্থ করিলেন।

ইস্কুলে যাইয়া অবধি আমার আর মনে শান্তি ছিল না। কয়েকদিন কোনো মতে কাটাইলাম, কিন্তু শেষটা অসহ্য হইয়া উঠিল। কালিদাসবাবুর বাড়িতে থাকা হইবে না। কিন্তু হঠাৎ যাই কোথায়? গেলেও আর এবার হাঁটিয়া যাওয়া যাইবে না। কা-হইতে দুখানা স্টিমার ধু-তে যাতায়াত করিত। সপ্তাহে দুদিন স্টিমার চলে। ধু-যাইতে তিনদিন লাগে। হিন্দুরা এই তিনদিনে চিঁড়ে পুঁটলি-বাঁধিয়া লইয়া জাহাজে উঠে। ভোরবেলা জাহাজ ছাড়ে।

একদিন নদীর ধারে বেড়াইতে যাইয়া দেখি একখানা স্টিমার এইমাত্র ঘাটে আসিয়া থামিল। পরের দিন ভোরে চলিয়া যাইবে। হঠাৎ স্টিমারে উঠিয়া ধু-চলিয়া যাইতে বড় ইচ্ছা হইতে লাগিল। বাড়ি আসিয়া কেহ না দেখে এমন ভাবে আমার কাপড়-চোপড় সব একত্র জড় করিলাম। কালিদাসবাবুর বাড়ি আসিবার কালে সঙ্গে করিয়া যে টাকা আনিয়াছিলাম, তাহার একটিও ব্যয় হয় নাই। কালিদাসবাবুও মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছামত খরচ করিবার জন্য দু-একটি টাকা দিতেন। আমি সমস্তই সঞ্চয় করিতাম। শুনিয়াছিলাম, বড়লোকেরা সহজে টাকা খরচ করিতে চাহে না।

যাত্রার উপযোগী সমস্ত জিনিস প্রস্তুত রাখিয়া ঘুমাইলাম। মনে একটা চিন্তা থাকিলে সহজে ঘুম হয় না, ঘুম হইলেও শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যায়। আমারও তাই হইল, বড় কামরার ঘড়িতে চারটা বাজিল, আমি অমনি উঠিলাম। সঙ্গে পুটলি। পুটুলিতে কয়েকখানা কাপড়, একজোড়া চটী জুতো, নগদ কিছু টাকা, কালিদাসবাবু মাঝে মাঝে যে উপহার দিতেন সেগুলি-কয়েকখানা ছবি, একটা বড় ছুরি আর আমার স্কুলের পুস্তকগুলি। পুস্তকগুলি কেন সঙ্গে লইলাম বলিতে পারি না। তবে কালিদাসবাবু বলিয়াছিলেন, 'লেখাপড়া না শিখিলে বড়লোক হওয়া যায় না।' তাহাতেই মনে কেমন করিয়া একটা ভয় রহিয়া গিয়াছিল। এইরূপ সাজ-সজ্জা করিয়া, ছাতাটি হাতে করিয়া, বিছানার চাদরখানা পুটলির উপর জড়াইয়া আস্তে বাহির হইলাম, স্টিমার ঘাটে আসিতে অধিকক্ষণ লাগিল না। সেখানেই মুদীর দোকান আছে, সেই দোকান হইতে চিড়ে কিনিয়া বিছানার চাদরের এক কোণে বাঁধিয়া লইয়া, জাহাজের একজন লোক আমাকে একটা জায়গা দেখাইয়া দিল, আমি সেইখানে যাইয়া বসিলাম। জাহাজে বিশেষ কিছু ঘটনা হইল না। তবে সঙ্গে যে টাকা আনিয়াছিলাম, তাহ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। নিয়মিত সময় জাহাজ ধু-পৌছিল।

for more books visit www.rashal.com

রামলোচনবাবু আমাদের ওদিককার লোক, তিনি ধু-তে থাকেন, সেখানকার একজন নামজাদা উকীল। আমি ভাবিলাম দেশের একজন লোক, তাঁর কাছে গেলে তিনি অবশ্যই কিছু খাতির করিবেন। জাহাজ হইতে তীরে উঠিয়াই তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। একটি ভদ্রলোক তাঁহার বাড়ি দেখাইয়া দিলেন। আমি আস্তে আস্তে বাড়ির একজন চাকরের মতে লোককে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'রামলোচনবাবুর এই বাড়ি'? সে লোকটা আমার কথার উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক, আমার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিল না। মুখ বিকৃত করিয়া একটা বড় ঘরে চলিয়া গেল। অগত্যা আমি অন্য লোকের আশ্রয় গ্রহন করিলাম। সে যাহা বলিল তাহাতে জানিলাম, আমি যাহাকে রামলোচনবাবুর চাকর মনে করিয়াছিলাম, তিনিই রামলোচনবাবু। তাই অত রাগ! আমি ভয়ে ভয়ে রামলোচনবাবুর ঘরের দরজায় দাঁড়াইলাম। তিনি একটা তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। অত কালো আমি আর দেখি নাই। মোটা বেশী নন, কিন্তু প্রায় বুকের উপর কাপড় পরেন। গোঁপগুলি সোজা সোজা, চুল অধিকাংশ পাকিয়া গিয়াছে। কানে একটা কলম, হাঁটুর উপর পর্যন্ত কাপড় টানিয়া বসিয়াছেন। উরুদেশের উপর একটা লম্বা খাতা রাখিয়া তাহাই দেখিতেছেন, আর মাঝে মাঝে কাহার উদ্দেশ্যে মুখ বাকাইতেছেন। তাকিয়ার একটা অংশ কলম মুছিবার স্থান বলিয়া বোধ হইল। কিছুকাল পরে দেখিলাম যে তাহা নহে। পাশে একটি মাটির দোয়াত, তাহা হইতে ঘাটিঁয়া এক কলম লইয়া খাতায় কি যেন লিখিলেন। তারপর কলমটি মাথায় চুলে ঘষিয়া কানে বসাইয়া হাতের দুটি আঙুল তাকিয়ার ঐ স্থানটিতে পুছিলেন। তার পরক্ষণেই এক হাতের কনুই তাকিয়ার উপর রাখিয়া, একখানা পা আমার দিকে বাড়াইয়া 'ভাউ' শব্দ উদগার করিলেন। শেষটা আমার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। প্রথম প্রশ্ন হিন্দী ভাষায় হইল; তাহার পর বাঙলা।

'কি চাই?'

'আজ্ঞে আমি অনেক দূর থেকে এসেছি-

'আমিও অনেক দূর থেকে এসেছি।'

'আমার নিবাস সু-

'আমারও নিবাস সু-। তারপর?'

'মহাশয় যদি-'

'ম-হ-শ-য় যদি? কি-ঞ্চি-ৎ-সা-হা-য্য? দক্ষিন হস্তের ব্যপার আমার কাছে নাই। হিঁয়াসে চলে যাও।'

আমি আর এক মুহূর্তও সেখানে বিলম্ব করিলাম না। কোথা যাইব ঠিক নাই, কিন্তু রামলোচনবাবুর বাড়িতে আর পদার্পণ করা হইবে না। রাস্তায় বাহির হইয়া একজনের কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বলিলেন, 'যে কোন মুদীকে পয়সা দিলেই থাকবার জায়গা আর খেতে দিবে।' মুদীর দোকান খুঁজিয়া লওয়া কঠিন বোধ হইল না। দু'দিন মুদীর দোকানে থাইলাম। কিন্তু এরূপ ভাবে থাইলে বেশিদিন পয়সায় কুলাইবে না, এই চিন্তায় রাত্রিতে ঘুম হয় না। একদিন প্রাতকালে উঠিয়া মুদীর পয়সা হিসাব করিয়া দিলাম। তারপর পুটলিটি হাতে করিয়া বাহির হইলাম। রাস্তায় কতদূর হাঁটিয়া দেখি, একটা বড় বাড়ি। এ বাড়ির কর্তা রামলোচনবাবুর মত নাও হইতে পারেন। আস্তে আস্তে বৈঠকখানার দিকে গিয়া দেখিলাম কর্তা বসিয়া আছেন, আর ইয়ার গোছের একটা অভ্যাগত লোক তাঁহার সহিত কথা বহিতেছেন। আমি দাঁড়াইবামাত্রই কর্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে বাপু?'

আমি।-'আমি পথিক, কষ্টে পড়েছি-।'

ইয়ার।-'বড় খিদে পেয়েছে বুঝি?'

আমি কোন উত্তর করিলাম না; ইয়ার-বাবু উত্তর দিকে আঙুল নির্দেশ করিয়া চোখ বড় করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন-

'হোটেল আছে। বাবুরচি লোক দিব্যি রাঁধে-রোজ পাঁচ টাকাতেই চলে।'

for more books visit www.rashal.com

আমি নিরাশ হইয়া বাবুর দিকে তাকাইলাম, বাবু ইয়ারের উপর অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিলেন, 'নিজের বাড়িতে একটি লোককে খেতে দিত পার না, অন্য লোকের বাড়ি এসে চাষামো কর। আর আমার বাড়ি এসো না।' বলা বাহুল্য, বাবুর উপর আমার ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, সম্মান ইত্যাদি যত হইতে পারে,সব কটা জন্মিয়া গেল। বাবু আমাকে বলিলেন, 'তোমার অন্য কোনরূপ কষ্ট না হ'লে আমার বাড়িতে তোমার থাকবার জায়গা আর খাবার বন্দোবস্ত হতে পারে।'

'আজ্ঞে আমি অমনি থাকতে চাই নে। আপনার কিছু কাজ করে দেব, তার পরিবর্তে যদি কিছু খাবার দেন, তা হলে ভাল হয়।'

'উত্তম! তুমি ইংরেজি লিখতে পার?'

'কিছু কিছু ইংরেজি পড়েছিলাম বটে, কিন্তু ভাল লেখা পড়া জানি না।'

'কতদূর পড়েছ?'

আমি বলিলাম।

'বেশ, তাতেই হবে।'

আমি বাবুর বাড়ি রহিলাম। কাজের মধ্যে এই, বাবুর চিঠিপত্র সব একটা নকল করিয়া রাখিতে হয়।

এখানে থাকিয়া মাঝে মাঝে বাড়ির কথা ভাবিতাম। বড়লোক হইবার জন্য কত কষ্ট পাইলাম, কিন্তু বড়লোক হইবার ত লক্ষণ দেখিতেছি না। কেবল বাড়ি হইতে চলিয়া অসিলেই কি বড়লোক হওয়া যায়? আরো কিছু চাই, আমার তাহা নাই। এইরূপ যতই ভাবিতে লাগিলাম, ততই বাড়ি ফিরিবার ইচ্ছা হইতে লাগিল। শেষটা ঠিক করিলাম বাড়ি যাইতে হইবে। আমার হাতে যে কিছু টাকা আছে, তাহাতে পথ খরচা চলিবে না। সুতরাং এবার স্টিমারে যাওয়া হইবে না। বৈ-তীর্থ এখান হইতে বেশি দূরে নয়; সেখানে গেলে সঙ্গী পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপ চিন্তার পর মনে করিলাম, বাবুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বৈ-যাইব; সেখানে সঙ্গী পাইলে তাহাদের সহিত বাড়ি যাইব।

কর্তার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বৈ-আসিতে বড় বেশী দেরি হইল না। জায়গাটা দেখিতে বড় সুন্দর, একটি ছোট পাহাড়, তার উপরে তীর্থস্থান। পাথরের গায়ে সিড়ি কাটা আছে। সেই সিড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। অনেকগুলি সিড়ি; উঠিতে অনেক্ষেন লাগে। আমি উঠিতে উঠিতে তিনবার বিশ্রাম করিলাম। প্রথমেই যাহাকে দেখিলাম, তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, যাত্রীরা কোথায় থাকে?' সে বলিল, যাত্রীদের থাকিবার ভাল জায়গা নাই। প্রায় সকলেই পাণ্ডাদের বাড়িতে থাকে। উপরে যে দেব মন্দির, সেই পুরোহিতদের নাম পাণ্ডা। পাণ্ডা খুঁজিতে অধিকক্ষণ ঘুরিতে হইল না। প্রথমে যে পাণ্ডা আমাকে দেখিল, সেই হাত ধরিয়া আমাকে তাহার বাড়ি লইয়া গেল।

পাণ্ডার বাড়ি দুদিন থাকিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে বিষয়টা তত সুবিধাজনক নহে। আমি যে সময় গিয়াছি সে সময় যাত্রীরা প্রায়ই আসে না। সঙ্গী পাইতে হইলে আরো তিনমাস অপেক্ষা করিতে হইবে। তিন মাসের ত কথাই নাই, পাণ্ডা মহাশয় যেরূপ করিলেন, তাহাতে তৃতীয় দিনেই আমাকে পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিতে হইল। তৃতীয় দিন সকালে পাণ্ডা আসিয়া বলিলেন, 'দেখিবি? চল্' আমি চলিলাম। অনেক জিনিস দেখা হইল। শেষে এক জায়গায় গেলাম; সেটি একটি বড় মন্দির। মধ্যে গহ্বর, গহ্বরের নীচে ছোট এক ঝরণার মত। পাণ্ডা বলিল, 'এখানে পূজা করিতে হইবে।' কত লাগিবে তাহারও হিসাব দেওয়া হইল। আমি দেখিলাম, তা হলে আমার বাড়ী যাওয়া হয় না। আমি বলিলাম আমি ছেলেমানুষ, পূজা কি করিব?' পাণ্ডা চটিয়া গেল; সেদিন হইতে আর আমাকে তাহার বাড়িতে জায়গা দিল না। অগ্যতা আমার সেখান হইতে প্রস্থান করিতে হইল। কিছুদূর গেলেই কতকগুলি ছোট ছোট ছেলে আসিয়া 'পয়সা' 'পয়সা' করিয়া আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। আমি কোন মতেই পয়সা দিতে চাহিলাম না। তাহারা ক্ষেপিল। কেহ গাল দেয়, কেহ কাপড় ধরিয়া টানে, কেহ দূর হইতে ছোট ছোট ঢিল ছুঁড়িয়া ফেলে। আমার মাথ গরম হইয়া গেল। কাছে একখানা ছোট কাঠ পড়িয়াছিল, রাগের চোটে তাহাই হাতে করিয়া লইয়া ছেলেগুলিকে তাড়া করিলাম। মুহূর্তের মধ্যে সকলে অদৃশ্য হইল। আমার যেন ভূত ছাড়িল। সেখান হইতে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া পাহাড়ের প্রায় অর্ধেক পথ আসিয়া পড়িলাম। তখন মনে হইল, জুতা জোড়াটি ফেলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু ইহার পূর্বের পঁচিশ মিনিটের মধ্যে পাহাড় সম্বন্ধে যেটুকু জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম, তাহাতে মনে ভয়ানক আতঙ্ক উপস্থিত হইতে লাগিল। আমি জুতার আশা পরিত্যাগ করিলাম। চলিবার সময় সর্বদাই চটি জোড়াটি পুটুলিতে বাঁধিয়া লইয়া যাইতাম, এক্ষণে তাহাই খুঁজিয়া লইলাম।

for more books visit www.rashal.com

পাহাড়ের নীচে নামিতে অনেক বেলা হইল। একটু একটু করিয়া ক্ষুধা বাড়িতে লাগিল কোনো দোকানে যাইতে হইলে অন্তত এক প্রহর চলিতে হইবে। সেই রোদে আর এক ঘন্টা চলাই অসম্ভব বোধ হইতে লাগিল। পথের ধারে দু-একটি গাছ দেখিলেই ইচ্ছা হইতেছিল যে সেইখানে শুইয়া পড়ি। কিন্তু একদিকে তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া যাইতেছে এবং অন্যদিকে ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে। কি করিব কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া পথের ধারে একটি বাড়ি খুজিয়া লইলাম। বাড়িতে উঠিয়া একটা বড় ঘরে গেলাম; সেখানে দুটি ছেলে বসিয়াছিল। আমি তাহাদের নিকট আমার ক্ষুধার কথা জানাইলাম, তাহারা 'তুই' 'তুই' করিয়া আমার কথার উত্তর দিতে লাগিল। একজন বলিল-

'বাঙালী লোক চোর আর খ্রীষ্টান; বাঙালী লোককে কিছু দিব না।'

'আমি ভদ্রলোক ব্রাহ্মন; চোর নই।'

'যা তুই এখান থেকেঃ C-r-i-p crip : d-a-s-h dash.'

আমার তখন ঠাট্টার মেজাজ ছিল না। তথাপি এর পর আর হাসি থামাইতে পারিলাম না। তখন তাহাদের ধরণে কথা কহিতে লাগিলাম-

'ওর মানে কি হোল?'

' ও ইংরাজি। Ram is ill. I will not let him run in the sun বাঙালী লোক চোর; যা তুই এখান থেকে।'

তোরা ইস্কুলে পড়িস?'

এবার যেন তাহারা কিছু ভয় পাইল। আমাদের মাষ্টার বড় বই পড়ে।'

'তোমাদের মাষ্টারের চাইতে আমি কি কম একটা কিছু? এই দেখ ত।'

আমার পুটুলিতে যে বইগুলি ছিল, তাহার মধ্যে Lamb'd Tales ও ছিল। সেইখানা এখন বাহির করিলাম।

এইলা একটু পরিবর্তন দেখা গেল। তাহাদের মুখভঙ্গিতে বুঝা গেল যেন তাহারা মনে করিয়া লইয়াছে যে আমি একটা কিছু হইব। একজন মাথ চুলকাইতে চুলকাইতে উঠিয়া গেল। যে রহিয়া গেল, আমি তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া তাহার সহিত আলাপ পরিচয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তাহার কথায় বুঝা গেল যে তাহার দুভাই। সে ছোট। বাবা নাই; মা আছেনঃ ইস্কুলে পড়ে; টাকা আছে, চাকর চাকরানী আছে। বলা বাহুল্য, সে বাড়িতে তখনকার জন্য আমার বিশ্রামের সংস্থান হইল।

আমার জন্য একটি ছোট ঘর নির্দিষ্ট করা হইল। আমি তাহাতে যাইয়া বসিলাম। তখন সকলের খাওয়া হইয়া গিয়াছে, সুতরাং নতুন আহারের আয়োজন করা হইল। একজন আসিয়া আমাকে স্নান করিতে বলিল। আমি কাছের একটা পুকুর হইতে স্নান করিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখিলাম যে জল-খাবারের জন্য কতকগুলি ভিজানো চাল আর কিছু সন্দেশ লইয়া বড় ছেলেটি আমার ঘরে বসিয়া আছে। চালগুলি ভিজিয়া ঠিক ভাতের মত হইয়াছে। সেখানে খাবার সময় ঐরূপ চাল অনেককে খাইতে দেখিয়াছি। আমি খাইতে বসিলাম। ছেলেটি আমার কাছে বসিয়া রহিল। তাহার ভাব ভঙ্গিতে বোধ হইতে লাগিল যেন কিছু বলিতে আসিয়াছে। কিছুকাল পরেই সে আমার গায় মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। আমি কিছু চমৎকৃত হইয়া তাহার দিকে চাহিলাম, সে বলিল, 'মা ব'লে দিয়েছেন আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি শাপ দিলে আমার অনিষ্ট হবে। আমি আপনাকে মন্দ কথা বলেছি।'

'তোমার উপর রাগ করি নাই। তোমার কথায় আমার কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় নাই। আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিব, যেন তিনি তোমার ভাল করেন।' তাহাকে বুঝানো কিছু কষ্টকর বোধ হইল। কিন্তু শেষটা সে যেন সুখী হইল এবং বলিল, 'তবে যাই, মা'র কাছে বলিগে।'

বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিলে সেই ছেলে দুটির নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাহির হইলাম। সেদিন রাত্রিতে এক বাজারে মুদীর দোকানে ছিলাম। তারপর দুই দিন ঐ ভাবে গেল। সারদিন পথ চলিতাম; কেবল দু-বেলা খাবার জন্য কোনো মুদীর দোকানে উঠিতাম। রাত্রিতে কোন মুদীকে পয়সা দিয়া তাহার ঘরে থাকিবার জায়গা পাইতাম। তৃতীয় দিন রাত্রিতে থাকিবার জন্য আর মুদীর ঘর পাইলাম না।

for more books visit www.rashal.com

কাজেই একজন গৃহস্থের বাড়ি যাইতে হইল। গৃহস্থ জায়গা দিতে কোনো আপত্তি করিলেন না। কিন্তু খাওয়া শেষ হইলে 'কড়া' 'বগুণো' সব দেখাইয়া বলিলেন, 'কাল চলে যাবার আগে এইগুলো মেজে দিয়ে যেতে হবে। তুমি বাঙালী, তোমার এঁটো কে নেবে?' আমি মহা বিপদে পড়িলাম। বলিলাম, 'ওগুলো আমি ছুঁই নাই। তবে আমি যা যা ছুঁয়েছি সেগুলো দাও, এখনি মেজে দিচ্ছি।' একখানা থালা আর একটি বগুণো (বগুণোতে ডাল ছিল) আমার ঘাড়ে চাপিল। তিনি বাড়ির কাছে একটা পুকুর দেখাইয়া দিলেন; আমি তথায় যাইয়া সমস্ত পরিস্কার করিয়া আসিলাম। প্রায় অর্ধঘন্টা সময় লাগিল।

পরিশ্রমের পর সুনিদ্রা হইল। পরদিন গৃহস্থ ডাকিয়া ঘুম ভাঙ্গাইলেন, উঠিয়া দেখি সূর্য উঠিয়াছে। তাড়াতাড়ি পুঁটুলি হাতে করিয়া বাহির হইলাম। গৃহস্থের নিকট বিদায় লইবার সময় ফা-যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, 'একটা বড় মাঠ, তারপর একটা পাহাড়, তারপর ফা-। একই পথ, ভূল হবার জো নাই।'

কিছুদূর হাঁটিয়াই একটা মাঠে আসিলাম। সেখানে পথিকদিগের জন্য একটা ঘর আছে। তথায় একজনার সাহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার সঙ্গে একটা ঘোড়া। সে আমাকে দেখিয়াই বলিল, 'বেশ, চল। একজন সঙ্গীর জন্য বসিয়াছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সঙ্গীর প্রয়োজন কি?' সে বলিল, 'তুমি আর কখনো এখানে চল নাই? একা গেলে খেয়ে ফেলবে!' আমার ভয় হইল।

মাঠের এপাশ থেকে ওপাশ দেখা যায় না। অতি কম চওড়া পথ; দশ বারো হাত অন্তর ছোট ছোট খসখসের ঝোপ। জীবজন্তুর মধ্যে এক জাতীয় পাখি। পাখিটি একটি চড়াই অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়, গায়ের রং সবুজ; ঠোঁট সরু এবং লম্বা, স্বভাব অত্যন্ত চঞ্চল। ক্রমাগত একই রূপ শব্দ করিতেছে-"টিরিরণ টিরিরণ টিরিরণ।" লেজে একটা নতুনত্ব আছে। লেজের মধ্যদেশ হইতে প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা একটি সূচীর মত বাহির হইয়াছে। আমার সঙ্গী বলিল, 'শ্বশুর বাড়ি গিয়ে ছুঁচ চুরি করেছিলেন। তাতেই ঐ শাস্তি।' অন্য কিছু না থাকাতে ঐ পাখিকেই বারবার ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম।

বেলা আন্দাজ চারিটার সময় ছোট একটি ঘর দেখিতে পাইলাম। সঙ্গী বলিল, 'আজ এখানেই থাকিতে হইবে।' আমি প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম, 'চারটের সময় বসে থাকতে হবে কেন?'

সঙ্গী বলিল, 'মাঠে রাত হলে বাঘে খাবে।' বাঘে খায় এরূপ ইচ্ছা আমার ছিল না। সুতরাং সে রাত্রির জন্য ঐ ঘরেই থাকিলাম। রাত্রিতে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া অনেক প্রকার শব্দ শুনিতে পাইলাম। সে-সব নাকি হাতির শব্দ। সৌভাগ্যক্রমে হাতিগণ আমাদের কোন খবর লইতে আসিলেন না। কিন্তু পরদিন উঠিয়া দেখি ঘোড়াটি নাই। ঘোড়ার স্বামী অনেক আক্ষেপ করিল।

মাঠ পার হইতে প্রায় চারটা বাজিল। মাঠ যে জায়গায় শেষ হইয়াছে, সেখানেও দেখিলাম একটি ছোট ঘর। সেখানে আসিলে সঙ্গী বিদায় লইয়া অন্য পথে গেল। আমি আমার নির্দিষ্ট পথে আস্তে আস্তে চলিলাম। কিছুদূর যাইয়া একটি মাহুতকে পাইলাম, সে হাতি লইয়া ফা-চলিয়াছে। আমি চারি আনা পয়সা দিব বলাতে সে আমাকে তাহার হাতির পিঠে একটু স্থান দিল। মহাসুখে ফা-আসিলাম। কালিদাসবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সাহস পাইলাম না। রাত্রিতে একটী মুদীর দোকানে থাকিয়া পরদিন ভোরে রওনা হইলাম।

পথে যে-সকল ছোটখাট ঘটনা হইয়াছিল, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে একদিনের কথা আবশ্যক। দুই প্রহরের পর আর মানুষের সাড়া শব্দ পাইলাম না। বেলা যতই কমিয়া আসিতে লাগিল, ততই ক্রমাগত নির্জন স্থানে যাইয়া পড়িতে লাগিলাম, তারপর কেবল একটা মাঠ; দুই ধারে উলুবন এবং অন্যান্য দুই একটি ছোট ছোট গাছ। এরূপ জায়গায় সন্ধ্যা হইল। কি করি, কোথায় যাই! প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিলাম। পথ এত সংকীর্ণ যে দুই পাশের গাছে গা লাগে। থাকিয়া থাকিয়া আমার বুক গুড় গুড় করিয়া উঠিতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ যেন পিঠে একটা কি লাগিল। চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলাম একজন পাহাড়ী লোক। সে আমাকে কি একরকম ভাষায় বলিল-'তুই কোথায় যাস? তোর প্রাণের ভয় নাই?' এই বলিয়া সে আমাকে তাহার পিছু পিছু যাইতে সংকেত করিল। আমি সহজেই সে আজ্ঞা পালন করিতে লাগিলাম। সে দুই হাতে উলবন সরাইয়া শুয়োরের মত দৌড়াইতে লাগিল, আর মাঝে মাঝে আমাকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল 'আরে আয়, মরে যাবি।' আমি হতবুদ্ধি হইয়া তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম।

কতক্ষণ এইরূপে চলিলাম বলিতে পারি না। অবশেষে একটা বড় নদীর ধারে আসিলাম, সেখানে দেখিলাম আরো কয়েকজন লোক বসিয়া আছে। পাহাড়ী বলিল, যতক্ষণ নৌকা আসিয়া ও-পারে না যায়, ততক্ষন এখানে বসিয়া থাকিতে হইবে। আমি তাহাদের সঙ্গে মাটিতে বসিলাম। অন্যান্য সকলে পুঁটলি হইতে খাবার খুলিয়া খাইতে লাগিল। পাহাড়ীর সঙ্গে কতকগুলি কমলালেবু ছিল। সে আমাকে তাহার খাবারটা খাইতে দিল। আমি তাহাই খাইয়া, নাক মুখ কাপড়ে ঢাকিয়া সেইখানেই শুইয়া পড়িলাম। অন্যান্য লোকেরা আমাকে বলিতে লাগিল

for more books visit www.rashal.com

‘ঘুমিও না, খেয়ে ফেলবে।’ তেমন অবস্থায় ঐরূপ উপদেশ বাক্যের অত্যন্ত আবশ্যক ছিল, কারণ সমস্ত দিনের পরিশ্রমে আমার গা অবশ হইয়া আসিতেছিল। এবং একটু পরেই অতি নিকটে ‘ঘ্যাঁওর’ ‘ঘ্যাঁওর’ করিয়া বাঘ ডাকিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি চারিপাশে দূরে নিকটে হিংস্র জন্তুর শব্দ হইতে লাগিল। সে রাত্রির কথা আমার জীবনে আর কখনো ভুলি নাই। নৌকাওয়ালা ওপারে বসিয়া সুখভোগ করিতেছে; সেখানে নৌকা বোঝাই না হইলে ফিরিয়া আসিবে না। সমস্ত রাত্রি আমাদের প্রান হাতে করিয়া সেই ভয়ানক স্থানে বসিয়া থাকিতে হইল। পরদিন নৌকা আসিলে আমরা ওপারে গেলাম।

ইহার তিনদিন পর বাড়ির কাছে বাজারে আসিলাম, সেখানে দই, চিড়ে, সন্দেশ ইত্যাদি যাহা কিছু মনে হইল উদরস্থ করিয়া পথকষ্টের প্রতিহিংসা বিধান করিলাম। দুইটার সময় বাড়ি আসিলাম। তখন বাহির বাটিতে কেহ ছিল না। গা ভয়ানক কাঁপিতে লাগিল; শীতে অস্থির হইয়া গেলাম। আশে পাশে যে কয়খানা লেপ কাঁথা ছিল, উপর্যুপরি গায় দিয়া বিছানায় পড়িলাম। শক্ত জ্বর হইল। ফাঁকি দিয়া বড়লোক হওয়ার স্বপ্নটা ভালরকমেই ভাঙ্গিয়া গেল।

বড়লোক কিসে হয়?

‘সহজে কি বড়লোক হওয়া যায়’ এই নামের প্রস্তাবটি শেষ করিবার সময় আমরা গিরিশের পরে কি হইল, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। কিন্তু গিরিশের জীবনে এত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়ছিল যে আমরা সে-সব বলিতেও কষ্ট বোধ করি। তবে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে, বেচারা কোন দিনই বড়লোক হইতে পারে নাই। দুঃখ কষ্টের একশেষ তাহার জীবন হইয়াছিল। পরিশেষে সে নিজের হাতে নিজের জীবন শেষ করিয়া দিল।

গিরিশেস সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলা হইয়াছে, মোটামুটি সকলগুলিই সত্য। কথাগুলি যথার্থ বলিয়াই সেগুলি এত গুরুতর। তাহার ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল,আমরা যদি তাহার মতন কাজ করি, কে জানে, কোন দিন আমাদের সম্বন্ধেও কেউ এইরূপ গল্পসকল বলিয়া লোককে সাবধান করিবে না। পরে কষ্ট পাওয়ার চাইতে আগে সতর্ক হওয়া ভাল।

বড়লোক হওয়ার ইচ্ছা থাকিলেই কিন্তু বড়লোক হয় না; তাহা হইলে অত কম লোক বড়লোক হইতে দেখিতাম না। ইচ্ছা ত সকলেরই আছে, তোমার আমার নাই? কিন্তু আমি তো আজিও ছোটলোকই রহিয়াছি! শুধু ইচ্ছা থাকিলেই বড়লোক হয় না; ইচ্ছার খুব দরকার, কিন্তু আরো কিছু চাই। গিরিশের ইচ্ছা যথেষ্ট ছিল। তাহার পক্ষে যতটুকু কুলাইয়াছিল, সে ত চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। কিন্তু তবুও সে বড়লোক হইল না! হইবে কেমন করিয়া? কিরূপে কেমন করিয়া কি করিতে হইবে তাহা যদি না জানিলাম, তবে ত সেই গাধা রামকন্তের মতই রহিলাম। রাম কাসে একদিনও উপরে উঠিতে পারিল না, নীচে নামিবারও জায়গা ছিল না গুরু মহাশয় তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিতেন, ‘ ওরে তোর আর কি কিছু হবে! ভাল ছেলে হ’তে হ’লে তেল পোড়াতে হয়, খাটতে হয়, কষ্ট সহ্য করতে হয়!’ রামকান্ত একদিন বাড়ি আসিয়াই দু সের তেল কিনিয়া আনিল। ঐ তেলে কাপড় ভিজাইয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিল। তারপর ঘরের চালে দড়ি বাঁধিয়া তাহাতে প্রাণপণে দুলিতে লাগিল। সর্বশেষে দড়ি ছিঁড়িয়া আগুনের উপর অর্ধ দগ্ধ, অর্ধ ভগ্ন শরীরে নিস্কৃতি পাইল। যে দুই সপ্তাহ শয্যাগত থাকিতে হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিল, মাষ্টার মহাশয় ভুল করিয়াছেন। সে সরল লোক, যেদিন স্কুলে গেল সেদিনই মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক করিল। রামকান্তের যে ভুল, গিরিশ বেচারারও সেই ভুল। ভাই, আমরা যে বড়লোক হই না, আমাদেরও অনেকের সেই ভুল। যদি বড়লোক হইতে ইচ্ছা থাকে-‘নাই’ যদি বল তবে আমি হাসিব-তবে প্রথমে কি কি কাজ করিলে বড়লোক হয়, বেশ করিয়া জান। তারপর নিঃশব্দে শান্তভাবে আপন কার্যে প্রবৃত্ত হও। অনেক কষ্ট পাইতে হইবে; তাহার জন্য যথেষ্ট সহিষ্ণুতা চাই। অনেক সুখ পায়ে ঠেলিতে হইবে; তাহার জন্য সমুচিত ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন। এত করিয়াও কত জন উপযুক্ত বুদ্ধির অভাবে বড় হইতে পারিতেছে না। তুমিও পারিবে কি না জানি না-আমি ইচ্ছা করিতেছি তোমরা সকলেই পারিবে।-কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে তোমার পক্ষে যতটুকু হওয়া সম্ভব, তাহা হইতে গেলেই আমি যাহা বলিলাম সব কয়টি করিতে হইবে।

বড়লোক, বড়লোক, এতবার বলিলাম। কিন্তু কতজন বড়লোক হইতে চাহিতেছেন, সকলেই কি বুঝিতে পারিতেছেন যে বড়লোক হওয়ার অর্থ কি? একটা লোক বলিতেছিল যে, ‘আমার ছেলের বিবাহেতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছি।’ তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, ‘বল ত দেখি লাখ টাকার কথা বলা বলিলে কতগুলি টাকার কথা বলা হয়?’ সে বলিল কেন, ‘কেন, লাক টাকা আর লাক টাকা, দুকুড়ি দশ টাকা।’ বড়লোক হওয়া সম্বন্ধেও অনেকের ঐরূপ মত। অনেকের কেবল নিজের বেলাই ঐ মত। তাহারা বড় ছোট লোক। ভাই, বড়লোক না হও দুঃখ নাই; কিন্তু ছোট লোক হইও না।

for more books visit www.rashan.com

কোন ভাল বিষয়ে খুব ভাল হইলে বড়লোক হয়। যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয় বড়লোক, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বড়লোক, লর্ড রিপন বড়লোক, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বড়লোক, সুরেন্দ্র বাবু বড়লোক, ইত্যাদি, ইঁহাদের সকলেই এক বিষয়ের জন্য বড় হন নাই। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই দেখিবে, ইঁহাদের যাঁহার মধ্যে যেটুকু ভাল তাহার জন্যই তাঁহাকে বড়লোক বলা হয়। বড় চোরকেও বড়লোক বলা হয় না, বড় ডাকাতকেও বড়লোক বলা হয় না।

আর এক কথা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যার জন্য আমরা তাঁহাকে অত বড়লোক বলি না। মহেন্দ্র বাবু নিজের ঘরে কবাট দিয়া বিজ্ঞান চর্চা করিলে আমরা তাঁহাকে অত বড়লোক বলিতাম না, অন্তত তাঁহার প্রতি আমাদের অত শ্রদ্ধা হইত না। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, লর্ড রিপন, ইঁহারা কে কি শাস্ত্র অধিক জানেন, কি কিছুই জানেন না, তাহার হিসাবও হয়ত আমরা কেহ দিতে পারিব না। সুরেন্দ্র বাবুর স্কুল আছে, সেখানে তিনি পড়ান, এজন্য তাঁহাকে কেহ বড়লোক বলে না। যিনি যে পরিমানে লোকের উপকার করিতেছেন, তিনি সেই পরিমানে লোকের ভালবাসা পাইতেছেন। বড়লোক এবং ভাল লোক, এ উভয়ই যথার্থ বড়লোক। বড়লোক হওয়া যেরূপই কঠিন হউক না কেন, ভাল লোক চেষ্টা করিলেই হওয়া যায়। এবং তাহাই আগে হওয়া উচিত। কাহারো যদি এক কোটি টাকা থাকে, তাঁহাকে সুদ্ধ ঐ টাকাগুলির জন্য বড়লোক বলিব না। তিনি নিজের সদ্‌গুনের সাহায্যে উহা উপার্জন করিয়া থাকিলে অবশ্য তাঁহাকে বড়লোক বলিব। কিন্তু যখন দেখি ঐ টাকা দিয়া দেশের উপকার করিতেছেন, তখনই তাঁহাকে যথার্থ বড়লোক বলিব। কারণ, তখন তিনি বড়লোক এবং ভাল লোক উভয়ই হইয়াছেন। বড়লোক বড়, ভাল লোক ভাল, বড়লোক ভাল হইলে বড় ভাল।

বানর রাজপুত্র

এক রাজার সাত রানী, কিন্তু ছেলেপিলে একটিও নাই। রাজার তাতে বড়ই দুঃখ; তিনি সভায় গিয়ে মাথা গুঁজে বসে থাকেন, কেউ এলে ভাল করে কথা কন না।

একদিন হয়েছে কি-এক মুনি রাজার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। মুনি রাজার মুখ ভার দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাজা তোমার মুখ যে ভার দেখছি; তোমার কিসের দুঃখ?'

রাজা বললেন, 'সে কথা আর কি বলব, মুনি-ঠাকুর! আমার রাজ্য, ধন, লোকজন সবই আছে, কিন্তু আমার যে ছেলেপিলে নেই, আমি মরলে এ-সব কে দেখবে?'

মুনি বললেন, 'ঐ কথা? আচ্ছা, তোমার কোন চিন্তা নেই। কাল ভোরে উঠেই তুমি সোজাসুজি উত্তর দিকে চলে যাবে। অনেক দূর গিয়ে একটা বনের ধারে দেখবে একটা আমগাছ রয়েছে। সেই আমগাছ থেকে সাতটি আম এনে তোমার সাত রাণীকে বেটে খাইয়ে দিলেই, তোমার সাতটি ছেলে হবে। কিন্তু খবরদার, আম নিয়ে আসবার সময় পিছনের দিকে তাকিয়ো না যেন!'

এই কথা বলে মুনি চলে গেলেন। তারপর দিন গেল, রাত হল, ক্রমে রাত ভোর হল। তখন রাজামশাই তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে সোজাসুজি উত্তর দিকে চলতে লাগলেন। যেতে যেতে অনেক দূর গিয়ে তিনি দেখলেন, সত্যি সত্যি বনের ধারে একটা আম গাছ আছে, তাতে পাকা সাতটি আমও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সেই বনে তিনি কতবার শিকার করতে এসেছেন, কিন্তু আমগাছ কখনো দেখতে পাননি। যা হোক, তিনি তাড়াতাড়ি সেই গাছে উঠে আম সাতটি পেড়ে নিয়ে বাড়িতে ফিরে চললেন।

খানিক দূর যেতে না যেতেই শুনলেন, কে যেন পিছন থেকে তাঁকে ডাকছে,

ওগো রাজা ফিরে চাও,
আরো আম নিয়ে যাও।

মুনি যে সাবধান করে দিয়েছিলেন, সে কথা রাজার মনে ছিল না। তিনি পিছন দিক থেকে ডাক শুনেই ফিরে তাকিয়েছেন, আর অমনি আমগুলো তাঁর হাত থেকে ছুটে গিয়ে আবার গাছে ঝুলতে লেগেছে। কাজেই রাজামশাই-এর আবার গিয়ে গাছে উঠে আমগুলি পেড়ে আনতে হল। এবার আর তিনি কিছুতেই মুনির কথা ভুললেন না। তিনি চলে আসবার সময় পিছন থেকে তাঁকে কতরকম করে ডাকতে লাগল, 'চোর 'চোর' বলে কত গালও দিল। রাজামশাই তাতে কান না দিয়ে বোঁ বোঁ করে বাড়ি পানে ছুটলেন।

for more books visit www.rashal.com

বাড়ি এসে রাণীদের হাতে সাতটি আম দিয়ে রাজামশাই বললেন, 'তোমরা সাতজনে এই সাতটি আম বেটে খাও।'

ছোটরানী তখন সেখানে ছিলেন না। বড় রাণীরা ছজনে মিলে তাঁকে কিছু না বলেই সব কটি আম খেয়ে ফেললেন। ছোটরানী এর কিছুই জানতে পারলেন না, কিন্তু তাঁর ঝি সব দেখল। বড় রাণীদের খাওয়া শেষ হয়ে গেলে সে আমের ছালগুলি চুপিচুপি কুড়িয়ে নিয়ে গেল। সেই ছালগুলো ধুয়ে বেটে ছোটরাণীর হাতে দিয়ে বলল, 'মা, এই ওষুধটা খাও, তোমার ভাল হবে।' ওষুধ খেতে হয়, তাই ছোটরাণী আর কোন কথা না বলেই সেটা খেয়ে ফেললেন।

তারপর বড় রাণীদের সকলেরই এক-একটি সুন্দর খোকা হল, রাজা তাতে খুশি হয়ে খুব ধুমধাম আর গানবাজনা করালেন। ছোটরানীরও একটি খোকা হল, কিন্তু সেটি হল বানর। বানর দেখে রাজা চটে গিয়ে ছোটরাণীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন। দেশের লোকের তাতে বড়ই দুঃখ হল। তারা একটি কুঁড়ে বেঁধে ছোটরাণীকে বলল, 'মা তুমি এইখানে থাকে।'

সেইখানে ছোটরাণী থাকেন। বানরটি সেখানে থেকে দিন দিন বড় হচ্ছে। সে মানুষের মত কথা কয়। আর তার এমনি বুদ্ধি যে, কোন কথা তাকে শিখিয়ে দিতে হয় না। যখন যে কাজের দরকার, অমনি সে তা করে। সারাদিন সে গাছে গাছে ঘুরে বেড়ায়, যেখানে যে ফল দেখে তা খায়; খুব ভাল লাগলে মার জন্য নিয়ে আসে। তাকে কেউ কিছু বলে না, কারুর গাছের ফল খেতে গেলে সে ভারি খুশি হয় ভাল ভাল ফল দেখিয়ে দেয়। তার বুদ্ধি দেখে সকলে আশ্চর্য হয়ে যায়।

এমনি করে দিন যাচ্ছে। বড় রাণীদের ছটি ছেলেও এখন বড় হয়েছে। তারা বানরটিকে যারপর নাই হিংসা করে, সে তাদের সঙ্গে খেলা করতে গেলে তাকে মেরে তাড়িয়ে দেয়।

তারপর একদিন বানরটি দেখল যে, বড় রাণীদের ছেলেদের জন্য মাস্টার এসেছে, তারা পুঁথি নিয়ে তার কাছে বসে পড়ে। তা দেখে বানর গিয়ে তার মাকে বলল, 'মা, আমাকে পুঁথি এনে দাও, আমি পড়ব।'

মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন , 'হায় বাছা, কি করে পড়বে? তুমি যে বানর।'

বানর বলল, 'সত্যি মা, আমি পড়ব; তুমি বই এনেই দিয়েই দেখো। তুমি আমাকে পড়াবে।'

বানরের এমনি বুদ্ধি, যে বই পায় সে দুদিনে পড়ে শেষ করে ফেলে। সে দু বছরে মস্ত পণ্ডিত হয়ে উঠল। বড় রাণীদের ছেলেরা তখনো দু-তিনখানি বই-পুঁথি শেষ করতে পারেনিঃ রোজ খালি মাস্টারের বকুনি খায়।

এ-সব বকুনি শুনে রাজা একদিন বললেন, 'বটে? বানরের এমনি বুদ্ধি? নিয়ে এসো তো তাকে, আমি দেখব।'

বানরের কিছুতেই ভয় নেই। রাজা ডেকেছেন শুনে সে অমনি তাঁর কাছে উপস্থিত হল। তাকে দেখে আর তার কথাবার্তা শুনে রাজার এমনি ভাল লাগল যে, তিনি আর কিছুতেই ছোটরানীকে কুঁড়েঘরে ফেলে রাখতে পারলেন না। বাড়িতে আনতেও ভরসা পেলেন না, পাছে বড় রাণীরা কিছু বলেন। তাই তিনি ছোটরাণীকে রাজবাড়ির পাশেই একটি খুব সুন্দর বাড়ি করে দিলেন। সেই বাড়িতে তখন থেকে ছোটরাণী তাঁর বানর নিয়ে থাকেন। টাকাকড়ি যত লাগে রাজার লোক এসে দিয়ে যায়। লোকে তাঁর বাড়িটাকে বলে বানরের বাড়ি। এ সব দেখে বড় রাণীদের ছেলেরা বানরকে আরো বেশী হিংসা করতে লাগল।

একটু একটু করে ছেলেরা বড় হয়ে উঠল। সকলে রাজাকে বলল, 'রাজপুত্রেরা বড় হয়েছেন, এখন এদের বিয়ে দিন।'

রাজা বললেন, 'তাদের দেশ বিদেশ ঘুরতে দাও। তারা নানান জায়গা দেখে, নানারকম শিখে, টুকটুকে ছয়টি রাজকন্যা বিয়ে করে আনুক।'

সকলে বলল, 'বেশ বেশ! তাই হোক।'

তারপর ছয় রাজপুত্র সেজেগুজে, টাকাকড়ি সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে নানান দেশ দেখতে বেরুল। তা দেখে বানর তার মাকে গিয়ে বলল, 'মা, আমিও যাব।'

for more books visit www.rashal.com

তার মা বললেন, 'তুমি কি করতে যাবে, জাদু? তোমাকে কোন টুকটুকে রাজকন্যা বিয়ে করবে?'

বানর বলল, 'মা, আমি অনেক দেশ দেখতে পাব।'

মা বললেন, 'তুমি যে দেশ দেখতে যাবে, আমি তোমাকে ছেড়ে কি করে থাকব?'

বানর বলল, 'আমি দেখতে দেখতে ফিরে আসব। তোমার পায়ে পড়ি মা, আমাকে যেতে দাও।'

কাজেই ছোটরানী আর কি করেন? বানরকে যেতে দিতেই হল।

ছয় রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে; রাজবাড়ি থেকে অনেক দূর চলে এসেছে। একটা বনের ভিতর দিয়ে তাদের পথ, সেই পথ চলতে চলতে তাদের নানারকম কথাবার্তা হচ্ছে, এমন সময় বনের ভিতর থেকে বানর বেরিয়ে এসে বলল, 'দাদা, আমিও এসেছি, আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলো।'

তাতে রাজপুত্রেরা যার পর নাই রেগে বলল, 'বটে রে, তোর এতবড় আস্পর্ধা! আমরা রাজকন্যা বিয়ে করে আনতে যাচ্ছি বলে তুইও তাই করতে যাবি! দাঁড়া, তোকে দেখাচ্ছি!' এই বলে তারা বানরকে মারতে মারতে আধমরা করে একটা গাছে বেঁধে রেখে চলে গেল।

সেইবনে ছিল একদল ডাকাত। তারা দেখল যে ছয়জন রাজপুত্র ভারি সাজ করে টাকাকড়ি নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। দেখেই ত তারা মার-মার করে চারদিকে থেকে তাদের ঘিরে ফেলল। রাজপুত্রেরা ভয়েই জড়সড়, তলোয়ার খুলবার কথা আর তাদের মনেই নেই। তাদের টাকাকড়ি, ঘোড়া, পোশাক-সবসুদ্ধ তাদের হাত-পা বেঁধে নিয়ে যেতে তাদের দু মিনিটও সময় লাগল না।

রাজপুত্রদের ধরে নিয়ে খানিক দূরে এসেই ডাকাতেরা দেখল, পথের ধারে একটা বানর বাঁধা রয়েছে। তাকেও তারা সঙ্গে নিয়ে চলল। বানর যেন তাতে বেশ খুশি হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে তাদের সঙ্গে যেতে লাগল। তা দেখে ডাকাতেরা ভাবল, বুঝি কারু পোষা বানর, কাজেই তাকে আর তারা তেমন করে বাঁধল না।

সেই বনের ভিতরই ডাকাতদের ঘর। সেদিন তাদের বড্ড পরিশ্রম হয়েছিল, তাই রাজপুত্রদের নিয়ে স্যার সময় ঘরে ফিরে এসে বাঁধনসুদ্ধই ছটি ভাইকে একটা জায়গায় ফেলে রেখে তারা খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়ল। যখন খুব করে তাদের নাক ডাকতে লেগেছে,তখন বানর চুপিচুপি তার নিজের বাঁধন দাঁত দিয়ে কেটে তাড়াতাড়ি গিয়ে রাজপুত্রদের বাঁধন খুলে দিয়েছে। তখন আর তারা বানরকে ফেলে যাবে কোন লাজে? কাজেই তাকেও সঙ্গে করে, জিনিসপত্র নিয়ে, ঘোড়ায় চড়ে অমনি তারা প্রাণপণে ছুট দিল, ডাকাতেরা কিছু টের পেল না।

ডাকাতদের ওখান থেকে পালিয়ে রাজপুত্রেরা প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে লাগল, ভোরের আগে আর তারা কোথাও থামল না। সকালে তারা দেখল যে, তারা ভারি চমৎকার একটা শহরে এসে উপস্থিত হয়েছে। সে খুব বড় এক রাজার দেশ; তাঁর বাড়ি দূর থেকে দেখা যাচ্ছে, যেন একটা ঝকঝকে সাদা পাহাড়।

ছয় রাজপুত্র সেই বাড়ির কাছে গিয়েই টকটক করে ঘোড়া হাঁকিয়ে তার ভিতরে ঢুকে পড়ল। দারোয়ানেরা তাদের পোষাক আর ঘোড়ার সাজ দেখে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের সেলাম করল, আর কিছু বলল না। বানর কিন্তু জানে যে, সে সেখানে গেলেই তাকে ধরে ফেলবে, তাই সে রাজবাড়ির পিছনের দিকে গিয়ে, খিড়কির পুকুরের ধারে শুয়ে রইল।

সেই দেশের রাজারও ছিল সাত রাণী। তাদের বড় ছজন ছিল ভারি হিংসুক আর দেখতে বিশ্রী, আর ছোটটি ছিলেন পরীর মত সুন্দর আর বড় লক্ষী। বড়রা রাজাকে মিছমিছি নানান কথা বলে, ছোটরাণীকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল; তিনি খিড়কির পুকুরের ধারে একটি কুঁড়ের ভিতরে থাকতেন, রাজা তাঁর কোন খবরও নিতেন না। বড় ছয় রাণীর ছটি মেয়ে ছিল, তারা দেখতে ছিল ঠিক তাদের মায়ের মতন, আর তাদের মনও ছিল তেমনি। আর ছোটরাণীর যে মেয়েটি ছিল, সেও ছিল ঠিক তার মার মত-তেমনি সুন্দর, তেমনি লক্ষী। তা হলে কি হয়, বড় রাণীরা রাজাকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, ছোটরাণীর মেয়েটা পাগল, কালো, কুঁজো, কানা, খোঁড়া, কালা আর বোবা।

for more books visit www.rashal.com

সেই খিড়কির পুকুরের ধারে, সেই ছোটরানীর কুঁড়েরঘরের কাছে বানর গিয়ে শুয়ে রয়েছে। খানিক বাদে বড় রাণীদের ছয় মেয়ে ছটি ঘটি নিয়ে সেখানে স্নান করতে এল, ছোটরাণীর মেয়েটিও তার ছোট ঘটিটি নিয়ে এল। তারা স্নান করে চলে আসবার সময় সেই মেয়েটির ঘটি থেকে কেমন করে খানিকটা জল বানরের গায়ে পড়ে গেল, অমনি বড়রাণীদের ছয় মেয়ে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'ওম! তোমরা দেখো এসো-ছোটরাণীর মেয়ে বাদরটিকে বিয়ে করেছে।'

বড়রাণীরাও তা শুনে ছুটে এসে বলতে লাগল,'তাই ত,তাই ত। ছোটরানীর মেয়ে বানরটাকে বিয়ে করেছে।' সেই খবর তখুনি তারা রাজার কাছে পাঠিয়ে দিল। দেশের সকল লোক রাজার সভায় বসে শুনল যে, ছোটরানীর মেয়ের একটা বানরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে।

ছোটরানীর মনে কি কষ্ট হল, তা আর কি বলব? তিনি খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়ে মেয়েটিকে বুকে নিয়ে মাটিতে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। তা দেখে বানর তাঁদের ঘরের দরজায় এসে বাইরে থেকে হাত জোঁর করে বলল, 'মা, আপনি কাঁদবেন না। ভগবান যা করেন ভালই করেন। এ থেকেও আপনাদের ভাল হতে পারে।' বানরকে মানুষের মত কথা কইতে দেখে রানী উঠে বসলেন। তাঁর মনের দুঃখ যেন কোথায় চলে গেল। সেই থেকে বানর তাঁর ঘরের কাছে গাছের উপর থাকে আর প্রাণপণে তাঁর সেবা করে। রানী যখন শুনলেন যে, সে রাজপুত্র, তখন সে যে বানর, সে কথা তিনি ভুলে গেলেন। তাঁর মনে হল যে এমনি ভাল আর বুদ্ধিমান লোক আর মানুষের ভিতরে নাই।।

এদিকে হয়েছে কি, সেই ছয় রাজপুত্রও রাজার বাড়িতে ঢুকে একেবারে তার সভায় এসে হাজির হয়েছে। রাজা দেখেই বুঝতে পেরেছেন, এরা রাজপুত্র। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাপু, তোমরা কে? কি করতে এসেছ?' তারপর যখন তাদের বাপের নাম শুনলেন যে তারা বিয়ে করবার জন্য রাজকন্যা খুঁজতে বেরিয়েছে, তখন তাঁর আর খুশির সীমাই রইল না। তিনি বললেন, 'বাঃ! তোমরা যে আমার বন্ধুর ছেলে। বেশ হল; আমার ছ মেয়েকে তোমরা ছজনে বিয়ে করবে।'

ঠিক এমনি সময় বাড়ির ভিতর থেকে খবর এল যে, ছোটরানীর মেয়ের একটা বাঁদরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। রাজপুত্ররাও তখনি বুঝে নিল যে এ আর কেউ নয়, তাদেরই বাঁদর। তাদের মনে হিংসেটা যে হল। বাঁদর এসে তাঁদের আগেই রাজার মেয়ে বিয়ে করে ফেলল। লোকে আবার কানাকানি করে বলে যে সে মেয়ে নাকি রাজার আর ছয় মেয়ের চেয়ে ঢের বেশি সুন্দর আর ভাল-এ সব কথা তারা যত ভাবে, ততই খালি হিংসায় জ্বলে মরে।

যা হোক রাজার ছয় মেয়ের সঙ্গে তা তাদের বিয়ে হয়ে গেল, তারপর ঝকঝকে ময়ূরপঙ্খী সাজিয়ে ঢাক ঢোল বাজিয়ে তারা বউ নিয়ে দেশে চলল। বানরও একটি ছোট নৌকায় করে তার স্ত্রীকে নিয়ে তাদের পিছু পিছু চলেছে। তাকে দেখেই ছয় রাজপুত্র রেগে ভূত হয়ে গেছে আর ভেবেছে যে, একে বউ নিয়ে দেশে ফিরতে দেওয়া হবে না। মুখে কিন্তু 'ভাই, ভাই' বলে ভারি আদর দেখাতে লাগল, যেন তাকে কতই ভালবাসে। শেষে যখন বাড়ির কাছে এসেছে, তখন রাত্রে ঘুমের ভিতরে বেচারার হাত-পা বেঁধে তাকে জলে ফেলে দিল। ভাগ্যিস ছোট বউ টের পেয়ে তাড়াতাড়ি একটা বালিশ ফেলে দিয়েছিল, আর তাই ধরে অনেক কষ্টে সে কোনমতে ডাঙায় উঠল, নইলে সে যাত্রা আর উপায়ই ছিল না।

তারপর সকালবেলায় নৌকা এসে ঘাটে লাগল, রাজা খবর পেয়ে ছেলে বউদের আদর করে ঘরে নিতে এলেন। ছয় ছেলে এসে তাঁকে প্রণাম করল, রাজা তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার বানর কই?' তারা বলল, 'সে জলে ডুবে মারা গিয়েছে।'

বানর ত মরে নি, সে নদীর ধারে ধারে তাদের আগেই ঘাটে এসে গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। ওরা 'সে জলে ডুবে মারা গেছে' বলতেই বানর আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে রাজাকে প্রণাম করে বলল, 'আমি মরিনি বাবা, ওরা আমার হাত-পা বেঁধে আমাকে জলে ফেলে দিয়েছিল, আমি অনেক কষ্টে বেঁচে এসেছি।'

তখন ত রাজপুত্রদের মুখ চুন। রাজা ভয়ানক রেগে তাদের বললেন, 'বটে। তোদের এই কাজ? দূর ত তোরা আমার দেশ থেকে। আর তোদের মুখ দেখব না।'

এই বলে দুষ্টু ছেলেগুলিকে তাড়িয়ে দিয়ে রাজার যার পর নাই আদরের সহিত বানর আর ছোট বউকে ঘরে নিয়ে এলেন। বানরের মা ছেলেকে ফিরে পেয়ে আর এমন সুন্দর লক্ষী বউ ঘরে এনে যে কত সুখী হলেন তা বুঝতেই পার।

for more books visit www.rashal.com

তারপর খুব সুখেই তাঁদের দিন কাটতে লাগল। এর মধ্যে হয়েছে কি, বউমা দেখলেন যে বানর শুধু দিনের বেলায়ই বানর সেজে বেড়ায়; রাত্রে সে বানরের ছাল খুলে ফেলে দেবতার মত সুন্দর মানুষ হয়। এ কথা তিনি ছোটরানীকে বললেন, ছোটরানী আবার রাজাকে জানালেন। রাজা ত শুনে ভারি আশ্চর্য হয়ে এসে বললেন, 'বউমা, তুমি এক কাজ করো। আজ রাত্রে যখন সে বানরের ছাল খুলে ঘুমোবে, তখন তুমি সেই ছালটাকে পুড়িয়ে ফেলবে।

সেদিন বানরের শোবার ঘরের পাশের ঘরে মস্ত আগুন জ্বেলে রাখা হল, বানর তা জানতে পেল না। তারপর রাত্রে যেই ছাল খুলে রেখে সে ঘুমিয়েছে, অমনি রাজকন্যা চুপিচুপি নিয়ে সেটাকে সেই আগুনে ফেলে দিয়েছেন। সকালে বানর উঠে দেখে, তার ছাল নেই। তখন সে ত ধরা পড়ে গিয়ে খুবই ব্যস্ত হল, কিন্তু ব্যস্ত হয়ে কি হবে, আর বানর হবার জো নেই। দেখতে দেখতে সেই খবর দেশময় ছড়িয়ে পড়ল, আর ছেলেবুড়ো সকলে ছুটে এসে, সব শুনে ধেই ধেই করে নাচতে লাগল।

পাকা ফলার

পাড়াগাঁয়ে এক ফলারে বামুন ছিল। তাহাকে যাহারা নিমন্ত্রণ করিত, তাহারা সকলেই খুব গরিব, দৈ-চিঁড়ের বেশি কিছু দিবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না।

ব্রাহ্মণ শুনিয়াছিল, দৈ-চিঁড়ের ফলারের চাইতে পাকা ফলারটা ঢের ভাল। সুতরাং এরপর যে ফলারের নিমন্ত্রণ করিতে আসিল, তাহাকে সে বলিল, 'পাকা ফলার খাওয়াতে হবে।' সে বেচারা গরিব লোক, পাকা ফলার সে কোথা হইতে দিবে? তাই সে বিনয় করিয়া বলিল, 'মশাই, পাকা ফলার দেওয়া কি যার তার কাজ? রাজা রাজড়া হলে তবে পাকা ফলার দিতে পারে।' এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিল, 'তবে রাজা যেখানে থাকে, সেইখানে গিয়ে আমি পাকা ফলার খাব।'

ব্রাহ্মণ পাকা ফলার খাইবার জন্য রাজার বাড়ি চলিয়াছে। পথে যাহাকে দেখে, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করে, 'হ্যাঁগা, রাজার বাড়িটা কোনখান্‌টায়?' একজন তাহাকে রাজার বাড়ি দেখাইয়া বলিল, 'ঐ যে পাকা বাড়ি দেখছ, ঐটে রাজার বাড়ি।'

ব্রাহ্মণ 'পাকা ফলার' যেমন খাইয়াছে, 'পাকা বাড়ি'ও তেমনি দেখিয়াছে। সুতরাং, 'পাকা বাড়ি'র কথা শুনিয়া সে ভারি আশ্চর্য হইয়া রাজার বাড়ির দিকে তাকাইল। সে দেশের সব লোকেরই কুঁড়েঘরঃ খালি রাজার একটি সুন্দর পাকা বাড়ি ছিল। রাজার বাড়ি দেখিয়া ব্রাহ্মণের মুখে লাল পড়িতে লাগিল। সে গদগদ স্বরে বলিল, 'পাকা বাড়ি! আহা! পাকা বাড়িই বটে! না হবে কেন? সে যে রাজা, তাই সে অমন বাড়িতে থাকে। ওটা তয়ের করতে না জানি কত ক্ষীর, ছানা আর চিনি লেগেছিল!'

এ মনে করিয়া ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি গিয়া রাজার বাড়ির একটা কোণ কামড়াইয়া ধরিল; আবার তখনই 'উঃ- হু-হু' করিয়া কামড় ছাড়িয়া দিল।

তারপর সে ভাবিতে লাগিল, 'তাই ত, এই পাকা ফলারের এত নাম!' আর খানিক ভবিয়া সে বলিল 'ওঃ হো! বুঝেছি। নারকেলের মতন আর কি! ওটা ওর খোলা; আসল জিনিসটা ভিতরে আছে!' এই বলিয়া সে আগের চাইতে দ্বিগুণ উৎসাহে কামড়াইতে আরম্ভ করিল। তাহার দুইটা দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল, তাহাতে গ্রাহ্য নাই। কামড়াইতে কামড়াইতে সে সেই কোণের অনেকখানি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, আর মনে করিতেছে যে, 'আর বেশী দেরী নেই, এরপরই পাকা ফলার আসবে!' এমন সময় কোথা হইতে মস্ত পাগড়িওয়ালা দারোয়ান আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। 'আরে ঠাকুর, ক্যা করতে হো? মহারাজকে ইমারত খা ডাল্‌তে হো? চলো তুম হমারে সাথ।' এই বলিয়া দারোয়ান তাহাকে রাজার নিকট লইয়া চলিল।

দারোয়ানের কাছে সকল কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, 'কি ঠাকুর, ওখানে কি করছিলে?' ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, 'মহারাজ! আমি পাকা ফলার খাচ্ছিলুম। খোলাটা না ভাঙ্গতেই এই বেটা দারোয়ান আমাকে ধ'রে এনেছে!'

এই কথা শুনিয়া রাজামহাশয় হো-হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন, আর বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, ঠাকুরের পেটে অনেক বুদ্ধি। যাহা হউক, তাহার সাধাসিধা কথাগুলি রাজার বেশ ভাল লাগি। সুতরাং তিনি হুকুম দিলেন যে, এই ব্রাহ্মণকে পেট ভরিয়া পাকা ফলার খাইবার মত ময়দা, ঘি আর মিঠাই দাও।

for more books visit www.rasmal.com

ব্রাহ্মণ মনের সুখে রাজাকে আশীর্বাদ করিতে করিতে ময়দা, ঘি আর মিঠাই লইয়া ঘরে ফিরিল। আসিবার সময় বলিয়া আসিল যে, পাকা ফলার খাইয়া আবার রাজামশাইকে আশীর্বাদ করিতে আসিবে।

পরদিন সকালে রাজামহাশয়, মুখ হাত ধুইয়া সভায় আসিয়াই সেই ব্রাহ্মণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ঠাকুর, কাল পাকা ফলার খেলে কেমন? ব্রাহ্মণ বলিল, 'মহারাজ অতি চমৎকার খেয়েছি, পাকা ফলার কি আর মন্দ হতে পারে? গুঁড়োগুলো আগে গলায় বড্ড আটকাচ্ছিল! জল দিয়ে গুলে নিতে শেষে তরল হল, কিন্তু অর্ধেক খেতে না খেতেই বমি হয়ে গেল।'

ময়দা আর ঘি দিয়া যে লুচি তৈয়ার করিতে হয়, ব্রাহ্মণ বেচারা তাহা জানিত না। কাজেই সে ঐ কাঁচা ময়দাগুলিকেই ঘি আর মিঠাই দিয়া মাখিয়া খাইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছে। সহজে তরল হয় না দেখিয়া, আবার তাহার সঙ্গে জল মিশাইয়াছে। খাইতে তাহার খুব ভালই লাগিয়াছিল। তবে, পেটে রহিল না, এই যা দুঃখ।

রাজা দেখিলেন, লুচি নিজে তয়ের করিয়া খাইতে হইলে আর ব্রাহ্মণের ভাগ্যে পাকা ফলার ঘটিতেছে না। সুতরাং তিনি তাঁহার রসুয়ে বামুনদের একজনকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'এখান থেকে ময়দা ঘি নিয়ে, তোমার বাড়িতে লুচি তয়ের ক'রে, এই ঠাকুরকে পেট ভ'রে পাকা ফলার খাইতে দাও।'

রসুয়ে বামুন ফলারে বামুনকে তাহার বাড়ি দেখাইয়া বলিল, 'আমি ফলার তয়ের করে রাখব, বিকালে আসিয়া আপনি খাবেন। আমি বাড়ি থাকব না, আমার ছেলে আপনাকে খেতে দেবে এখন।' ব্রাহ্মণ রাজি হইয়া বাড়ি গিয়া বিকাল বেলার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

রসুয়ে বামুনের সেই ছেলেটা ভাল লোক ছিল না; একটা চোরের সঙ্গে তাহার বন্ধুতা ছিল। রসুয়ে বামুন ফলারে বামুনের জন্য লুচি, সন্দেশ ইত্যাদি তয়ের করিয়া তাহার ছেলেকে বলিল, 'সেই লোকটি এলে তাকে বেশ ক'রে খাওয়াস।' তাহার ছেলে বলিল, 'তার জন্যে কিছু চিন্তা করো না, আমি তাকে খুব যত্ন ক'রে খাওয়াব এখন।' রসুয়ে বামুন রাজবাড়ির রান্না করিতে চলিয়া গেল; আর তাহার ছেলে ফলারে বামুনের খাবারের আয়োজনে মন দিল। দু সেরের বেশি লুচি আর তাহার মত তরকারি মিঠাই ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়াছিল। খানচারেক লুচি আর খানিক তরকারি ফলারে বামুনের জন্য রাখিয়া, আর সমস্ত সেই হতভাগা তাহার সেই বন্ধু আর নিজের জন্য রাখিয়া দিল। ফলারে বামুন আসিলে পর সে সেই চারখানা লুচি তাহাকে খাইতে দিল। সে বেচারা জন্মেও লুচি খায় নাই, তাহাতে আবার এমন চমৎকার লুচি-রাজার বামুন ঠাকুর তয়ের করিয়াছে। এমন জিনিস দু-চারখানি মাত্র খাইয়া তাহার পেট ত ভরিলই না, বরং তাহার ক্ষুধা বাড়িয়া গেল। সে খালি দুঃখ করিতে লাগিল, 'আহা! আর যদি খানকতক দিত।'

রসুয়ে বামুনের বাড়ি হইতে বাহির হইয়া ফলারে বামুন রাস্তা দিয়া চলিল। তাহার মনের দুঃখ রাখিবার আর জায়গা দেখিতেছে না। চলে, আর খালি বলে, 'আহা! আর যদি খানকতক দিত।'

এখন সময় হইয়াছে কি, রাজার প্রধান ভাণ্ডারী সেই রাস্তা দিয়া চলিয়াছে। সে নিজের হাতে সেদিন সকাল বেলায় ঐ ফলারে বামুনের জন্য পুরো দু সের ময়দা আর তাহার মতন অন্য সব জিনিস মাপিয়া দিয়াছে। ফলারে বামুনের মুখে ঐ কথা শুনিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি ঠাকুরমশাই! কি যদি আর খানকতক দিত।' ফলারে বামুন বলিল, 'বাবা আমি পাকা ফলারের কথা বলছি। রাজামশাই চিরজীবি হউন, আমাকে এমন জিনিস খাইয়েছেন! খালি যদি আর খানকতক হত।'

ভাণ্ডারী জিজ্ঞাস করিল, 'আপনাকে কখানা দিয়েছিল?' ফলারে বামুন বলিল, 'চারখানি পাকা ফলার আমাকে দিয়েছিল।' ভাণ্ডারী সবই বুঝিতে পারিয়া বলিল, 'সে কি ঠাকুরমশাই! দু সের ময়দা দিয়েছি, তাতে কি মোটে চারখানা লুচি হয়?' ব্রাহ্মণ বলিল, 'হ্যাঁ বাপু, চারখানাই ছিল। আর তাতে খুব চমৎকার লেগেছিল। ভাণ্ডারী বলিল, 'দু সের ময়দায় তার চেয়ে ঢের বেশী লুচি হয়। আমার বোধ হচ্ছে, ঐ রসুয়ে বামুনের ছেলেটা বাকি লুচিগুলো মাচায় তুলে রেখেছে। আপনি আবার যান। এবারে গিয়ে একেবারে মাচায় উঠবেন। দেখবেন আপনার লুচি সেখানে আছে।' ব্রাহ্মণ বলিল, তাই নাকি? বাপু তুমি বেচে থাকো। 'হতভাগা বেল্লিক, বাঁদর, শয়তান পাজি' বলতে বলতে ব্রাহ্মণ সেই রসুয়ে বামুনের বাড়ির পানে ছুটিল। গালিগুলি অবশ্য ভাণ্ডারীকে দেয় নাই-রসুয়ে বামুনের ছেলেকে দিয়াছিল।

রসুয়ে বামুনের ছেলে ফলারে বামুনকে চারিখানি লুচি খাওয়াইয়া বিদায় করিয়াই, তাহার সেই চোর বন্ধুর কাছে গিয়াছিল। সেখানে গিয়া সে চোরকে বলিল, 'বন্ধু ঢের লুচি তয়ের ক'রে মাচার উপর রেখে এসেছি। তুমি শিগ্‌গির যাও। আমিও এই বাজার থেকে একটা জিনিস নিয়ে এখনি আসছি।'

for more books visit www.rashal.com

চোর রসুয়ে বামুনের মাচার উপর উঠিয়া সবে লুচির ডাকনা খুলিতে যাইবে, এমন সময় ফলারে বামুন আসিয়া উপস্থিত। এবারে কথাবার্তা নাই, একেবারে মাচায় গিয়া উঠিল। চোর মুশকিলে পড়িল। লুকাইবার স্থান নাই, পলাইবার পথ নাই। এখন সে যায় কোথায়? শেষটা আর কি করে, মাচার কোণে একটা কাঠের থাম জড়াইয়া কোনরকমে বেমালুম হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। একে 'সন্ধ্যাকাল' তাহাতে আবার ফলারে বামুন নিতান্তই সাধাসিধে লোক, লুচি খাইবার জন্য তাহার মনটা যার পর নাই ব্যস্ত রহিয়াছে। সুতরাং চোরকে সে দেখিতে পাইল না। ফলারে বামুন সামনে লুচি, সন্দেশ, তরকারি মিঠাই সাজানো দেখিয়া খাইতে বসিয়া গেল। পেটে যত ধরির, তত সে খাইল। আর একটি হজমি গুলির স্থানও নাই।

এমন সময় ভারি একটা মজা হইল। রসুয়ে বামুনের ছেলেও বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, আর ঠিক সেই সময় রসুয়ে বামুনও আসিয়াছে। অন্যদিন সে প্রায় দুপুর রাত্রের পূর্বে ফিরে না, কিন্তু সেদিন সে ভুলিয়া একটা ঝাঁজরা ফেলিয়া দিয়াছিল, সেটার ভারি দরকার। ছেলে আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবা, তুমি এখনি ফিরে এলে যে?' রসুয়ে বামুন বলিল, 'ঝাঁজরা ফেলে দিয়েছিলুম, তাই নিতে এসেছি।'

এতক্ষণে ফলারে বামুনের পেট এত বোঝাই হয়েছে যে, আর-একটু হইলেই তাহার দম আটকায়। পিপাসায় গলা শুকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেখানে জল নাই। সে 'জল জল' বলিয়া চেঁচাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ভাল করিয়া কথা ফুটিল না।

রসুয়ে বামুন তাহার ছেলেকে বলিল, 'ওটা কি রে?' ছেলে দেখিল, ভারি মুশকিল। সে ফলারে বামুনের কথা ত আর জানত না, কাজেই সে মনে করিয়াছে যে ওটা তাহার বন্ধু, গলায় সন্দেশ আটকাইয়া বিশ্রী স্বরে জল চাহিতেছে। বন্ধুর খবরটা বাপকে দিলে সে আর বন্ধুর হাড় আস্ত রাখিবে না, আর কিছু না বলিলেও হয়ত এখনই মাচায় উঠিয়া দেখিবে। এমন সময় হঠাৎ তাহার বুদ্ধি জোগাইল- সে বলিল, 'বাবা, ওটা নিশ্চয়ই ভূত। তা নইলে মাচায় থেকে অমন বিশ্রী আওয়াজ দেবে কেন?'

ভূতের কথা শুনিয়া রসুয়ে বামুন কাঁপিতে লাগিল। আরো মুশকিলের কথা এই যে, ভূতটা জল চাহিতেছে। তাহার কাছে জল লইয়া যাইতে কিছুতেই ভরসা হইতেছে না, অথচ জল না পাইলে সে নিশ্চয়ই ভয়ানক চটিয়া যাইবে। তার সে কি করে তাহার ঠিক কি? ছেলের ভারি ইচ্ছা যে, সে ভূতকে জল দিয়া আসে। কিন্তু রসুয়ে বামুন বলিল, 'তা হবে না, যদি তোর ঘাড় ভেঙ্গে দেয়।' এই সময়ে তাহার মনে হইল যে, মাচার উপর কয়েকটা নারকেল ছাড়ানো আছে, সুতরাং সে ভূতকে বলিল, 'মাচায় নারকেল আছে, থামে আছড়ে ভেঙ্গে খাও।'

ফলারে বামুনের হাতের কাছেই নারকেলগুলি ছিল। সে তাহার একটা হাতে লইয়া থামে আছরাইয়া ভাঙ্গিতে গেল। যে থাম জড়াইয়া চোর দাঁড়াইয়াছিল, ব্রাহ্মন পিপাসার চোটে থাম মনে করিয়া সেই চোরের মাথাতেই নারকেল আছড়াইয়া বসিয়াছে বাড়ি-একেবারে মাথা ফাটাইয়া ফেলিবার জোগাড় আর কি!

এরপর একটা মস্ত গোলমাল হইল। নারকেলের বাড়ি খাইয়া চোর ভয়ানক চেঁচাইয়া উঠিল। আর তাহাতে ভয়ানক চমকাইয়া গিয়া ব্রাহ্মণের হাঁউমাঁউ করিতে লাগিল। গোলমাল শুনিয়া পাড়ার সমস্ত লোক সেখানে আসিয়া জড়ো হইল। আসল কথাটা জানিতে এরপর আর বেশী দেরি হইল না। চোর ধরা পড়িল, আর রসুয়ে বামুন তাহার ছেলেকে সেই ঝাঁজরা দিয়া এমনি ঠেঙান ঠেঙাইল যে কি বলিব!

দুঃখীরাম

দুঃখীরাম খুব গরীব ঘরের ছেলে ছিল। সকলে তাহাকে দুঃখীরাম বলিয়া ডাকিত, কিন্তু তাহার এর চাইতে ঢের ভাল একটা নাম ছিল-সেটা আমি ভুলিয়া গিয়াছি।

দুঃখীরামের যখন দুই বৎসর বয়স, তখন তাহার মা-বাপ মরিয়া গেল। পৃথিবীতে তাহার আপনার বলিতে আর কেহই ছিল না, খালি ছিল মামা কেষ্ট। দু বছরের ছেলে দুঃখীরাম মামার খবর কিছুই জানিত না, তাহার মামাও তাহার কোন খবরই লইল না। কাজেই পাড়ার লোকেরা দয়া করিয়া তাহাকে মানুষ করিতে লাগিল। তখন হইতেই লোকে তাহাকে দুঃখীরাম বলিয়া ডাকিত।

গরীবের ছেলে দু বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাওয়াই অনেক সময় মুশকিল হয়, এর উপর আবার কে তহাকে লেখাপড়া শিখাইবে? অন্য ছেলেদের ফেলিয়া দেওয়া ছেঁড়া বই পড়িয়া আর পাড়ার লোকের খুঁটিনাটি কাজ করিয়া তাহার দিন যাইতে লাগিল। ইহার মধ্যে একদিন দুঃখীরাম শুনিল যে কেষ্ট বলিয়া তাহার এক মামা আছে। শুনিয়াই সে মনে করিল যে, একবার মামার বাড়ি যাইতে হইবে।

for more books visit www.rashal.com

অনেক সন্ধান করিয়া শেষে সে কেষ্টর বাড়ি বাহির করিল। কেষ্ট তাহাকে দেখিয়াই বলিল, 'তাই ত, দুঃখীরাম এসেছ! এখানে কত কষ্ট পাবে, তা ত জান না। আমরা দু মাসে একদিন খাই, কাল খেয়েছি, আবার দু মাস পরে খাব।'

দুঃখীরাম বলিল , 'মামা, তার জন্য ভাবনা কি? তোমরা যখন খাবে, আমিও তখনই খাব।' কেষ্ট আর কিছুই বলিল না। দুঃখীরামও আর কিছু বলিল না। মামার বাড়িতে খালি মামা আর মামাত ভাই হরি ছাড়া আর কেহ নাই। মামাত ভাইকে সে দাদা বলিয়া ডাকিতে লাগিল।

সারাদিন কেষ্ট আর হরি কেহই কিছু খাইল না। কাজেই দুঃখীরামেরও খাওয়া জুটিল না। দুঃখীরাম এর চাইতে অনেক বেশী সময় না খাইয়া কাটাইয়াছে, সুতরাং তাহার বড় একটা ক্লেশও হইল না। সন্ধ্যার সময় সে কেষ্টকে বলিল, 'মামা বড্ড ঘুম পেয়েছে, আমি ঘুমোই।' ইহাতে কেষ্ট যেন ভারি খুশি হইল, আর তখনই তাহাকে একটু মাদুর বিছাইয়া দিল। দুঃখীরাম সেই মাদুরে চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

খানিক পরে কেষ্ট আর হরি আসিয়া তাহার পাশেই ঘুমাইতে লাগিল। আসল কথা, কেহই ঘুমায় নাই- মামা খালি ভাবিতেছে, কতক্ষণে ঘুমাইবে, আর দুঃখীরাম ভাবিতেছে, এরপর মামা কি করে।

দেখিতে দেখিতে হরির নাক ডাকিল। দুঃখীরাম বুঝিল যে দাদা ঘুমাইয়াছে, আর একটু পরে দুঃখীরাম পাশে একটা থচমচ শব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারিল যে, এবারে মামা উঠিয়াছে। এরপর হেঁশেলে হাঁড়ি নাড়ার শব্দ হইল। তারপর হাঁড়ি ধোয়ার খলখল শব্দ, উনান ধরাইবার ফুঁ-সকলই শুনা গেল। দুঃখীরামের আর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। তখন সে চুপি চুপি উঠিয়া রান্নাঘরের বেড়ার ফুটা দিয়া দেখিল, কেউ পায়েস রাঁধিতেছে।

দুঃখীরাম এক-একবার উঠিয়া দেখে, আবার আসিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকে। যখন সে দেখিল যে, পায়েস প্রস্তুত হইয়াছে, তখন হাউমাউ করিয়া উঠিয়া বসিল। গোলমাল শুনিয়া কেষ্ট তাড়াতাড়ি রান্নাঘর হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি রে দুঃখীরাম, কি হইয়াছে?'

দুঃখীরাম বলিল, "মামা, ও ঘরে তুমি কি করছিলে, আর একজন লোক বেড়ার ফুটো দিয়ে উকি মারছিল।" দুঃখীরাম নিজের কথাই বলিয়াছে, কিন্তু কেষ্ট মনে করিল বুঝি চোর আসিয়াছে। তাই সে লাঠি হাতে ঘরের পেছনে বনের ভিতরে চোর তাড়াইতে ছুটিল।

তখন দুঃখীরাম তাহার দাদাকে ঠেলিয়া তুলিয়া বলিল, 'দাদা, শিগ্‌গির ওঠো, মামা একটা লাঠি হাতে তাড়াতাড়ি কোথায় যেন বেরিয়ে গেলেন।'

হরি বেচারার মনে ভারি ভয় হইল। সে মনে করিল যে লাঠি হাতে যখন গিয়াছে তখন নিশ্চয়ই একটু দূরে কোথাও গিয়াছে। তিন মাইল দূরে হরির ভগ্নীর বাড়ি, হয়ত হঠাৎ তাহার কোন ব্যারাম হইয়াছে, আর বাবা খবর পাইয়া তাহাকে দেখিতে গিয়াছে। এইরূপ ভাবিয়া হরি ব্যস্ত হইয়া তাহার ভগ্নীর বাড়ি চলিল। খানিক পরে কেষ্ট ফিরিয়া আসিল। সে চোরকে ধরিতে পারে নাই, লাভের মধ্যে বিছুটি লাগিয়া তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গিয়াছে। সে আসিয়া হরিকে দেখিতে না পাইয়া দুঃখীরামকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হরি কোথায় রে?'

দুঃখীরাম বলিল, মামা তুমিও গেলে, আর যে লোকটা তোমার ঘরে উঁকি মারছিল, সেই লোকটা দাদাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে তার সঙ্গে কথা কইল; আর দাদাও তখ্‌খুনি বেরিয়ে গেল।'

ইহা শুনিয়া কেষ্ট মনে করিল যে হরি নিশ্চয়ই পাড়ার দুষ্টু ছেলের সঙ্গে জুটিয়া তাস খেলিতে গিয়াছে। সুতরাং হরি এবং সেই পাড়ার দুষ্ট ছেলেটার উপর তার ভয়ানক রাগ হইল, আর সেই লাঠি হাতে করিয়াই সে তাহার সঙ্গীকে শাস্তি দিবার জন্য পাড়া খুঁজিতে বাহির হইল।

দুঃখীরাম যখন দেখিল যে, ওর মামা আর দাদার বাড়ি ফিরিতে একটু বিলম্ব হইবে, তখন সে আস্তে আস্তে রান্নাঘরে গিয়া পায়েসের হাঁড়ি নামাইল। একে দুঃখীরামের বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছিল, তার উপর আবার তার মামা রাঁধে বড় সরেস। সুতরাং দেখিতে দেখিতে সেই পায়েসের হাঁড়ি খালি হইয়া গেল। তারপর দুঃখীরাম আবার সেই মাদুরে শুইয়া আরামে নিদ্রা গেল।

হরি ভগ্নীর বাড়িতে গিয়া তাহাকে ভালই দেখিতে পাইল। কিন্তু সে রাত্রে তাহার বোন আর তাহাকে বাড়ি ফিরিয়া আসিতে দিল না। এদিকে কেষ্ট তাহাকে আকাশ পাতাল খুঁজিতেছে, এবং কোথাও তাহাকে না পাইয়া রাগে আর বিছুটির জ্বলায় ছটফট করিতেছে। সুতরাং ভোরবেলা হরি যেই বাড়ি ফিরিয়া আসিল, অমনি কেষ্ট সেই লাঠি দিয়া তাহাকে কয়েক ঘা লাগাইল।

for more books visit www.rashal.com

এইরূপে সমস্ত রাত্রি নাকাল হইয়া, শেষে রান্নাঘরে গিয়া সে দেখে-পায়েসের হাঁড়ি খালি। তখন আর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। দুঃখীরাম সকালে উঠিয়া অবধি কেমন আড়চোখে চায় আর একটু হাসে। সুতরাং তাহা যে দুঃখীরামের কাজ, বেশ বুঝা গেল।

পরদিন বাপ-বেটায় মিলিয়া রাজার নিকট নালিশ করিতে গেল। রাজা দুঃখীরামকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁরে তুই এমন কাজ কেন করলি? ওদের পায়েস চুরি করে কেন খেলি? মিছে কথা বলে কেন ওদের নাকাল করলি?

দুঃখীরাম হাত জোড় করিয়া বলিল, 'দোহাই ধর্মাবতার! ওঁরা দু মাসে একদিন খান। পরশু খেয়েছিলেন, আবার কাল পায়েস রাঁধলেন কেন? ওঁরাই বলুন। তারপর নাকাল করার কথা বলছেন? তা আমি ত সত্যি কথাই বলছি,তাতে যদি ওঁরা খামকা নাকাল হতে গেলেন, তা আমার কি দোষ?'

রাজা আগাগোড়া সমস্ত শুনিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। মোকদ্দমা ডিসমিস হইয়া গেল।

দুঃখীরামকে বেশ চালাক চতুর দেখিয়া রাজা তাহাকে একটি চাকরি দিলেন। দুঃখীরাম এত ভাল করিয়া কাজ করিতে লাগিল যে, কয়েক বৎসরের ভিতরেই সেই সামান্য চাকরি হইতে ক্রমে সে ছোট মন্ত্রীর পদে উঠিল। বড় মন্ত্রীর পদ খালি হইলে যে তাহাও সে পাইবে, এ কথা সকলেই বলিতে লাগিলেন।

বড় মন্ত্রী লোকটা বড় সুবিধার ছিলেন না। দুঃখীরামকে তিনি ভারি হিংসা করিতেন, আর কি করিয়া তাহাকে জব্দ করিবেন, ক্রমাগত তাহাই ভাবিতেন।

এক সওদাগরের সাথে বড় মন্ত্রীর বন্ধুতা ছিল। সেই সওদাগরের একটা পক্ষিরাজ ঘোড়া ছিল। পক্ষিরাজ ঘোড়া মানুষের মত কথা কহিতে পারে, শূণ্যে উঠিয়া এক মাসের পথ এক মিনিটে যাইতে পারে, ভূত ভবিষৎ সব বলিয়া দিতে পারে। এই ঘোড়াটাকে পাইবার জন্য মন্ত্রীমহাশয় অনেক দিন হইতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সওদাগর কিছুতেই সেটা তাঁহাকে দিতে চায় না।

এরমধ্যে সওদাগর একবার বিদেশে গিয়াছিল, সেখান হইতে একটা খুব আশ্চর্য আমের আঁটি লইয়া আসিয়াছে। সে আঁটির এই গুণ যে, তাহা পুতিবামাত্র গাছ হয়, তাতে তৎক্ষণাৎ আম হয়, তখনই সেটা পাকে, আর তখনই তাহা খাওয়া যায়। খাওয়ার পর আবার সেই আঁটি মাটির ভিতর হইতে তুলিয়া বাক্সে পুরিয়া রাখা যায়।

মন্ত্রীমহাশয় সওদাগরের চাকরকে টাকা দিয়া বশ করিলেন। সে তাঁহার কথায় সওদাগরের আমের আটি সিদ্ধ করিয়া রাখিল। তারপর একদিন মন্ত্রীমহাশয় সওদাগরের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বন্ধু, তুমি নাকি ভারি আশ্চর্য একটা আমের আঁটি আনিয়াছ?' সওদাগর বলিল, 'হ্যাঁ বন্ধু, সেটাকে পুতিলে তখনই গাছ হয়, তখনই তাতে ফল হয়, তখনই তাহা পাকে, তখনই তাহা খাইয়া আঁটিটি আবার বাক্সে রাখিয়া দেওয়া যায়।'

মন্ত্রীমহাশয় নাক মুখ সিঁটকাইয়া বলিলেন, 'ও কথা আমার বিশ্বাস হয় না।'

সওদাগর বলিল , 'আচ্ছা বাজি রাখুন। আমার কথা সত্য হয় ত কি হইবে?' মন্ত্রী বলিলেন, 'তাহা-হইলে পরদিন আমার বাড়িতে গিয়া প্রথমে যে জিনিসটাতে হাত দিবে সেইটা তোমার, আর যদি তোমার কথা সত্য না হয়?' সওদাগর বলিল, 'তবে আপনি পরদিন আমার বাড়িতে আসিয়া প্রথমে যাহাতে হাত দিবেন, তাহাই আপনার হইবে।'

ঠিক হইল, পরদিন সওদাগরের বাড়িতে মন্ত্রীমহাশয়ের নিমন্ত্রণ, আর তখন আমের আঁটির পরীক্ষা হইবে। আঁটি সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সুতরাং পরীক্ষার ফল কি হইল তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। সওদাগর বেচারার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এবারে সে বুঝিতে পারিল, আর পক্ষিরাজ ঘোড়াকে রাখিতে পারিবে না।

অনেক ভাবিয়া কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া শেষে সওদাগর ছোট মন্ত্রীর কাছে গেল। সেখানে হাত জোড় করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথা নিবেদন করিল। বুদ্ধিমান ছোট মন্ত্রী একটু চিন্তা করিয়া উপায় বলিয়া দিলেন। সওদাগর সন্তুষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরিয়া পক্ষিরাজ ঘোড়ার আস্তাবলের দরজা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া সুখে নিদ্রা গেল।

for more books visit www.rashal.com

পরদিন ভোর হইতে না হইতেই মন্ত্রীমহাশয় সওদাগরের বাড়ি গিয়া ডাকিতে লাগিলেন, 'বন্ধু!' 'বন্ধু!' সওদাগর শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। মন্ত্রীমহাশয় একটু বসিবার দেরি সয় না। তিনি না বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কই বন্ধু সে কথার কি হইল?' সওদাগর বলিল, 'আমি প্রস্তুত আছি, এখন আপনার যাহাতে খুশি হাত দিয়া লইয়া যাইতে পারেন।' মন্ত্রীমহাশয় অমনি আস্তাবলের দিকে চলিলেন। সওদাগরও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

আস্তাবলের দরজা বাঁধা ছিল। মন্ত্রীমহাশয় দড়ি ধরিয়া এক টান দিয়া বাঁধন খুলিয়া ফেলিলেন। অমনি সওদাগর বলিল, 'সে কি বন্ধু। আপনার মতন লোকের ঐ সামান্য দড়ি গাছাটায় লোভ! একটা কোন দামী জিনিস লইলে সুখী হইতাম।' মন্ত্রীর ত চক্ষু স্থির! অত সহজে ঠকিবেন, তাহা তিনি মনেও করিতে পারেন নাই। সওদাগরের কথার উত্তর দিতে না পারিয়া আমতা আমতা করিয়া ঘরে ফিরিলেন।

পথে যাইতে যাইতে মন্ত্রীমহাশয় স্থির করিলেন যে, ছোট মন্ত্রী ছাড়া এ আর কাহারো কর্ম নয়। তারপর যখন শুনিলেন যে, সেদিন রাত্রে সওদাগর ছোট মন্ত্রীর বাড়ি গিয়াছিল তখন বুঝিলেন, নিশ্চয় ইহা ছোট মন্ত্রীর কাজ।

পরদিন দুপুরবেলা যখন রাজা ঘুমাইতেছিলেন, তখন মন্ত্রীমহাশয় গিয়া জোড়হাতে তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। খানিক পরে রাজা চক্ষু মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি মন্ত্রী?' মন্ত্রী বলিলেন, 'দোহাই মহারাজ! সুলক্ষণ সওদাগরের একটা পক্ষিরাজ ঘোড়া আছে, কিন্তু মহারাজের আস্তাবলে একটাও পক্ষিরাজ ঘোড়া নাই।' রাজা বলিলেন, 'বটে! ও ঘোড়া আমার চাই।' মন্ত্রী আর বিনয় করিয়া কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলিলেন, মহারাজের যাহাতে ভাল হয় আমার সেই চেষ্টা, আর ছোট মন্ত্রী দিনরাত তাহাতে বাধা দেয়।' রাজা বলিলেন, 'সে কিরকম?' মন্ত্রী বলিলেন, 'মহারাজের জন্য সেই পক্ষিরাজ ঘোড়া আমি আনিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু ছোট মন্ত্রী সুলক্ষণকে মন্ত্রণা দিয়া সে ঘোড়া আনিতে দেয় নাই।'

রাজার মেজাজ সেকালে বড়ই অস্থির ছিল। সহজেই সন্তুষ্ট হইতেন, আর সামান্য কথাতেই চটিয়া উঠিতেন। বকশিশ দিতেন ত অর্ধেক রাজ্যই দিয়া ফেলিতেন, আর সাজা দিতেন ত মাথাটাই কাটিয়া ফেলিতেন। রাজা ছোট মন্ত্রীর উপর এতদিন সন্তুষ্ট ছিলেন, তাই তাহাকে ছোট মন্ত্রী করিয়াছিলেন। আজ বড় মন্ত্রীর কথা শুনিয়া এতই চটিয়া গেলেন যে, তখনই তাহাকে হাত-পা বাঁধিয়া আনিতে হুকুম দিলেন। বেচারা কোন বিপদের কথা জানিতেন না, সুখে ঘুমাইতেছিল, এমন সময় রাজার লোক আসিয়া তাহার হাত-পা বাঁধিয়া লইয়া চলিল।

দুঃখীরামের এই সাজার হুকুম হইল যে, তাহাকে থলের ভিতর পুরিয়া পাথর বাঁধিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইবে। রাজামশায়ের সামনেই থলে আর পাথর আনিয়া সব বাঁধিয়া ঠিক করা হইল,তারপর রাজা চারিটা জল্লাদকে যে, 'একে সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়া আয়।'

দুঃখীরামকে সকলেই ভালবাসিত। সুতরাং তাহার এই সাজার কথা শুনিয়া সকলেরই ভারি ক্লেশ হইল। পথে যাইতে যাইতে জল্লাদেরা চুপিচুপি পরামর্শ করিল যে, এমন ভাবে লোককে কখনই সমুদ্রে ফেলিয়া মারা হইবে না। এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা সমুদ্রের ধারে একটা বনের ভিতরে দুঃখীরামকে রাখিয়া থলের মুখ খুলিয়া দিয়া আসিল। আসিবার সময় তাহাকে একখানি কুড়াল আর এক টুকরো নেকড়া দিয়া বলিয়া আসিল, 'ছোট মন্ত্রীমশাই, আমরা আর তোমাকে কি দিতে পারি, এই নেকড়া ও কুড়াল নাও, কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করে খেও। তোমার দোহাই ছোট মন্ত্রীমশাই, আমাদের রাজার দেশে যেও না। সেখানে তোমাকে দেখতে পেলে রাজা তোমাকেও রাখবে না, আমাদেরও রাখবে না।

দুঃখীরাম এখন কাঠুরে হইয়াছে, লম্বা লম্বা চুল দাড়ি গোঁফ রাখিয়াছে আর নিজের পোষাকটা ফেলিয়া দিয়া সেই জল্লাদের দেওয়া নেকড়াখানা পরে। ভাল করিয়া স্নান না করাতে তাহার গায়ের রং ময়লা হইয়া গিয়াছে। পেট ভরিয়া খাইতে না পাওয়াতে ঢের রোগা হইয়া গিয়াছে। এখন তাহাকে দেখিলে আর চট করিয়া চেনা যায় না। এইরূপ অবস্থায় কষ্টে দুঃখীরামের দিন কাটিতে লাগিল।

একদিন কাঠ কাটিতে বাহির হইয়া দুঃখীরাম দেখিল যে, ঝরনার ধারে গাছতলায় এক বুড়ি ঘুমাইতেছে। সে এতই বুড়া হইয়াছে যে, তেমন বুড়ামানুষ আর দুঃখীরাম কখনো দেখে নাই। বুড়িকে দেখিয়া সে চলিয়া যাইতেছে, এমন সময় দেখিল যে, একটা বিষাক্ত সাপ চুপিচুপি সেই বুড়ির দিকে যাইতেছে। দুঃখীরাম তখনই কুড়াল দিয়া সাপটাকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল আর সেই টুকরাগুলি ঝরনার জলে ফেলিয়া দিল। কি আশ্চর্য! সেই টুকরাগুলি জলে পড়িবামাত্র জলটা টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল। তাহার শব্দ শুনিয়া বুড়ি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিল।

বুড়ি খানিক অবাক হইয়া ঝরনার দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর দঃখীরামকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কে বাবা?' দুঃখীরাম বলিল, 'আমি দুঃখীরাম"' বুড়ি বলিল, 'বাবা, তুমি কি চাও?' দুঃখীরাম বলিল, 'আমি কিছুই চাই না। তুমি বুড়োমানুষ বনের ভিতর কোন আসিয়াছ?

for more books visit www.rashal.com

কত জন্তু আছে, শীঘ্র চলিয়া যাও।' বুড়ি বলিল, 'বাপু, তুমি আমাকে প্রাণে বাঁচাইয়াছ, আমি তোমাকে কিছু না দিয়া অমনি যাইতে পারিতেছি না।' দুঃখীরাম কিন্তু কিছুই লইবে না, সুতরাং বুড়ি চলিয়া গেল। কিন্তু যাইবার সময় চুপিচুপি বলিয়া গেল, 'তুমি কিছু লইলে না-আচ্ছা আমি তোমাকে এক বর যাইতেছি যে, তুমি যাহা ইচ্ছা কর তাহাই হইবে।' দুঃখীরাম ততক্ষণে কুড়াল হাতে অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং এ সকল কথা সে শুনিতে পাইল না।

আজ দুঃখীরামের ঢের বেলা হইয়া গিয়াছে। কখন কাঠ কাটা হইবে, সেই কাঠ বাজারে বিক্রি হইবে, তবে তাহার পেটে দুটি ভাত পড়িবে। এ-সকল কথা ভাবিয়া বেচারীর মনটা একটু দঃখিত ছিল, তাই তত সাবধান হইয়া পথ চলিতে পারিতেছে না। সামনে একটা ছোট গাছ পড়িয়াছিল, তাহাতে হোঁচট খাইয়া দুঃখীরাম পড়িয়া গেল। একে মন ভাল নহে, তাহার উপর এরূপ দূর্ঘটনা হইলে কাহার না রাগ হয়? দুঃখীরাম রাগিয়া বলিল, 'দূর হ ছাই। এ মুল্লুকে গাছপালা না থাকিলেই ভাল ছিল।'

যেই এ কথা বলা, আর অমনি সেখানকার যত গাছপালা সব কোথায় চলিয়া গেল, যেখানে ভয়ানক বন ছিল,সেখানে খালি মাঠ ধূ ধূ করিতে লাগিল। কি সর্বনাশ! এখন কাঠই বা কোথা হইতে মিলে, আর দুঃখীরামের খাওয়াই বা কি করিয়া হয়? বেচারা ব্যাপার দেখিয়া একেবারেই অবাক! ইহার কারণ কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া আপনমনে খালি হাটিয়া চলিল। বেলা ঢের হইয়াছে ক্ষুধা আরো বেশী হইয়াছে, এমন অবস্থায় শুধু পথ চলিলেই কত কষ্ট, তাহাতে আবার হাতে প্রকাণ্ড কুড়াল। সে যে-সে কুড়াল নয়,জল্লাদের কুড়াল। সাধারন কুড়ালের দুখানার সমান তাহার একখানা ভারি হয়। সেদিন দুঃখীরামের কাছে সেটা যেন দশটা কুড়ালের মত ভারি ঠেকিতে লাগিল, আর সেটাকে বহিয়া নিতে ইচ্ছা হয় না। সুতরাং দুঃখীরাম সেটাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল আর পারি না, অত বড় কুড়ালের হাত পা-থাকা উচিত, তাহা হইলে আমার সঙ্গে চলিতে পারে।'

কুড়াল তাহাই করিল। কোথা হইতে মাকড়সার পায়ের মতন তাহার সব পা হইল। আর সে টুকটাক করিয়া দুঃখীরামের পিছু পিছু চলিল। দেখিয়া শুনিয়া বেচারার মাথায় আরো গোল লাগিয়া গেল। সে একভাবেই চলিয়া যাইতে লগিল, আর ভাবিতে লাগিল, হইল কি!

যাইতে যাইতে দুঃখীরাম একেবারে নিজের দেশের বাজারে গিয়া উপস্থিত। প্রভুভক্ত কুড়াল সঙ্গেই আছে। সে এমনিভাবে চলিয়াছে, যেন চিরকাল তাহার ঐরকম করিয়াই চলা অভ্যাস।

একটা কুড়াল যদি লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া তোমার সামনে দিয়া চলিয়া যায়, তুমি তাহা হইলে কি কর? আর তেমন একটা কুড়াল যদি বাজারে গিয়া উপস্থিত হয়,তাহা হইলে বাজারের লোকগুলিই বা কি করে? বাজারে প্রথম মোড়েই এক গোয়ালার দোকান। সেখানে এক বড়লোকের দারোয়ান ঘি কিনিতে আসিয়াছে। গোয়ালার হাতে ঘিয়ের বাটি দিয়া সবে সে পৈঠায় বসিয়া তামাকু খাইবার আয়োজন করিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখে, দুঃখীরামের সেই কুড়াল হাত-পা সুদ্ধ একেবারে তাহার সামনে উপস্থিত। 'হায় বাপ' বলিয়া চারি হাত-পা উর্দ্ধে উঠাইয়া দারোয়ানজী আপনিই এক লাফে একেবারে গোয়ালার ঘাড়ে গিয়া উঠিল। গোয়ালাও তাড়াতাড়ি দারোয়ানজীকে ঠেলিয়া মাখনের হাঁড়িতে, ঘরে দরজা আঁটিল। তারপর যখন দেখিল যে, সেটা কাহাকেও কিছু বলে না, তখন দরজা খুলিয়া তাহার পিছু পিছু তামাশা দেখিতে চলিল।

সেদিন বাজারে কেনাবেচা বন্ধ। বাবুদের চাকর যাহারা বাজার করিতে আসিয়াছিল, তাহারা সকলেই কুড়ালের পিছু পিছু চলিয়াছে, তাহাদের বাজার করা আর হয় নাই। দোকানীরাও তাহাই করিতেছে-পুলিশ-পাহারাদার সকলেই সেই কুড়ালের পিছু চলিয়াছে। চাকরদের সান লইতে বাবুরা আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেই কুড়ালের তামাশা দেখিতেই রহিয়া গেলেন। এইরূপ করিয়া দেশের প্রায় কল লোক সেইখানে আসিয়া জড়ো হইল। দুঃখীরামের সেই মামা আর মামাত ভাই কেষ্ট আর হরিও তাহাদের ভিতরে ছিল।

কেষ্ট আর হরি প্রথমে কুড়ালের তামাশা দেখিতেই ব্যস্ত ছিল, তারপর একবার যেই দুঃখীরামের মুখের উপর চোখ পড়িল, অমনি তাহাদের বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল। ভাল করিয়া দেখিয়া তাহারা বেশ বুঝিতে পারিল যে, এ দুঃখীরাম। সুতরাং তাহারা তাড়াতাড়ি মন্ত্রীর নিকট গিয়া খবর দিল, 'মন্ত্রীমহাশয়, সেই দুখেটা আসিয়াছে।' মন্ত্রী অবিলম্বে এই সংবাদ রাজাকে দিলেন আর বলিলেন, 'মহারাজ, কুড়াল কি কখনো হাঁটে? এ নিশ্চয় কোন জাদু-টাদু শিখিয়া বদ মতলবে এখানে আসিয়াছে। রাজা শুনিয়া বলিলেন, 'ঠিক বলিয়াছ, মন্ত্রী। এখনি দশজন সিপাহী পাঠাইয়া দাও, উহাকে বাঁধিয়া নিয়া আসুক।' রাজার হুকুমে দানবের মত দশটা পালোয়ান দুঃখীরামকে আনিতে চলিল।

এদিকে বাজারের লোকেরা দুঃখীরামকে তত গ্রাহ্য করে নাই, কিন্তু তাহার কুড়ালটাকে রাজার কাছে লইয়া যাইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সে কুড়ালের গায়ে কি ভয়ানক জোর! তাহার গলায় দড়ি বাঁধিয়া বাজারের সমস্ত লোক মিলিয়া কত টানিল, কিছুতেই তাহাকে এক

for more books visit www.rashal.com

পাও নাড়িতে পারিল না। বরং তাহারা যে দশ মিনিট ধরিয়া প্রাণপণে 'হিঁয়ো' করিয়াছে, ততক্ষণে দুঃখীরামের কুড়ালই তাহাদিগকে আধ মাইল খানেক টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

এমন সময় রাজার পালোয়ানেরা আসিয়া দুঃখীরামকে বাঁধিতে লাগিল। দুঃখীরমের কাছে আজ আর কিছুই আশ্চর্য বলিয়া বোধ হয় না। সে কেবল দেখিতেছে, এরপর কি হয়। স্বয়ং বড় মন্ত্রী পালোয়ানের সঙ্গে আসিয়াছেন,আর বলিতেছেন, 'শক্ত করিয়া বাঁধ।' এ কথা শুনিয়া দুঃখীরাম নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিল, 'অন্যে বেলা বলা খুব সহজ; তোমাকে একবার ওরকম করিয়া বাঁধিত তবে দেখিতে কেমন লাগে।'

অমনি চারটা পালোয়ান মন্ত্রীমশায়কে চিত করিয়া ফেলিয়া ঠিক দুঃখীরামের মতন করিয়া বাঁধিতে লাগিল। মন্ত্রীমহাশয় প্রথমে আশ্চর্য বোধ করিলেন, তারপর চটিয়া লাল হইলেন। কিন্তু পালোয়ানেরা তাঁহাকে গ্রাহ্য করিল না। রাগে মন্ত্রীমহাশয়ের কথা বাহির হইতেছে না, চোখ দুটো ফুটিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে, গলার শিরা ফুলিয়াছে, মুখে ফেনা উঠিতেছে। কিন্তু পালোয়ানেরা তথাপি তাহাকে বাঁধিতে কসুর করিতেছে না। বেশ করিয়া বাঁধিয়া তারপর পরীক্ষা করিয়া দেখিল, ঠিক দুঃখীরমের মতন বাঁধা হইয়াছে কি না। যখন দেখিল যে দুজনকেই ঠিক একরকম করিয়া বাঁধা হইয়াছে, তখন তাঁহাদিগকে কাঁধে করিয়া রাজার নিকট লইয়া চলিল। বাজারের লোকেরা এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

এই সকল লোক যখন রাজার কাছে উপস্থিত হইল, তখন রাজামহাশয়ের ভারি রাগ হইল এমনও নহে। মন্ত্রীর বাঁধন তিনি নিজ হাতে খুলিয়া দিলেন, তারপর তাঁহাকে লইয়া দুঃখীরমের বিচার করিতে বসিলেন। যে সকল পালোয়ান মন্ত্রীমশায়কে বাঁধিয়া আনিয়াছিল, প্রথমে তাহাদের ফাঁসির হুকুম হইল। দুঃখীরামের সম্বন্ধে একটা হুকুম দিবার পূর্বেই আহারের সময় হওয়াতে মাঝখানে রাজামহাশয় উঠিয়া গেলেন, খাওয়া-দাওয়ার পর দুঃখীরামের হুকুম হইবে।

দুঃখীরাম বেচারা সেই বাঁধা অবস্থাতেই পড়িয়া আছে। তাহার চারধারে বিস্তর প্রহরী আছে, দর্শকদিগেরও অধিকাংশই রহিয়া গিয়াছে। দুঃখীরামের দুঃখের কথা আর কি বলিব। অন্য কষ্টের বিষয় আর এখন ততটা ভাবে না, কিন্তু ক্ষুধা ত কিছুতেই থামিয়া থাকিবার নহে। রাজামহাশয়, মন্ত্রীমহাশয়, সকলেই আহার করিতে গিয়াছেন। কত সুখাদ্য জিনিস খাইয়া তাঁহারা পেট ভরিয়া আসিবেন। দুঃখীরাম দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, 'আহা, ওসব জিনিস যদি আমাকে কেহ এখন আনিয়া দিত!'

রাজা মহাশয় আহারে বসিয়াছেন, সোনার পাত্রে শত ব্যাঞ্জন সাজাইয়া তাঁহার সামনে রাখিয়াছে তাহার সুগন্ধে নাকে গেলে লম্বা লম্বা নিশ্বাস টানিতে ইচ্ছা হয়, জিভে জল আসে। হাত ধুইয়া সবে রাজামহাশয় খাইবার উপক্রম করিয়াছেন, অমনি থালাসুদ্ধ খাবার জিনিস কোথায় মিলাইয়া গেল! মন্ত্রীমহাশয়েরও ঐরূপ দশা হইল।

এদিকে দুঃখীরামের আপে শেষ না হইতে না হইতেই তাহার সামনে রাজা ও মন্ত্রীর আহারের সমস্ত আয়োজন আসিয়া হাজির হইল। দুঃখীরাম তাহাতে কিছুতেই আশ্চর্য বোধ করিল না। তাহার খালি দুঃখ হইতে লাগিল, 'হায় হাত পা বাঁধা!' বলিতে বলিতে তখনি তাহার বাঁধন খুলিয়া গেল, সে এক লাফে উঠিয়া বসিয়া দু হাতে লুচি, মাংশ, পোলাও, পায়স, মেঠাই, মোণ্ডা মুখে পুরিতে লাগিল।

প্রহরীরা ব্যাপার দেখিয়া এতক্ষণে হতবুদ্ধি হইয়া ছিল। হঠাৎ তাহাদের চৈতন্য হইল। একজন বলিল, 'আরে ধর, পালাবে।' আর একজন বলিল, 'কোথায় আর পালাবে, আমরা এতজন চারধারে দাঁড়িয়ে আছি। আহা, বেচারার সামনে এত জিনিস এসেছে,একটু খেয়ে নিতে দে।' ও কথা শুনিয়া সকলেই বলিল, 'আহা, থাক্ থাক্! দুঃখীরাম ইহাতে কৃতার্থ হইয়া বলিল, 'বাপুসকল, তোমরা রাজা হও।'

সেই রাজসভায় রাজার সিংহাসন ছিল। দেখিতে দেখিতে সেখানে তেমনি আরো হাজার সিংহাসন হইল। তারপর সকলেই রাজার মত বেশভূষা হইল, আর তাহারা এক-একটা সিংহাসনে উঠিয়া বসিল।

রাজামহাশয় সভায় আসিয়া দেখেন, তাঁহার মতন ঢের রাজা সভায় বসিয়া আছে। তাহারা তাহাকে বলিল, 'মহারাজ, উহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক।' রাজা আর কি করেন, এতগুলি রাজার অনুরোধ ঠেলিয়া ফেলা ত সহজ কথা নয়। কাজেই দুঃখীরাম তাড়াতাড়ি খালাস পাইল।

এমন সময় মন্ত্রীমহাশয় আসিয়া উপস্থিত। তিনি এতগুলি রাজাকে একঠাঁই দেখিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। যেদিকে চান সেই দিকেই রাজা, আর মন্ত্রীমহাশয় খালি দু হাতে সেলাম করেন। সেদিন পেটে ভাত অল্পই পড়িয়াছিল, তাহাও হাজার রাজাকে সেলাম করিতে করিতে কখন হজম হইয়া গেল।

for more books visit www.rashar.com

দুঃখীরামের কথা শুনিয়া মন্ত্রীমহাশয় যার পর নাই ব্যস্ত হইলেন। জোড়হাতে তিনি রাজাদিগকে অনুনয় করিতে লাগিলেন, 'দোহাই ধর্মাবতারগণ, পুনরায় ইহার বিচার করিতে আজ্ঞা হয়। এমন দুষ্ট লোককে সহজে ছাড়িয়া দিবেন না, কখন কার সর্বনাশ করে তার ঠিক নাই।' এই কথা শুনিয়া রাজাদের ভিতর হইতে একজন বলিল, 'সর্বনাশটা যে কে করলে, তা ত বুঝতে পারছি না। আমি তোমার মেথর ছিলাম, আর আজ আমাকে রাজা করে দিয়েছে। এই এখনি তুমি দু হাতে আমাকে কত সেলাম করলে!'

মন্ত্রীমহাশয় আশ্চর্য হইয়া দেখিলেন, সত্যি সত্যি তাঁহার মেথর রাজা সাজিয়া বসিয়া আছে, আর তিনি তাহাকে সেলাম করিয়াছেন। ক্রমে দেখা গেল যে, যত রাজা বসিয়া আছে সকলেই কেহ সহিস,কেহ পাইক, কেহ দারোয়ান, কেহ দোকানী, কেহ ভিখারী।

রাজামহাশয় আর মন্ত্রীমহাশয় লজ্জা রাখিবার আর স্থান পান না। রাজা তাড়াতাড়ি হুকুম দিলেন, 'আবার বিচার হইবে, উহাকে ধর।' কিন্তু কে ধরিবে? সবাই রাজা সাজিয়া বসিয়াছে, হুকুম খাটিতে কাহারো ইচ্ছা নাই, অগত্যা মন্ত্রীমহাশয়ই ধরিতে গেলেন। দুঃখীরাম তাহা দেখিয়া বলিল, "মন্ত্রীমহাশয়, অত কষ্ট করেন কেন? এই যে আমি হাজির আছি। কিন্তু আমার প্রাণদণ্ড হইলে আমাকে মারিবে কে? জল্লাদ যে রাজা হইয়া গিয়াছে। এখন আপনি আর রাজামহাশয় জল্লাদ হইলে তবে হয়।"

বলিতে বলিতে রাজা ও মন্ত্রীর সেই সুন্দর চেহারা আর জমকালো পোষাক কোথায় চলিয়া গেল, তাহার পরিবর্তে নেংটি-পরা, কুড়াল-হাতে, কালো ভূত দুই জল্লাদ জোড়হাতে হুকুমের অপেক্ষাকরিতে লাগিল। এখন হুকুম দেয় কে?

দুঃখীরাম এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছে যে, যে কারণেই হউক, সে যে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে, ঘটনায় তাহাই হইতেছে। ইচ্ছা করিলে এখন সে কি না করিতে পারিত। কিন্তু সে বলিল, 'মহারাজ আপনার নুন খেয়েছি, আপনার নিকট অকৃতজ্ঞ হইব না। আপনার রাজত্ব আপনারই রহিল। এখন আমাকে বিদায় দিতে আজ্ঞা হউক।'

লজ্জায় রাজামহাশয় মাথা হেট করিয়া আছেন। দুঃখীরামের কথার তিনি আর কি উত্তর দিবেন। কেবল বলিলেন, 'আমার সমস্ত রাজ্যই তুমি লইতে পারিতে, ইচ্ছা করিলে আমায় প্রাণেও মারিতে পারিতে। এখন তুমি যাহা বলিলে তাহাতে বুঝিলাম, তুমি মহৎ লোক। আমার অর্ধেক রাজ্য তোমার হউক, আমার কন্যাকে তুমি বিবাহ করিয়া সুখে রাজত্ব করো।'

দুঃখীরাম রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া পরমসুখে রাজত্ব করিতে লাগিল।

আর-সকলের কি হইল? মন্ত্রীমহাশয়ের সম্বন্ধে দুঃখীরাম কিছু বলে নাই, সুতরাং তিনি জল্লাদই রহিয়া গেলেন। যাহারা রাজা হইয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে এক নতুন মুশকিল উপস্থিত হইল।

রাজা হইয়াছে বটে, কিন্তু এত রাজ্য কোথায় পাইবে? অথচ সকলেই বলে, 'আমি রাজা হয়েছি যে, কাজ কেন করব?' ইহাতে ভারি অসুবিধা হইতে লাগিল। দুঃখীরাম বলিল, 'বাপুসকল, তোমাদের রাজা-টাজা হইয়া কাজ নাই, তোমরা যার যার যোগ্যতা অনুসারে কাজকর্ম কর গিয়া, আর সৎপথে থাকিয়া সুখে দিন কাটুক।'

for more books visit www.rashal.com

ঠাকুরদা

একগ্রামে এক বুড়ো ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর নাম ছিল ভবানীচরণ ভট্টাচার্য। গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে তাঁর খুব ভাব ছিল। তাঁরা তাঁকে বলত ঠাকুরদাদা। তাদের কাছ থেকে শিখে দেশসুদ্ধ লোকেও তাঁকে ঐ নামেই ডাকত।

ছেলেরা ঠাকুরদার কাছে খুবই আদর পেত, আর তাঁকে জ্বালাতন করত তার চেয়েও বেশি। ঠাকুরদা ভারি পণ্ডি আর বুদ্ধিমান ছিলেন। খালি এক বিষয়ে তাঁর একটা পাগলামি ছিল। পেয়াদার নাম শুনলেই তিনি ভয়ে কেঁপে অস্থির হতেন। ছেলেরা সে কথা খুবই জানত আর তা নিয়ে ভারি মজা করত।

ঠাকুরদা রোজ তাঁর চণ্ডীমণ্ডপের সামনে বসে পুঁথি লিখতেন। সেই সময়ে মাঝে মাঝে পাড়ার এক-একটা দুষ্ট ছেলে দাড়ি পরে, লাল পাগড়ি এঁটে, মালকোচ্চা মেরে লাঠি হাতে এসে ঘরের আড়াল থেকে গলা ভার করে বলত, 'ভওয়ানী ভটচাজ কোন হ্যায়?' ঠাকুরদা তাতে বিষম থতমত খেয়ে ঘাড় ফিরিয়েই যদি লাল পাগড়ির খানিকটা দেখতে পেতেন, তবে আর সে পাগড়ি কার মাথায় সে কথার খবর নেবার

অবসর তাঁর থাকত না। তিনি অমনি এক দৌড়ে বাড়ির ভিতর গিয়া একেবারে দিদিমার কাছে হাজির হতেন। ছেলেরা বলে যে, তখন নাকি প্রায়ই ঠাকুরদাকে স্নান করতে হত। কিন্তু সে বোধ হয় তাদের দুষ্টুমি।

যা হোক, এমন বিষম ভয়ের কাণ্ডটা যে ছেলেদের কাজ, এ কথা মুহূর্তের তরেও ঠাকুরদার মাথায় আসত না। তিনি ছেলেগুলিকে বাস্তবিকই খুব ভালবাসতেন। তাঁর কুলগাছটিতে কুল পাকলে তাদের সকলকে ডেকে ডেকে একটি-একটি করে কুল প্রত্যেকের হাতে দিতেন, কাউকে বঞ্চিত করতেন না- একটি বেশিও কখন কাউকে দিতেন না। সেই পরগণার ভিতরে এমন মিষ্টি কুল আর কোথাও ছিল না। কাজেই, একটি খেয়ে ছেলেদের যেমন ভাল লাগত, আর খেতে না পেলে তাদের অমনি কষ্ট হত।

তবুও এমন কথা শোনা যায় নি যে, ঠাকুরদার দেওয়া ছাড়া আর-একটি কুল কেউ কখনো তাঁর গাছ থেকে খেতে পেরেছে। তাঁর চণ্ডীমণ্ডপ থেকে সেই কুল গাছটি পরিস্কার দেখা যেত। সেদিকে কাউকে যেতে দেখলেই তিনি 'কে-রে-এ বলে এমন বিষম হাঁক দিতেন যে কি বলব! তখন আর হাত-পা সামলে ছুট দেবারও উপায় থাকত না। দু মাইল দুরে থেক লোকে বলত, 'ঐ রে! ঠাকুরদা তাঁর কুল আগলাচ্ছেন।'

খালি একবার ছেলেরা ঠাকুরদার কাছ থেকে একপোয়া সন্দেশ আদায় করেছিল। ঠাকুরদা চন্ডীমণ্ডপের সামনে বসে একমনে পুঁথি লিখছিলেন। তিনি দেখতে পান নি যে, এর মধ্যে ও পাড়ার বোসেদের বানরটা কেমন করে ছুটে এসে সেখানে উপস্থিত হয়েছে, আর তার পঁয়ত্রিশ বছরের পুরনো বাঁধানো হুঁকোটি নিয়ে গাছে উঠেছে। তারপর তামাক খেতে গিয়ে দেখেন, কি সর্বনাশ! বানরটিকে তিনি কত ঢিল ছুঁড়ে মারলেন, কত লম্বা লম্বা সংস্কৃত বকুনি বকলেন, কিছুতে তার কাছ থেকে হুঁকোটি আদায় করতে পারলেন না। লাভের মধ্যে সে বেটা তাঁকে গোটাদশেক ভেংচি মেরে হুঁকোসুদ্ধ পাশের বাড়ির আমবাগানে চলে গেল।

সেদিন ছেলেরা না থাকলে ঠাকুরদার আবার তাঁর হুঁকোর মুখ দেখবার কোন আশাই ছিল না। তিনি তাদের সন্দেশ কবুল করে অনেক কষ্টে তাদের দিয়ে বানরের হাত থেকে হুঁকোটি আদায় করালেন। তার পরদিনই নিজে গিয়ে বেচু ময়রার দোকান থেকে তাদের জন্যে এক পোয়া সন্দেশ কিনে আনলেন। সে সন্দেশ খেয়ে নাকি তারা মুখ সিটকিয়েছিল। ঠাকুরদা তার কারণ জিজ্ঞাসা করতে তারা বলল, 'সন্দেশটা বড্ড মিষ্টি।' ঠাকুরদা তখন খুব গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন, 'তাই ত, আমি জানতুম না যে তোমরা তেতো সন্দেশ খাও। আমি মিষ্টি সন্দেশই কিনে এনেছি।'

পরসা খরচ নিয়ে কিন্তু ঠাকুরদার একটু বদনাম ছিল। ঐ যে হুঁকোর খাতিরে ছেলেদের একপোয়া সন্দেশ কিনে খাইয়েছিলেন, তা ছাড়া আর তাঁর জীবনে তিনি কখনো কাউকে কিছু কিনে খাওয়ান নি। লোকে বলত, তাঁর ঘরের ভিতরে তিন-জালা টাকা পোঁতা আছে। কিন্তু নিজে তিনি এমনভাবে চলতেন যেন অনেক কষ্টে তাঁর দুটি খাবার জোটে, সেও বুঝি-বা একবেলা বই দুবেলা নয়। একদিন দিদিমা ডাল রাঁধতে গিয়ে তাতে একটু বেশী ঘি দিয়ে ফেলেছিলেন। সেই অপরাধে নাকি ঠাকুরদা দুমাস তাঁর সঙ্গে কথা কন নি।

ছেলেরা তাঁর সেই সন্দেশ খেয়ে অবধি তাঁর উপর কম চটে ছিল না। না চটবেই বা কেন? সেই হতভাগা বানরটার কাছ থেকে হুঁকো আদায় করতে গিয়ে কি তারা কম নাকাল হয়েছিল? কুড়ি জন মিলে তিনটি ঘন্টা ধরে তারা সেদিন কত গাছই বেয়েছে, কত ছুটোছুটি করেছে, কত কাদাই লাগিয়েছে, কত বিছুটির ছ্যাঁকাই খেয়েছে। তার পুরস্কার কিনা অমনিতর একপোয়া সন্দেশ!

তখন ছিল পুজোর সময়। কুমোরদের বাড়িতে অনেক ঠাকুর গড়া হচ্ছিল, তার তামাশা দেখবার জন্যে সকালে বিকালে ছেলেদের প্রায় সকলেই সেখানে যেত। সেইখানে তাদের একটা মস্ত মিটিং হল। ঠাকুরদাকে জব্দ করতে হবে। তিনি যেমন সন্দেশ খাইয়েছেন, তাঁকে দিয়ে কিছু বেশী হাতে টাকা খরচ করাতে পারলে তবে তার দুঃখটা মেটে। কিন্তু এমন লোকের পয়সা ত সহজে খরচ করানো যেতে পারে না, তার কি উপায় হতে পারে।

কতজনে কত কথা বলতে লাগল, কেউ বলল, 'চল ঠাকুরদার কুলগাছ কেটে ফেলি।' কেউ বলল, 'তার হুঁকো লুকিয়ে রাখি।' কিন্তু এ-সব কথা কারুর পছন্দ হল না। এমন কুলগাছটা কাটলে ভারি অন্যায় হবে। হুঁকো লুকিয়ে রাখলেও শেষটা তাঁকে ফিরিয়ে না দিলে চলবে না। তা ছাড়া, এ-সব করলে তাঁকে আর টাকা খরচ করানো হল কই? ঠাকুরদাকে ছেলেরা আসলে ভালবাসত, নাহক তাঁর লোকসান করাতে কারো ইচ্ছা ছিল না। কাজেই এ-সব কথায় সকলের অমত হল। এমন ভাবে তাঁকে দিয়ে টাকা খরচ করাতে হবে যে সেটা তাঁর ক্ষতির মধ্যে ধরা না যেতে পারে।

for more books visit www.rashal.com

ছেলেরা দেখল, কাজটি তেমন সোজা নয়। বুড়ো কুমোর এর মধ্যে এসে বুদ্ধি জুগিয়ে না দিলে তাদের পক্ষে এর একটা মতলব ঠিক করাই ভার হত। বুড়ো যে যুক্তি বলল, সে ভারি চমৎকার। ছেলেরা তার কথায় যার পর নাই খুশি হয়ে ঘরে চলে গেল। ঠিক হল, পরদিনই সেই কাজটি করতে হবে।

রাত থাকতেই ঠাকুরদার ঘুম ভাঙ্গে, তখন তিনি শুয়ে শুয়ে সুর ধরে শোলোক আওড়ান। তারপর ভোর হবার একটু আগে উঠে, স্নান তর্পণ সেরে, শেষে গিয়ে চণ্ডীমণ্ডপের সামনে বসেন। সেদিনও দোয়েল ডাকবার আগেই তিনি জেগে সবে বলেছেন, 'ব্রহ্মামুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী'- অমনি বাইরে কে যেন ডাকল, 'ভওয়ানী ভট্‌চাজ ঘরমে হ্যায়?'

আর ঠাকুরদা শোলোক আওড়ানো হল না। স্নান আহ্নিক আজ তিনি খিড়কির পুকুরেই সারলেন। চণ্ডীমণ্ডপের সামনে বসে পুঁথি লেখার কাজটিও আজ বন্ধ রইল-তার চেয়ে দিদিমার রান্নাবান্নার খবর নেওয়াই বেশি দরকার মনে হয়েছে। এমনি ভাবে দুপুর অবধি কেটে গেল। এরপর যখন আর কেউ 'ভওয়ানী ভটচাজ' বলে ডাকল না, তখন ঠাকুরদা সাহস পেয়ে ভাবলেন, একটু বাইরে গিয়ে দেখে আসি না কেন!

এই বলে আস্তে আস্তে বাইরে এসে ঠাকুরদা দেখলেন-কি সর্বনাশ! কি চমৎকার! তার মণ্ডপের মাঝখানে দূর্গা প্রতিমা ঘর আলো করে বসে আছেন। ঠাকুরদার আর পা সরল না। তিনি সেইখানেই মাথায় হাত দিয়ে বসে ভাবলেন-হায়, হায়! কোন্ শয়তান এমন কাজ করল! এই প্রতিমা আমার ঘরে রেখে গেছে, এখন একে পূজো না করলে মহাপাপ হবে। আর পূজো করতে গেলেও যে তিনশোটি টাকা'র কম লাগবে না। বাবা গো, আমি কোথায় যাব!

যা হোক, ঠাকুরদা কৃপণ হলেও অতি ধার্মিক আর পণ্ডিত লোক ছিলেন। তিনি তখনই ভাবলেন-আর দুঃখ করে কি হবে? ঘরে টাকা রেখেও আমি সেবায় হেলা করেছিলাম, তাই দেবতা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। ভালোই হল, এখন থেকে আমি ফি-বছর দুর্গোৎসব করব।

ততক্ষণে ছেলেদের দুটি একটি করে প্রাণপণে হাসি চাপতে চাপতে এসে উপস্থিত হয়েছে। কাজটি ত তাদেরই, তারাই ঠাকুরদাকে পেয়াদার ভয় দেখিয়ে বাড়ির ভিতর পাঠিয়ে সেই অবসরে প্রতিমাটিকে এনে মণ্ডপের ভিতরে রেখে গেছে। তাদের মুখের দিকে চেয়ে ঠাকুরদারও আর সে কথা বুঝিতে বাকি রইল না। তখন তিনি বললেন, 'ভালই করেছ দাদা, বুড়ো পাপীর সুমতি জন্মিয়ে দিয়েছ। তোমরা বেঁচে থাকো। আমি খালি ভাবছি-এত বড় ব্যাপার, আমার লোকজন কিছু নেই, আমি কুলোব কি করে?'

ছেলেরা ভেবেছিল, ঠাকুরদা লাঠি নিয়ে তাদের তাড়া করবেন। তার বদলে তিনি এমন কথা বলবেন, তা তারা মোটেই ভাবে নি। তারা তাতে ভারি খুশি হয়ে বলল, 'তার জন্য চিন্তা কি, ঠাকুরদার? আমরা সব ঠিক করে দিচ্ছি। আপনি শুধু বসে বসে হুকুম দিন।' অমনি ঠাকুরদার মুখ ভরে হাসি ফুটে উঠল, তাঁর চোখ দুটি বুজে এল। ছেলেদের মাথায় হাত বুলিয়ে, গাল টিপে আর নাকে চিমটি কেটে তিনি তাদের বিদায় করলেন।

এবারে ঠাকুরদা যে সন্দেশ এনেছিলেন, তা খেয়ে আর কারো নাক সিটকাতে হয় নি।

নরওয়ে দেশের পুরান

আমাদের দেশের পুরাণে যেমন দেবতা আর অসুরের গল্প আছে, পুরাতন নরওয়ে আর সুইডেন দেশের পুরাণেও তেমনি সব দেবতা আর অসুরের কথা লেখা আছে।

নরওয়ের পুরাণে আছে, সেকালের আগে যখন পৃথিবী বা সমুদ্র বা বায়ু কিছুই ছিল না-তখন কেবল বিশ্ব-পিতা (All Father) ছিলেন। তাঁহাকে কেহ সৃষ্টি করে নাই, কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তিনি যাহা চাহেন, তাহাই হয়। সৃষ্টির আগে চারিদিকে শূন্য আর অকার ছিল, সেই শূন্যের মাঝখানে ছিল গিন্নুঙ্গা নামে গহ্বর। সেই গহ্বরের উত্তরে কুয়াশার দেশ, তাহার মাঝখানে হ্বরগেল্মির নামে ঝরণার জল টগবগ করিয়া ফুটিত।

সেই গহবরের দক্ষিন মস্পেল্স্হাইম্ অথাৎ আগুনের দেশ, সুৎর্ নামে বিশাল দৈত্য জ্বলন্ত তলোয়ার হাতে সেই দেশে পাহারা দিত।

for more books visit www.rachal.com

সেই যে গিন্নুঙ্গা নামে গহ্বর, তাহার ভিতরটা ছিল বড়ই ঠাণ্ডা। হ্বরগেল্‌মির ঝরণার জল তাহাতে পড়িয়া বরফ হইয়া যাইত, সুৎর্রের তলোয়ার হইতে আগুনের ফিনকি পড়িয়া সেই বরফকে গলাইয়া দিত। সেই আগুন আর বরফের লড়াই হইতে গিন্নুঙ্গা গহ্বরের ভিতরে য়ীমির নামক অতি ভীষণ দৈত্য আর আধম্‌লা নামে গাছ জন্মাইল। য়ীমির আধম্‌লাকে পাইয়া তাহার দুধ খাইতে লাগিল, আর আধম্‌লা আশেপাশের বরফে লবনের গন্ধ পাইয়া তাহাই চাটিতে আরম্ভ করিল। চাটিতে চাটিতে সেই বরফের ভিতর হইতে একটি দেবতা বাহির হইলেন, তাঁহার নাম বুরি।

এই য়ীমির হইতে অসুর আর বুরি হইতে দেবতাগণের জন্ম, আর জন্মাবধিই অসুর আর দেবতার বিবাদ। যুগযুগ ধরিয়া সেই বিবাদ চলিতে থাকে, শেষে অনেক যুদ্ধের পর দেবতারা য়ীমিরকে মারিয়া ফেলেন। আর যত অসুর ছিল, য়ীমিরের রক্তের বন্যায় সকলেই ডুবিয়া মরে, বাকি থাকে কেবল বার্গেল্‌মির আর তাহার স্ত্রী। এই দুজনে একখানি নৌকায় করিয়া সকল জায়গার শেষে একেবারে ব্রহ্মাণ্ডের কিনারায় গিয়া ঘর বাঁধিল। সেই স্থানের নাম হইল 'জোতন্‌হাইম' বা দৈত্যপুরী। সেই দৈত্যপুরীতে অসুরের বংশ বাড়িতে লাগিল, দেবতা অসুরের বিবাদও আবার জাগিয়া উঠিল।

এদিকে অসুরেরা সব মরিয়া যাওয়াতে দেবতারা কিছুদিনের জন্য যেন একটু আরাম পাইলেন। তখন তাঁহাদের মনে হইল যে, চারিদিকে কেবলই শূন্য আর কুয়াশা আর আগুন আর বরফের লড়াই দেখিতে একটুও ভাল লাগে না। তাই তাঁহারা সকলে মিলিয়া যুক্তি করিলেন যে, চলো আমরা য়ীমিরের দেহ হইতে গাছ-পালা নদ-নদী আর পাহাড় পর্বতের সৃষ্টি করি। এই বলিয়া তাঁহারা য়ীমিরের বিশাল দেহটাকে সকলে মিলিয়া গড়াইয়া গিন্নুঙ্গা গহ্বরে নিয়া ফেলিলেন। তাহাতে গহ্বর বুজিল, এই সৃষ্টি রাখিবার একটা জায়গাও জুটিল। য়ীমিরের রক্তে সমুদ্র ত আগেই হইয়াছিল, উহার মাংশে মাটি গড়িতেও বেশী বেগ পাইতে হইল না, হাড় আর দাঁত হইল পাহাড়-পর্বত, চুল-দাড়ি হইল গাছপালা, মাথার খোলটা হইল আকাশ, মগজগুলি হইল মেঘ, কাছেই আগুনের দেশ ছিল, সেখানে সেই সুৎর্র নামক দৈত্য থাকিত- সেইখানকার আগুনের ফিনকি দিয়া চন্দ্র সূর্য আর তারা হইল।

এদিকে কিন্তু য়ীমিরের মাংশ পচিয়া তাহাতে পোকা ধরিয়াছে। দেবতারা ভাবিলেন, 'তাই ত, এই পোকাগুলিকে কি করা যায়? এগুলি হইবে পরী, ভূত আর বামন।' পরীরা দেখিতে ভারি সুন্দর; তাহারা আকাশ অঅর পৃথিবীর মাঝখানে থাকে, চাঁদের আলোতে খেলা করে, প্রজাপতির পিঠে চড়িয়া ফুলগুলিকে ফুটাইতে আসে, আর নানামতে লোকের উপকার করে। ভূত আর বামনগুলি দেখিতে যেমন বিশ্রী তেমনি দুষ্টু। তাহারা মাটির নীচে থাকে, সোনা-রূপা মনি-মানিকের সন্ধান রাখে, আর লোকের মন্দ করিতে রাত্রে বাহিরে আসে। দিনে তাহাদের মাটির উপরে আসিবার হুকুম নাই, আসিলে পাথর হইয়া যায়।

সকলের মাঝখানে দেবতারা আগেই তাঁহাদের নিজের থাকিবার জায়গা রাখিয়াছিলেন। সেই জায়গার নাম আসগার্ড বা স্বর্গ। সেখানকার রাজা ছিলেন বিশ্ব-পিতা। তাঁহার নাম ওডিন (Odin) বা উওডেন (Woden) যাহা হইতে বুধবারের নাম ওয়েডনেজ ডে হইয়াছে। ইঁহা হইতেই সকল দেবতা আর মানুষের জন্ম। ইঁহার নাম বিশ্ব-পিতা।

স্বর্গের সকলের চেয়ে উঁচু সিংহাসনে ওডিন তাঁহার রানী ফ্রিগ্‌গার (Frigga) সহিত বসিয়া স্বর্গ মর্ত পাতাল কোথায় কি হইতেছে তাহার সংবাদ লইতেন। কিছুই তাঁহার চোখ এড়াইতে পারিত না। ওডিনের একটিমাত্র চোখ ছিল, আর একটি চোখ তিনি মিমির নামে এক বুড়োকে দিয়াছিলেন। সেই বুড়ার একটা ঝরণা ছিল, তাহার জল খাইলে ভূত ভবিষৎ সকল বিষয় জানা যাইত। ওডিন সেই ঝরণার জল খাইতে গেলেন। বুড়া বলিল, 'তোমার একটি চোখ না দিলে জল খাইতে পাইবে না।' কাজেই একটি চোখ খুলিয়া দিয়া ওডিনকে সেই জলের দাম দিতে হইল। বুড়া সেই চোখটি নিয়া তাহার ঝরণার জলে ডুবাইয়া রাখিল। সেখানে সেটি দিনরাত ঝিকমিক করিত। ওডিন ঝরণার জল খাইয়া সকলের চেয়ে বেশী জ্ঞানী হইলেন। আর সেই ঘটনার চিহ্ন রাখিবার জন্য ঝরণার ধারে গাছের ডাল দিয়া একটা বল্লম তয়ের করাইয়া লইলেন। সে এমনি আশ্চর্য বল্লম যে কিছুতেই তাহাকে ঠেকাইতে পারিত না।

ওডিনের এক পুত্রের নাম টিউ (Tiu)। ইহার নামে মঙ্গলবারের নাম টিউজ ডে (Tuesday) হইয়াছে। ইনি বীরত্ব এবং যুদ্ধের দেবতা। ওডিনের যেমন একটা আশ্চর্য বল্লম ছিল, ইহার তেমন একটা তলোয়ার ছিল। লোকে এই তলোয়ারকে বড়ই ভক্তি করিত, আর যার পর নাই যত্নে এক মন্দিরের ভিতরে তাহা রাখিয়া দিত। তাহাদের বিশ্বাসই ছিল যে, এই তলোয়ার যাহার কাছে থাকিবে সে কখনো যুদ্ধে হারিবে না। কিন্তু হায়! একদিন কে সেই তলোয়ার লইয়া অনেকে পৃথিবী জয় করিয়াছে, আবার সেই তলোয়ারেই তাহারা মারা গিয়াছে। এমনি করিয়া তাহার দ্বারা কত কাণ্ড হইল। কিন্তু টিউর ঘরে আর তাহা ফিরিয়া আসিল না।

for more books visit www.rashar.com

ওডিনের আর-এক পুত্র থরের (Thor) নামে ইংরেজী থার্সডে (Thursday) হইয়াছে। থরের মত জোর কোনো দেবতার ছিল না, দেখিতেও কেহ তাঁহার মত এমন বিশাল ছিলেন না। তাঁহার হাতুড়ি দিয়া যাহাকেই তিনি ঠাই করিয়া মারিতেন, সে পাহাড়ই হউক, আর পর্বতই হউক, তখনই গুঁড়া হইয়া যাইত। স্বর্গে বাইফ্রেস্ট নামে বিচিত্র সেতু আছে (যাহাকে তোমরা বল রামধনু) সেই সেতুর উপর দিয়া দেবতারা যাওয়া আসা করিতেন। অর্থাৎ আর সকল দেবতারাই করিতেন-কিন্তু থর্ কখনো সেই সেতুর উপর দিয়া যাইতেন না, গেলে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িত।

ফ্রাইডে (Friday, শুক্রবার) যাঁহার নামে হইয়াছে, তাঁহার নাম ছিল ফ্রিয়া (Freya)। তিনি ছিলেন সৌন্দর্যের দেবতা। কেহ বলে, ইনিই ওডিনের রানী ফ্রিগ্‌গা। যুদ্ধে যত বীরের মৃত্যু হইত, তাহাদের অর্ধেক ফ্রিয়ার কাছে যাইত। ফ্রিয়া তাহার সঙ্গিনী ভ্যাল্‌কীরদিগকে লইয়া সেই বীরদিগকে নিতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসিতেন। তাঁহার সভায় গিয়া বীরদিগের সুখের আর সীমা পরিসীমা থাকিত না। সেখানে হাইড্রুন্ নামে ছাগল ছিল, তাহার দুধ ছিল অমৃতের মত, সে দুধ দোওয়াইয়া শেষ করা যাইত না। আর সেহ্রিম্‌নির নামে যে শুয়োরটি ছিল, তাহার মাংশও ছিল তেমনি মিষ্ট। এলড্রিম্‌নির নামে পাচক তাহা ততোধিক মিষ্ট করিয়া রাঁধিত। বীরের ক্ষুধা-বুঝিতেই পার, তাহারা খাইত কেমন! কিন্তু সে মাংশ কিছুতেই ফুরাইত না। খাওয়া দাওয়া শেষ হইয়া গেলে আবার যেমন শুয়োর তেমনটি বাঁচিয়া উঠিয়া ঘোঁত্ ঘোঁত্ করিতে থাকিত।

ঠানদিদির বিক্রম

আমাদের এক ঠানদিদি ছিলেন। অবশ্য ঠাকুরদাদাও ছিলেন, নইলে ঠানদিদি এলেন কোত্থেকে? তবে ঠাকুরদাদাকে পাড়ার ছেলেরা ভালরকম জানত না। ঠাকুরদাদার নাম রামকানাই রায়; লোকে তাঁকে কানাই রায় বলে ডাকত, কেউ কেউ রায়মশায়ও বলত।

ঠাকুরদাদাকে যে ছেলেরা জানত না, তার একটু নমুনা দিচ্ছি। ঠানদিদির বাড়িতে এক-ঝাড় তল্‌তা বাঁশ ছিল, ঐ বাঁশে ভাল মাছ ধরবার ছিপ হত। একবার কয়েকটি ছেলে ছিপ তৈরী করবে বলে চুপিচুপি একটা বাঁশ কেটে রাস্তায় টেনে এনেছে, অমনি দেখে-রায়মশায় সম্মুখে। তাহারা অমনি হাত জোড় করে বললে, 'আপনার পায়ে পড়ি, ঠানদিদিকে বলবেন না!' তিনি ত শুনে অবাক!-আরে বলিস কি? আমার বাঁশ নিয়ে পালাচ্ছিস, আর বলছিস "বলবেন না"!'

ছেলেগুলি সকলে মিলে কেবলইত বলতে লাগল, 'আপনার পায়ে পড়ি, ঠানদিদিকে বলবেন না।' তখন রায়মশায় বেগতিক দেখে বললেন, 'তোরা বাঁশ দিয়ে কি করবি?' আজ্ঞে, ছিপ করব।' 'আচ্ছা, নিয়ে যা।' তখন আবার 'দেখবেন, ঠানদিদিকে যেন বলবেন না' বলে ছেলেগুলো বাঁশ নিয়ে ছুট। এখন বোধ করি তোমরা বুঝতে পারছ, রায়মশাই যে ঠাকুরদাদা, তো অনেক ছেলেই জানত না। ছেলেরা জানত-ঠানদিদির বাড়ি, ঠানদিদির বাঁশঝাড়, ঠানদিদির কাঁঠালগাছ, বিশেষ ভাবে ঠানদিদির কুলগাছ আর পেয়ারাগাছ।

ঠানদিদির পুত্রসন্তান নেই, কেবল তিনটি মেয়ে। বড় মেয়ে দুটির বিবাহ হয়ে গিয়েছে, ছোটটির বয়স ন-দশ বৎসর। ঠানদিদির বয়স চল্লিশের উপর। বাড়িতে অন্য লোকজন নেই, কিন্তু হলেও, ঠাকুরদাদা বিদেশ গেলে ঠানদিদির চৌকিদার বা ঘরে শোবার জন্য বুড়া স্ত্রীলোকের দরকার হয় না। ঠানদিদি অনায়াসে একাই থাকেন।

একবার ঠাকুরদাদা বিদেশ গিয়াছেন। ঠানদিদি কেবল ছোট মেয়েটিকে নিয়ে বাড়িতে আছেন, সেই সময়ে একদিন দুপুর রাত্রে মেয়েটি বলল, মা! কে যেন আমার গায়ে হাত দিল!' ঠানদিদি বললেন, 'চুপ কর, কথা বলিস না।' ঠানদিদি পূর্বেই টের পেয়েছেন, ঘরে চোর ঢুকেছে। তারপর চোর যেই বাক্স পেটরার সন্ধানে ঘরের অন্য দিকে গিয়েছে, অমনি ঠানদিদি আস্তে আস্তে উঠে, বাটনাবাটা শিলখানা এনে সিঁদের মুখে চাপা দিলেন।

তোমরা শহরের ছেলেরা বোধ করি বুঝতে পারলে না, সিঁদ কি। পাড়াগাঁয়ে অনেক মেটে ঘর। ঐ-সব মেটে ঘরের সিঁদকাঠি খুঁড়ে চোর ঘরের ভিতরে ঢুকে চুরি করে। এইবার আরো মুশকিল হল, সিঁদকাঠি কি? সিঁদকাঠি যে কি, তা আমিও কখনো চোখে দেখিনি। সম্ভবত ওটা খন্তা বা সাবলের মত লোহার কোন অস্ত্র হবে।

এই সিঁদকাঠি তৈরী সম্বন্ধে পাড়াগাঁয়ে একটা কথা আছে, 'চোর কামারে কখনো দেখা হয় না।' সিঁদকাঠি যখন লোহার অস্ত্র, তখন অবশ্যই ওটা কামারে গড়ে। কিন্তু চোর কি কামারের বাড়ি গিয়ে বলে, 'কর্মকার ভায়া, আমাকে একটা সিঁদকাঠি তৈরি করে দাও!' নিশ্চয়ই না।

for more books visit www.rashal.com

তা হলে ত সেইখানেই সে চোর বলে ধরা দিল। কামার ভায়া চোরের নিতান্ত বন্ধু হলেও সময় মত অন্য দু-দশজন বন্ধুর কাছে সে গল্পটা করবেই। দরকার হলে পুলিশের কাছেও বলতে পারে।

তবে চোর কি করে সিঁদকাঠি গড়ায়? আমরা ছেলে বেলায় শুনতাম, চোরের সিঁদকাঠির দরকার হলে, চোর একখানি লোহা আর একটি আধুলি রাত্রে কামারশালের এমন জায়গায় রেখে যায় যে কামার সকালে কামারশাল খুলবার সময়েই সেটা তার নজরে পড়ে। কামার অন্য কাজ বন্ধ রেখে, সকলের অসাক্ষাতে সিঁদকাঠিটি তৈরি করে। কামারশাল বন্ধ করবার সময়, ঠিক সেই জায়গায় সেটি রেখে দেয়। রাত্রে চোর এসে সেটি নিয়ে যায়।

এখন আসল কথা শোনো। ঠানদিদি সিঁদের মুখে শিলটি চাপা দিয়ে তার পাশে চুপ করে বসে আছেন। তারপর চোর নাকী সুরে বলল, 'মা ঠাকরুন, ছেড়ে দিন! ' ঠানদিদি বললেন, 'বল্ বেটা তুই কে? নইলে এখনি পাড়ার লোক ডেকে তোকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করব।' চোর দেখল নাম না বললে আর নিস্কৃতি নেই, কাজেই বলল, 'মা ঠাকরুন, আমি শীতল!' তা শুনে ঠানদিদি বললেন, 'হতভাগা! মরতে আর জায়গা পাও নি? যাও! ঐ বাইরে কলসী আছে-পুকুরে গিয়ে জল আনো, তারপর কাদা করে সিঁদ বোজাও। ঐ গোয়ালে গোবর আছে, গোবর দিয়ে ভিতর-বার ভাল করে নিকিয়ে দিয়ে যাও। আমি সকালে উঠে এ সব হাঙ্গামা কত্তে পারব না।'

শীতল তখন কলসীটি নিয়ে আস্তে আস্তে পুকুর ঘাটে গেল। তখন ফাল্গুন মাস, পাড়াগাঁয়ে বেশ শীত। সেই শীতে পুকুর থেকে জল এনে, কাদা করে, সিঁদ বুজিয়ে, ভাল করে নিকিয়ে তবে শীতল ছুটি পায়।

তোমরা চালাক ছেলেরা ভাবছ, চোরটা কি বোকা, কলসী নিয়ে অমনি পালাল না কেন? শীতল কলসী নিয়ে পালালে তার কি দশা হত, তা আর একদিন তোমাদের বলব।

ঘ্যাঁঘাসুর

এক যে ছিল রাজা, তাঁর ছিল একটি মেয়ে। মেয়েটি, হইয়া অবধি খালি অসুখেই ভুগিতেছে। একটি দিনের জন্যেও ভাল থাকে না। কত বদ্যি, কত ডাক্তার, কত চিকিৎসা, কত ওষুধ-মেয়ে ভাল হইবে দূরে থাকুক, দিনি দিনই রোগা হইতেছে। এত ধন জন থাকিয়াও রাজার মনে সুখ নাই। কিসে মেয়েটি ভাল হইবে, তাঁহার কেবল সেই চিন্তা।

এমনি করিয়া দিন যায়; এর মধ্যে এক সাধু রাজার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। তিনি রাজার মেয়ের অসুখের কথা শুনিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, তোমার মেয়ে একটি লেবু খাইয়া ভাল হইবে।'

একটু লেবু! সে কোন লেবুটি, কোথায় কাহার বাগানে তাহা পাওয়া যাইবে, সাধু তাহার কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেলেন। রাজা আর উপায় না দেখিয়া দেশের লোককে এই কথা জানাইয়া দিলেন, 'যাহার লেবু খাইয়া আমার মেয়ে ভাল হইবে, সে আমার মেয়েকে বিবাহ করিবে, আর আমার রাজ্য পাইবে।'

এখন মুশকিলের কথা এই যে, সে রাজ্য লেবু মিলে না। কেবলমাত্র এক চাষীর বাড়িতে একটি লেবুর গাছ আছে, চাষী অনেক কষ্ট করিয়া শ্রীহট্ট হইতে সেই গাছটি আনিয়াছিল। সবে সেই বৎসর তাহাতে লেবু হইয়াছে। লেবু ত নয়, যেন রসগোলা! এক-একটা বড় কত! যেন এক-একটা বেল! তেমন লেবু তোমরা দেখও নাই, খাওও নাই। আমি দেখিতে পাই নাই। দেখিতে পাইলে খাইতে চেষ্টা করা যাইত।

চাষীর তিন ছেলে, যদু গোষ্ঠ আর মানিক। রাজার হুকুম শুনিয়া চাষী যদুকে এক ঝুড়ি লেবু দিয়া বলিল, 'শিগ্‌গির এগুলি রাজার বাড়ি নিয়ে যা। এর একটা খেয়ে যদি রাজার মেয়ে ব্যামো সারে, তবে রাজার মেয়েকে বিয়ে করতে পাবি।'

যদু লেবুর ঝুড়ি মাথায় করিয়া রাজার বাড়ি চলিয়াছে, এমন সময় পথে একহাত লম্বা একটি মানুষের সঙ্গে তাহার দেখা হইল। সেই লোকটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার ঝুড়িতে কি ও? যদু বলিল, 'ব্যাঙ।' সেই লোকটি বলিল, 'আচ্ছা তাই হোক।'

রাজার দারোয়ানেরা লেবুর কথা শুনিয়া যার পর নাই আদরের সহিত যদুকে রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজামহাশয় ব্যস্ত হইয়া নিজেই ঝুড়ির ঢাকা খুলিলেন, আর অমনি চারিটি ব্যাঙ তাঁহার পাগড়ির উপর লাফাইয়া উঠিল। সেই ঝুড়িতে যতগুলি লেবু ছিল, সব কয়টাই

for more books visit www.rashal.com

ব্যাঙ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং লেবু খাওয়াইয়া রাজার মেয়েকে ভাল করা, আর রাজার জামাই হওয়া, যদুর ভাগ্যে ঘটিল না। সে বেচারা অনেকগুলি লাথি খাইয়া প্রাণে-প্রাণে বাড়ি ফিরিল, তাহাই ঢের বলিতে হইবে।

এরপর চাষী এক ঝুড়ি লেবু দিয়া গোষ্ঠকে পাঠাইল। এবারেও সেই একহাত লম্বা মানুষটি কোথা হইতে আসিয়া গোষ্ঠর ঝুড়িতে কি আছে জিজ্ঞাসা করিল। গোষ্ঠ বলিল, 'ঝিঙের বীচি।' একহাত লম্বা মানুষটি বলিল, 'আচ্ছা, তাই হোক।'

রাজবাড়ির দারোয়ানেরা প্রথমে গোষ্ঠকে ঢুকিতে দেয় নাই। তাহারা বলিল, 'তোরই মতন একটা সেদিন এসে রাজামশাইয়ের পাগড়ি নোংরা করে দিয়ে গেছে। তুই আবার একটা কি করে বসবি কে জানে!' অনেক পীড়াপীড়ির পর গোষ্ঠ ঢুকিয়া রাজার মেয়েকে কিরূপ লেবু খাওয়াইল, বুঝিতে পার। সাজাটাও তার তেমনিই হইল।

মানিককে সকলেই একটু বোকা মনে করে। কাজেই তাহাকে আর লেবুর ঝুড়ি দিয়া রাজার বাড়ি পাঠাইতে কেহ বলিল না। কিন্তু সে যাইবার জন্য একেবারে সাজিয়া গুজিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে। যতক্ষণ না চাষী তাহাকে যাইতে বলিল, ততক্ষণ তাহাকে কিছুতেই ছাড়িল না। শেষটা তাহাকেও এক ঝুড়ি লেবু দিয়া পাঠাইতে হইল।

পথে সেই একহাত লম্বা মানুষের সহিত মানিকেরও দেখা হইল। একহাত লম্বা মানুষ জিজ্ঞাস করিল, 'ঝুড়িতে কি ও?' মানিক বলিল, 'ঝুড়িতে লেবু আছে, তাই খেয়ে রাজার মেয়ের অসুখ সারবে।' একহাত লম্বা মানুষ বলিল, 'আচ্ছা তাই হোক।'

রাজবাড়িতে ঢুকিতে মানিকের যার পর নাই মুশকিল হইয়াছিল। অনেক মিনতি আর হাত জোড়ের পর দারোয়ানেরা তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল আর বলিল, 'দেখিস, যেন ব্যাঙ কি ঝিঙের বীচি-টিচি হয় না। তা হলে কিন্তু তোর প্রাণটা থাকবে না।'

যাহা হউক মানিকের ঝুড়িতে লেবুই পাওয়া গেল। রাজামহাশয় ত খুবই খুশী! তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতর লেবু পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন, 'কেমন হয়, আমাকে খবর দিস!' খবরের আশায় রাজামহাশয় বসিয়া আছেন, এমন সময় মেয়ে নিজেই খবর লইয়া উপস্থিত! সেই লেবু মুখে দিতে না দিতেই তাহার অসুখ একেবারে সারিয়া গিয়াছে!

ইহাতে রাজামহাশয় যার পর নাই আনন্দিত হইলেন, কিন্তু তাহার পরেই ভাবিতে লাগিলেন-'তাই ত, করিয়াছি কি! এখন যে চাষীর ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে হয়!' এই ভাবিয়া রাজামহাশয় স্থির করিলেন যে, চাষীর ছেলেকে যেমন করিয়াই হউক ফাঁকি দিতে হইবে।

মানিকলাল ভাবিতেছে, 'এরপর বুঝি মেয়ে বিয়ে দিবে।' এমন সময় রাজামহাশয় তাহাকে বলিলেন, 'বাপু, তুমি কাজটা বেশ ভালই করিয়াছ, কিন্তু রাজার মেয়ে বিবাহ সহজ কথা নয়। আগে আর-একখানা কাজ করিয়া দাও, তারপর দেখা যাইবে কি হয়। জলে যেমন চলে, ডাঙায়ও তেমনি চলে, এইরূপ একখানা নৌকা আমাকে গড়িয়া না দিতে পারিলে, তোমার কোন আশাই নাই।'

মানিক 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বিদায় হইল। তারপর বাড়ি আসিয়া সকল কথা বলিল।

বাড়ির সকলেই মানিককে বোকা ঠাওরাইয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং তাহারা মনে করিল যে, মানিক যখন রাজার মেয়েকে ভাল করিয়া আসিয়াছে, তখন নৌকাখানা ইচ্ছা করিলেই যে-সে তয়ের করিতে পারে।

যদু একখানা কুড়াল লইয়া নৌকা গড়িতে চলিল। বনের ভিতর হইতে গাছ কাটিয়া সেখানেই কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। ইচ্ছা, সেইদিনই নৌকা প্রস্তুত করিয়া ফেলে। পরিশ্রমেরও কসুর নাই। এমন সময় কোথা হইতে সেই একহাত লম্বা মানুষ আসিয়া উপস্থিত। 'কিহে যদুনাথ, কি হচ্ছে?'-'গামলা'। আচ্ছা, তাই হোক।'

'তাই হোক' বলিয়া একহাত লম্বা মানুষ চলিয়া গেল। যদুও নৌকা গড়িতে লাগিল। কিন্তু সে যত পরিশ্রম করে, তাহার সমস্তই বৃথা হয়। সেই সর্বনেশে কাঠ খালি গামলার মত গোল হইয়া ওঠে, নৌকার মতন কিছুতেই হইতে চায় না। শেষটা যদুর রাগ হইয়া গেল। কিন্তু রাগের ভরে এক কাঠ ফেলিয়া দিয়া, ক্রমাগত আর দুই তিনটা কাঠ লইয়াও গামলা ছাড়া আর কিছু তয়ের করিতে পারিল না। যাহা হউক, গামলাগুলি হইল বাড়ি সরেস। সুতরাং সন্ধ্যার সময় যদুনাথ গোটা তিন চার গামলা ঘাড়ে করিয়া বাড়ি ফিরিল। এমন ভাল গামলাগুলি বনে ফেলিয়া আসিতে কিছুতেই তাহার ইচ্ছা হইল না।

for more books visit www.rashal.com

তারপর গোষ্ঠ নৌকা গড়িতে চলিল, আর সেই একহাত লম্বা মানুষের অনুগ্রহে সন্ধ্যাবেলা পাঁচখানি অতিশয় উঁচুদরের লাঙল কাঁধে ঘরে ফিরিল।

অবশ্য, এরপর মানিক নৌকা গড়িতে গেল, আর তাহাকেও সেই একহাত লম্বা মানুষ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হচ্ছে?' মানিক সাদাসিধা উত্তর দিল-'জলে যেমন চলে ডাঙায়ও তেমনি চলে, এমন একখান নৌকা গড়ে দিতে পারলে, রাজামশাই বলেছেন, মেয়ে বিয়ে দেবেন।' এই কথা শুনিয়া একহাত লম্বা মানুষ বলিল, 'আচ্ছা, তাই হোক।'

মানিক সবে নৌকার কাঠ কাটিয়া সবে তাহাতে চড়িয়া বসিয়াছিল। একহাত লম্বা মানুষের কথা শেষ হইতে না হইতেই সেই কাঠ ছুটিয়া চলিয়াছে। সে আর এখন কাঠ নাই; অতি চমৎকার একখানা নৌকা। তাহাতে দাঁড়ি নাই, মাঝি নাই, দাঁড় নাই। যেখানে যাইবার দরকার, তাহা নিজেই বুঝিয়া লয়, সেখানে সে নিজেই থামে। রাজা-রাজড়ার উপযুক্ত মখমলের গদি তাকিয়ায় তাহার ভিতর সাজানো। বাহিরটা দেখিতে কি সুন্দর, তা কি বলিব। যে জিনিসে তাহা সাজাইয়াছে, তাহা সেই একহাত লম্বা মানুষের দেশে হয়। আমি তাহার নাম জানি না।

রাজামহাশয় সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় মানিকলালের নৌকা সেইখানে গিয়া উপস্থিত। সকলে নৌকার রূপগুণ দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল, আর কত প্রশংসা করিতে লাগিল। রাজামহাশয়ও খুব আশ্চর্য না হইয়াছিলেন এমন নয়। কিন্তু তাহা চাপিয়া গিয়া মুখে মানিককে বলিলেন, 'এতেও হচ্ছে না; আর-একখানা কাজ করে দিতে হবে। একগাছ ঘ্যাঁঘাসুরের লেজের পালক হলে আমার মুকুটের শোভা হয়। এই জিনিসটি এনে দিলে নিশ্চয় আমার মেয়েকে বিয়ে করতে পাবে।' মানিক 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ঘ্যাঁঘাসুরের পালক আনিতে চলিল।

খানিকটা পাখি খানিকটা জানোয়ার, বিদ্‌ঘুটে চেহারা, খিটখিটে মেজাজ, ভারী জ্ঞানী, বেজায় ধনী, অসুর ঘ্যাঁঘা, এক মাসের পথ দূরে, অজানা নদীর ধারে, অচেনা শহরে সোনার পুরীতে বাস করেন। মানুষটিকে দেখতে পাইলেই রসগোল্লাটির মত টপ্ করিয়া তাহাকে গিলেন। সেই ঘ্যাঁঘা মহাশয়ের পালক আনিতে মানিক চলিয়াছে। যাহাকে দেখে, তাহাকেই ঘ্যাঁঘাসুরের মুলুকের পথ জিজ্ঞাসা করে; আর ডাইনে বাঁয়ে না চাহিয়া ক্রমাগত সেই পথে চলে। রাত্রি হইলে কাহারো বাড়িতে আশ্রয় লয়; আবার সকালে উঠিয়া চলিতে থাকে।

ঘ্যাঁঘাসুরের মুলুকে যাইতেছে শুনিয়া, সকলে তাহাকে আদর করিয়া জায়গা দেয়। একদিন রাত্রিতে এইরূপে সে একজন খুব ধনী লোকের অতিথি হইয়াছে। সেই ধনী অনেক কথাবার্তার পর তাহাকে বলিল, 'বাপু, তুমি ঘ্যাঁঘাসুরের দেশে চলেছ শুনেছি, সে অনেক বিষয়ের খবর রাখে। আমার লোহার সিন্ধুকের চাবিটা হারিয়ে ফেলেছি, ঘ্যাঁঘা তার কোন সান বলতে পারে কি না, জিজ্ঞাসা কোরো তো।' মানিক বলিল, 'আচ্ছা মশাই, আমি জেনে আসব।' আর-একদিন সে আর-এক বড়লোকের বাড়িতে অতিথি হইয়াছে। সেই বড়লোকের মেয়ের ভারী অসুখ। তাহার বেয়ারামটা যে কি, কোনো ডাক্তার কবিরাজ তাহা ঠিক করিতে পারে না। মেয়ে দিন দিন খালি রোগা হইয়া যাইতেছে। সেই বড়লোক মানিককে খুব যত্ন করিয়া খাওয়াইয়া তারপর বলিলেন, 'আমার মেয়ের অসুখ কিসে সারবে, 'এই কথাটা যদি ঘ্যাঁঘার কাছ থেকে জেনে আসতে পার, তবে বড় উপকার হয়।' মানিক বলিল, 'অবশ্যি মশাই, আমি নিশ্চয়ই জেনে আসব।'

এইরূপে একমাস চলিয়া মানিক অজানা নদীর ধারে আসিয়া ওপারে ঘ্যাঁঘাসুরের সোনার বাড়ি দেখিতে পাইল। অজানা নদীর নৌকা নাই, খেয়া নাই, এক বুড়ো সকলকেই কাঁধে করিয়া পার করে। মানিকও তাহারি কাঁধে চড়িয়া নদী পার হইল। বুড়ো তাহাকে বলিল, 'বাপু, আমার এই দুঃখ কবে দূর হবে, ঘ্যাঁঘার কাছে জিজ্ঞেস কোরো ত! আমার খাওয়া নাই, দাওয়া নাই, খালি কাঁধে ক'রে দিনরাত্তির মানুষই পার করছি। ছেলেবেলা থেকে এই করছি, আর এখন বুড়ো হয়ে গেছি।' মানিক বলিল, 'তোমার কিছু ভয় নেই, আমি নিশ্চয়ই তোমার কথা জিজ্ঞেস করব!'

নদী পার হইয়া মানিক ঘ্যাঁঘার বাড়িতে গেল। ঘ্যাঁঘা তখন বাড়ি ছিল না; ঘেঁঘী ছিল। ঘেঁঘী তাহাকে দেখিয়া বলিল, 'পালা বাছা, শিগ্‌গির পালা। ঘ্যাঁঘা তোকে দেখতে পেলেই গিল্‌বে!' মানিক বলিল, 'আমি যে ঘ্যাঁঘার লেজের একগাছি পালক চাই। সেটি না নিয়ে কেমন ক'রে যাব? আর সেই যাদের চাবি হারিয়ে গেছে সেই চাবিটি কোথায় আছে? আর যাদের মেয়ের অসুখ, তার ওষুধ জেনে যেতে বলেছে। আর যে বুড়ো পার ক'রে দিলে, সে বাড়ি যাবে কেমন ক'রে?

ঘেঁঘী বলিল, 'প্রাণটি নিয়ে কোথায় পালাবে, না আবার তার পালক চাই, আর তাকে একশো খবর বলে দাও। তুই কে রে বাপ? মানিক বলিল, 'আমি মানিক। পালক না নিয়ে গেলে রাজা মেয়ে বিয়ে দেবে না; একগাছি পালক আমার চাই।'

for more books visit www.rashal.com

হাজার হোক স্ত্রীলোক। মানিককে দেখিয়া ঘেঁঘীর দয়া হইল। সে বলিল, ‘আচ্ছা বাপু, তাহলে তুই খাটের তলায় লুকিয়ে থাক্’ তোর ভাগ্যে থাকলে হবে এখন।’ মানিক ঘ্যাঁঘার খাটের তলায় লুকাইয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর ঘ্যাঁঘাসুর বাড়ি আসিল। ঘেঁঘী তাড়াতাড়ি পা ধুইবার জলটল দিয়া সোনার থালায় খাবার হাজির করিল। ঘ্যাঁঘার মেজাজটা বড়ই খিটখিটে; সবটাতেই দোষ ধরে। বাড়ি আসিয়াই সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল, ‘মানুষের গন্ধ কোত্থেকে এল? হুঁ হুঁ-মানুষের গন্ধ। মানুষ দে, খাই।

ঘ্যাঁঘার কথা শুনিয়া খাটের তলায় মানিকলালের মুখ শুকাইয়া গেল, ঘেঁঘীর বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। সে অনেক কৌশল করিয়া ঘ্যাঁঘাকে বুঝাইল যে, একটা মানুষ আসিয়াছিল, কিন্তু সেটা ঘ্যাঁঘার নাম শুনিয়াই পলাইয়াছে। ইহাতে ঘ্যাঁঘা কিছু শান্ত হইয়া খাবার খাইতে বসিল।

খাওয়া শেষ হইলে, ঘ্যাঁঘা খাটে শুইয়া নিদ্রা গেল। ঘুমের ভিতর তাহার লম্বা লেজটি লেপের বাহিরে আসিয়া খাটের পাশে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সেই লেজের আগায় অতি চমৎকার পালকের গোছা। মানিক খাটের তলায় অপেক্ষা করিয়া আছে, লেজ দেখিয়াই, সে খ্যাচ করিয়া একটি পালক ছিঁড়িয়া লইল। অমনি ঘ্যাঁঘা ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, ‘ঘেঁঘী, আমার লেজ ধরে যেন কে টানলো। হুঁ হুঁ মানুষের গন্ধ!’

ঘেঁঘী বলিল, ‘তোমার ভুল হয়েছে। অত বড় পালকের গোছা কোথায় আটকে লেজে টান পড়েছে। আর মানুষ ত একটা এসেছিল বলেছি, এ তারই গন্ধ। সেই মানুষটা কত কথা বললে। সেই কাদের বাড়ি লোহার সিন্ধুকের চাবি হারিয়ে গেছে-ঘেঁঘীর কথা শেষ হইতে না দিয়াই ঘ্যাঁঘা বলিল, ‘হ্যাঁ হ্যাঁ! সেই লোহার সিন্ধুকের চাবি! আমি জানি! সেটাকে তাদের খোকা গদির ফুটোর ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে।’ ঘেঁঘী বলিল, ‘আবার কাদের মেয়ের কি অসুখ-।’ অমনি ঘ্যাঁঘা বলিল, ‘কোনা ব্যাঙে ওর চুল নিয়ে গেছে, ঘরের কোনেই তার গর্ত। ঐখান থেকে খুঁড়ে সেই চুল আনলেই মেয়ের ব্যামো সারবে।’ আবার ঘেঁঘী বলিল, ‘যে লোকটা মানুষ ঘাড়ে করে নদী পার করে-?’ ঘ্যাঁঘা বলিল, ‘সেটা একটা মস্ত গাধা। একজনকে কেন নদীর মাঝখানে নামিয়ে দেয় না। তাহলেই ত সে বাড়ি যেতে পারে। যাকে নামিয়ে দেবে, সে-ই মানুষ পার করতে থাকবে!’

মানিকের সকল কাজই আদায় হইল। এখন রাত পোহাইলে ঘ্যাঁঘা বাহিরে চলিয়া যায়, আর সেও বাহিরে আসিতে পারে। রাত ভোর হইলে ঘ্যাঁঘা জলখবার খাইয়া বেড়াইতে বাহির হইল। ঘেঁঘীও মানিককে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া বিদায় করিল।

এরপর প্রথমেই সেই বুড়োর সঙ্গে দেখা। বুড়ো জিজ্ঞাসা করিল, ‘আমার কথা কিছু হল?’ মানিক বলিল, ‘সে হবে এখন, আগে পার কর, আমার বড্ড তাড়াতাড়ি।’ বুড়ো মানিককে কাঁধে করিয়ে পারে লইয়া গেলে পর ডাঙায় উঠিয়া মানিক বলিল, ‘এরপর একজনকে মাঝখানে নামিয়ে দিয়ো; তা হলেই তোমার ছুটি।’ এই কথা শুনিয়া বুড়ো মানিককে অনেক ধন্যবাদ দিয়া বলিল, ‘ভাই, তুমি আমার এমন উপকারটা করলে, ‘আমার ইচ্ছা হচ্ছে, তোমাকে আর দুবার কাঁধে করে পার করি।’ মানিক বলিল, তুমি দয়া করে যা করেছ তাই ঢের। আর আমার বুড়ো মানুষের কাঁধে চড়ে কাজ নেই। আমি এখন দেশে চললাম।’

চারদিন চলিয়া মানিক, যাহাদের মেয়ের অসুখ ছিল, তাহাদের বাড়িতে আবার অতিথি হইল। বাড়ির কর্তা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ঘ্যাঁঘা কিছু বলেছে?’ মানিক বলিল, ‘হ্যাঁ।’ এই বলিয়া ঘরের কোণ হইতে ব্যাঙের গর্ত খুঁড়িয়া যেই চুল বাহির করিল, আর অমনি যে মেয়ে দুই বৎসর যাবৎ মড়ার মতন পড়িয়া ছিল, সে উঠিয়া হাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহাতে বাড়ির সকলে যে কত খুশী হইল, তাহা কি বলিব! মানিককে তাহারা এত টাকা দিল যে, দশটা উটে তাহা বহিতে পারে না।

যাহাদের চাবি হারাইয়া গিয়াছিল, তাহারাও চাবি পাইয়া মানিককে ঢের টাককড়ি দিল। এই সমস্ত টাকাকড়ি লইয়া সে দেশে ফিরিয়া রাজামহাশয়কে ঘ্যাঁঘাসুরের পালক বুঝাইয়া দিল। দেশের সকল লোক ইহাতে মানিকের যার পর নাই প্রশংসা করিল। তাহারা সকলেই বলিল যে, মানিককে এত ক্লেশ দেওয়া রাজার ভারী অন্যায় হইয়াছে, তাহার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিতে আর দেরী করা উচিত নয়। রাজামহাশয় আর কি করেন, শেষটা অনেক কষ্টে রাজি হইলেন।

তারপর খুব জাঁকজমকের সহিত রাজকন্যা ও মানিকের বিবাহ হইল। মানিক এত টাকাকড়ি লইয়া আসিয়াছে যে, তাহাতেই তাহার পরমসুখে দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু রাজামহাশয়ের ইহাতে ভারি হিংসা হইল। তিনি মনে করিলেন, ‘ঘ্যাঁঘাসুরের দেশে গেলে যদি এত টাকা নিয়ে আসা যায়, তবে আমি সেখানে যাব।’

for more books visit www.rashal.com

এই ভাবিয়া রাজামহাশয় ঘ্যাঁঘার মুলুকে যাত্রা করিলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছাইতে পারেন না। কারণ, অজানা নদী পার হইবার সময়, সেই বুড়ো তাঁহাকে মাঝখানে নামাইয়া দিল। রাজামহাশয় হাত জোড় করিয়া মিনতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু বুড়ো তাঁহার কথায় কান দিবার অবসর পায় নাই। ততক্ষণে সে ডাঙ্গায় উঠিয়া উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ি পানে ছুঁটিয়াছে, তাড়াতাড়ি রাজামহাশয়কে ছুটি পাইবার কৌশলটি বলিয়া দিবার কথা তাহার মনে নাই। সুতরাং রাজামহাশয় আজও সেই স্থানেই মানুষ পার করিতেছেন।

পাঠক-পাঠিকার মধ্যে কেহ যদি কখনো ঘ্যাঁঘাসুরের মুলুকে যান, তাহা হইলে দয়া করিয়া বেচারাকে সেই কথাটা বলিয়া দিবেন। কিন্তু পূনরায় নদীর এপারে ফিরিয়া না আসিয়া এ কথা বলিবেন না, কারণ তাহা হইলে কিঞ্চিৎ অসুবিধা হইতেপারে।

বুদ্ধিমান চাকর

এক বাবুর একটি বড় বুদ্ধিমান চাকর ছিল, তার নাম ভজহরি। একদিন ভজহরি পথ দিয়া যেতে যেতে দেখল, তার বাবু বড় ব্যস্ত হয়ে বাড়ির দিকে ছুটে চলেছেন। ভজহরি জিজ্ঞাসা করল, 'বাবু, কোথায় যাচ্ছেন?' বাবু বললেন, 'শিগ্‌গির এস ভজহরি, সর্বনাশ হয়েছে- আমাদের ঘরে আগুন লেগেছে।' তাতে ভজহরি বলল, 'আপনার কোন ভয় নাই বাবু, ও মিছে কথা। আগুন কি করে লাগবে? আমার কাছে যে ঘরের চাবি রয়েছে!'

ভজহরি গেল কলুর দোকানে, এক সের তেল কিনতে। কলু তাকে এক সের তেল মেপে দিল, তাতে বাটিটি ভরে গেল। তখন ভজহরি বলল, 'ফাউ দেবে না।' কলু বলল, 'হ্যাঁ দেব বই কি। কিসে করে নেবে? ভজহরি ভাবল, 'তাই ত কিসে করে নিই? কিন্তু ফাউ না নিয়ে গেলে যে বাবু আমাকে বোকা ভাববেন।' তখন তার মনে হল যে বাটির তলায় একটু গর্ত আছে। অমনি সে বাটিটা উল্টিয়ে নিয়ে সেই গর্তটা দেখিয়ে কলুকে বলল, 'এত ফাউ দাও।' কলু হাসতে হাসতে সেই গর্তে ফাউ ঢেলে দিল, ভজহরি মহা খুশী হয়ে তাই নিয়ে বাড়ি এল।

ভজহরি তার বাবুর সঙ্গে নৌকায় চড়ে নদী পার হচ্ছে। নৌকায় ঢের লোক, ভজহরি ভাবল নৌকা বড্ড বোঝাই হয়েছে, যদি ডুবে যায়। এই ভেবে, সে তাদের পুটলিটা মাথায় করে বসে রইল। বাবু বললেন, 'ভজহরি, পুটলিটা নামিয়ে রাখ না, মাথায় করে কেন কষ্ট পাচ্ছ।' ভজহরি বলল, 'আজ্ঞে না, নৌকা বড্ড বোঝাই হয়েছে, পুঁটলিটা তাতে রাখলে আরো বোঝাই হয়ে যাবে।'

বাড়িতে চোর এসেছে, ভজহরি তা টের পেয়েছে। সে ভাবল, বেটাকে ধরতে হবে। তখন সে মাথায় শিং বেঁধে লেজ পরে উঠানের কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মতলবখানা এই যে, চোর নিশ্চয় তাকে দেখে ছাগল মনে করে তাকে চুরি করতে আসবে, তখন সে তাকে জড়িয়ে ধরবে। চোর এল, ঘরে গিয়ে ঢুকল, ভজহরি উঠানের কোণ থেকে বলল, 'ম্যা-আ-আ-আ।' চোর ঘরের সব জিনিসপত্র বাইরে এনে একটি পুঁটলি বাঁধল। ভজহরি তাকে বলল, ম্যা-আ-আ-আ'। তা চোর তাড়াতাড়ি সেই পুটলি নিয়ে আঁস্তাকুড়ের উপর দিয়ে ছুট দিল। তখন ভজহরি হেসে গড়াগড়ি দিয়ে বলল, 'ব্যাটা কি বোকা, আঁস্তাকুড় মাড়িয়ে গেল, এখন বাড়ি গিয়ে স্নান করতে হবে।'

রামধন লোকটি বেশ সাদাসিধে, কিন্তু একটু রাগী। সে গিয়েছে চোরেদের বাড়ি চাকরি করতে। রাত্রে চোরেরা এক জায়গায় চুরি করতে গেল, রামধনকেও সঙ্গে নিল। সেখানে রামধনকে একটা কচুবনে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'তুই এখানে চুপ করে বসে থাক, আমরা চুরি করে জিনিস নিয়ে এলে সেগুলো বয়ে নিয়ে যাবি।' রামধন বলল, 'আচ্ছা।'

চোরেরা সিঁদ কাটছে, রামধন কচুবনে বসে আছে। সেখানে বেজায় রকমের মশা, রামধনকে কামড়িয়ে পাগল করে তুলল। বেচারা অনেকক্ষণ সয়ে চুপ করে ছিল, তারপর চটাস্ চটাস্ করে দু-একটা মারতে লাগল। শেষে রেগে দিয়ে লাঠি দিয়ে মেরে কচুবন তোলপাড় করে তুলল। সেই শব্দে বাড়ির লোক সব গেলে গিয়ে বলল, 'কে রে তুই? এত গোলমাল করছিস?' রামধন বলল, 'আমি রামধন গো।' বাড়ির লোকেরা বলল, 'ওখানে কি করছিস? রামধন বলল, 'আপনাদের ঘরে যে সিঁদ হচ্ছে!/

তখন ত আর ছুটোছুটি হাঁকাহাঁকির সীমাই রইল না। চোরেরা আর চুরি করবে কি, তাদের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসাই ভার হল। ঘরে এসে তারা তারপর অবশ্যি রামধনের উপর খুবই চোটপাট লাগাল। সে বলল, 'কি করি ভাই, আমার রাগ হয়ে গেল। যে ভয়ানক মশা!' চোরেরা বলল, 'আচ্ছা, খবরদার! আর কখনো এমন করিস নে।'

for more books visit www.rashal.com

পরদিন চোরেরা আবার রামধনকে নিয়ে চুরি করতে গিয়েছে। এবারে রামধন ঠিক করে এসেছে যে মশায় তাকে খেয়ে ফেললেও আর টু শব্দটি করবে না। আর চোরেরাও বেশ বুঝে নিয়েছে যে, রামধনকে বাইরে রেখে ঘরে ঢুকলে বড়ই বিপদ হতে পারে। তাই তারা ভেবেছে ওকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে তারা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে।

একটা বাড়ির কাছে এসে চোরেরা বাইরে থেকেই কেমন করে তার একটা দরজার ছিটকিনি খুলে ফেলল, তারপর রামধনকে বলল, 'তুই চুপি-চুপি ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র বার করে আন্। দেখিস কোন শব্দ করিস না যেন।' রামধন দরজা খুলে ঘরে ঢুকতে গেল। দরজার কব্জায় ছিল মরচে ধরা, তাই দরজা ঠেলতেই সেটা বলল, 'ক্যাঁচ্!' রামধন থতমত খেয়ে অমনি থেমে গেল। তারপর আবার যেই ঠেলতে যাবে, অমনি দরজা আবার বলল, 'ক্যাঁচ্! রামধন তাতে দাঁত খিঁচিয়ে 'আঃ' বলে আবার থেমে গেল। তারপর রামধন কিছুতেই আর রাগ সামলাতে পারল না। তখন সে পাগলের মত হয়ে প্রাণপণে সেই দরজা নাড়তে নাড়তে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'ক্যাঁচ্!- 'ক্যাঁচ্!!- 'ক্যাঁচ্!!!- 'ক্যাঁচ্!!!!' তারপর কি হল বুঝতেই পার।

এ-সব ত শুধু গল্প, এবার একটি সত্যিকারের চাকরের কথা বলি। তার নাম, ধরে নাও যে কেনারাম। কেনারাম সেজেগুজে একটা বোটের ছাতে উঠে বসে আছে-তার বাবুর সঙ্গে এক জায়গায় তামাশা দেখতে যাবে। খানিক বাদেই বোটের ভিতর থেকে জুতোর শব্দ এল। কেনারাম বুঝল বাবু বেরুচ্ছেন, এইবেলা যেতে হবে। সে অমনি তাড়াতাড়ি বোটের ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ল-আর পড়ল ঠিক তার বাবুর ঘাড়ে।

প্রথম যখন কেনারাম আসে তখন একজন পুরনো চাকর বলেছিল, 'বাবু কাছারি থেকে এল রোজ তাঁকে পান খেতে দিও।' সেদিন বাবু কাছারি থেকে এসেই পায়খানায় গেলেন, কেনারামও তাড়াতাড়ি সেইখানেই গিয়ে তাঁকে বলল, 'বাবু, পান এনেছি।'

বেচারাম কেনারাম (নাটক)

প্রথম দৃশ্য

(জামা রিপু করিতে করিতে কেনারাম চাকরের প্রবেশ)

কেনা। ঐ যা! আবার খানিকটা ছিঁড়ে গেল। ছুঁতেই ছিঁড়ে যায়, তা রিপু করব কি? ভাল মনিব জুটেছে, যাই হোক, এই জামাটা দিয়েই ক'বছর কাটালে। তিন বছর ত আমিই এইরকম দেখছি, আরো বা ক'বছর দেখতে হয়। তবু যদি চারটে পেট ভরে খেতে দিত! তাও কেমন? সকালে মনিব চারটি ভাত খান, আমি ফ্যানটুকু খাই, রাত্রিরে তিনি হাঁড়ি চাটেন, আমি শুঁকি। তার উপর শ্রবণশক্তিটি কি প্রখর! বাড়িওয়ালা সেদিন টাকার জন্যে কি-ই না বললে! বাড়িওয়ালা বলে, 'টাকা দেও, ঢের টাকা বাকি।' মনিব বলেন, তা ভাল ভাল, তোমার বাড়ি আজ নেমন্তন্ন?' বাড়িওয়ালা বলে, 'এমন করে ভাড়া ফেলে রাখলে চলে কই?' মনিব বলেন, 'তা আচ্ছা চাকরটিও সঙ্গে যাবে।' বাড়িওয়ালা বেচারী রেগেমেগে চলে গেল। বড়লোক হতে হলে বোধহয় আমার মনিবের মতই কত্তে হয়, কিন্তু এঁর কাছে থেকে বড়লোক হওয়ার কায়দাটাই শেখা হবে। বড়লোক হওয়ার ভরসা বড় নেই। রাখবার সময় কত আশাই দিয়েছিলেন, আর আজ এই তিন বছরে একটি পয়সাও মাইনে দিলেন না! দেখি আজ যদি মাইনে না দেয়, তবে আর এর কাজ করা হচ্ছে না।

[প্রস্থান]

(বেচারাম মনিবের প্রবেশ)

মনিব। চাকরটা জামাটা নিয়ে কত কথাই বলছিল! বেটা ভেবেছে, আমি সত্যিই কালা। আরে আমার মত যদি কান থাকত, তা হলে আর চাকরি কত্তে হত না। আমি যা করে থাই, তাই করে খেতে পাত্ত। ঘরের ভিতরে ক'জন লোক, ক'জন জেগে আছে, ক'জন ঘুমুচ্ছে, দাওয়ায় কান পেতে সব বুঝে নি'। কোথায় সিন্দুকের ভেতরে আরশুলা কড়কড় কচ্ছে, বাইরে থেকে বুঝে নি'। বাপু হে! কানে শুনি, কানে শুনি, কানে শোনাটা ত বেশ ভালই, কিন্তু না শোনার যে সুবিধা আছে, তা ত বুঝবে না? এই সেদিন বাড়িওয়ালা বেটা ফাঁকি দিয়ে টাকা আদায় কত্ত! কানে না শোনার কত সুবিধা দেখো, পাওনাদারদের টাকা দিতে হয় না, বাড়ি ভাড়া দিতে হয় না, চাকরের মাহিনা দিতে হয় না-

for more books visit www.rasmal.com

(কেনারামের প্রবেশ)

কেনা। (উচ্চৈঃস্বরে)। মশাই, হয় তিন বছরের মাইনে দিন, নাহয় আপনার এই-সব রইল, আমি চললেম।

মনিব। ডাকওয়ালা? চিঠি? দেখি?

কেনারাম। (স্বগত)। এই মুশকিল কল্লে! তা এবারে বাপু এক ফন্দি এঁটেছি-সব লিখে এনেছি। (প্রকাশ্যে) চিঠিই বটে, এই নিন্।

মনিব (পাঠ)। 'মনিব মহাশয়, কানে শুনেন না, কিন্তু পড়িতে অবশ্যই পারেন। তিনটি বৎসরের বেতন চুকাইয়া বিদায় দিতে আজ্ঞা হয়। শ্রীকেনারাম চাকর।' - তাই ত, তোমার বেতনটা দিতে হল। তা রাখবার সময় ত কোন বন্দোবস্ত হয়নি, কাজকর্মও তেমন ভাল করে করনি। তিন বছরে তিন পয়সার বেশি তোমার প্রাপ্য হয় না। তা এই নেও। (তিন পয়সা প্রদান ও ধাক্কা দিয়া বহিস্করণ)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(কেনারামের প্রবেশ)

কেনা। এই বড়লোক হলাম আর কি! তিন-তিন বছরের মাইনে, ঢের টাকা-ঢের টাকা। এক দুই তিন, চার পাঁচ ছয়, সাত আট নয়, দশ এগার বার (পয়সা তিনটি পকেটে স্থাপন)

(ছদ্মবেশী স্বর্গীয় দূতের প্রবেশ)

স্বর্গীয় দূত। আরে ভাই, তোর যে ভারি ফূর্তি?

কেনা। কে ও ? ছোট মানুষ? দাড়াঁও, চশমাটা বার করে নি'।

দূত। কেন! চোখে কম দেখ বুঝি?

কেনা। তা কেন? বড়লোক হয়েছি যে, ছোটমানুষ আর তেমন চট করে চোখে মালুম পড়ে না।

দূত। বটে। এত বড়লোক কি করে হলি ভাই?

কেনা। (পকেট চাপড়াইয়া)।-তি-ন-টি-ব-ছ-রে-মা-ই-নে। (এক একটি পয়সা বহিস্করণ ও গম্ভীরভাবে গণন) এ-এ-এ-ক-দু-উ-উ-ই, তি-ই-ই-ন (পকেট উল্টাইয়া গম্ভীরভাবে অবস্থান)।

দূত। তাই ত ভাই, এত টাকা নিয়ে তুই কি করবি? আমি গরিব, আমাকে কিছু দে-না।

কেনা। নিবি? এই নে। ভগবান আমাকে খেটে খাবার শক্তি দিয়েছেন, খেটে খাব। (পয়সা তিনটি প্রদান)

দূত। তুই ভাই বেশ লোক, তোর মনটা খবই খোলা। আমি ঈশ্বরের দূত, ভাল লোক দেখলে পুরস্কার দি'। তোর ব্যবহারে খুব খুশী হয়েছি, তুই কি চাস্ বল্, যা চাস তাই পাবি।

কেনা। অ্যাঁ, আপনি ঈশ্বরের দূত? তবে ত আপনার সম্মুখে আমি বড় বেয়াদপি করেছি?

দূত। তোর কিছু ভয় নেই। তুই আমাকে 'তুই' 'তুমি' যা খুশি বল্, কিছুতেই বেয়াদপি হবে না। এখন তুই কি নিবি বল্।

for more books visit www.rashal.com

কেনা। তা দাদা, যদি দেবে এমন একখানা বেয়ালা দাও যে, যে তার আওয়াজ শুনবে তাকেই তিড়িং তিড়িং করে নাচতে হবে।

দূত। (ঝুলি হইতে বেয়ালা বাহির করিয়া) এই নে।

কেনা। বাঃ, বেশ হল, আমাকে ত সঙ্গে সঙ্গে নাচতে হবে না?

দূত। না, সে ভয় তোর নেই। যা এখন ফূর্তি কর্‌গে। (দূতের প্রস্থানোদ্যম ও কেনারামের বাদ্যোদ্যম) আরে দূর্ হতভাগা, আমারই উপর পরীক্ষা করে বসলি।

কেনা। তুমিই যে ফূর্তি করতে বললে দাদা!

দূত। আমি আগে যাই, তারপর করিস।

কেনা। আচ্ছা।

তৃতীয় দৃশ্য

(বেচারামের প্রবেশ)

বেচা। ঐ ঝোপটাতে ফেলে গিয়েছিলুম। পুলিশ বেটা এমনি তাড়া কল্লে, ধরেই ফেলেছিল আর কি। চট করে টাকার থলেটি ঐ ঝোপটাতে ফেলে পালালুম, এখন পেলে বাঁচি। (থলি খুঁজিতে ঝোপে প্রবেশ) বাপ রে, কি ভয়ানক কাঁটা-এই পেয়েছি।!

(কেনারামের প্রবেশ)

কেনা। (স্বগত)। ঐ যে বেচুবাবু কাঁটাবনে ঢুকছেন। এইবারে এক গৎ বাজিয়ে নি, পুরোনো মনিব বটে! (বেহালাবাদন)

বেচা। (নৃত্য করিতে করিতে)। আরে! আরে! ও কী? উঃ আঃ! আরে তুমি কি-উঃ চক্ষু হু-আরে আর না-জামাটা-উঃ-গায়ের চামড়াও যে ছিঁড়ে গেল-উঃ!

কেনা। আজ্ঞে, আমি আপনার বকেয়া চাকর কেনারাম, মাইনে চুকিয়ে দিয়েছেন বলে কি এমন মনিবকে ভুলতে পারি? আপনাকে বাজনা শুনিয়ে আমার বেয়ালা সার্থক হল। (পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে বাদন)

বেচা। (নৃত্য)। কি মুশকিল। বাবা কেনারাম রক্ষে কর বাবা। এ কি বাজনা যে, শুনলেই নাচতে হয়? বাবা আর কাজ নেই, আমি খুব খুশি হয়েছি, এই টাকার থলি তোমায় দিচ্ছি, তোমার মাইনে এ থেকে পুষিয়ে নাও। দোহাই বাবা, আমায় নাচিও না। (টাকার থলি কেনারামের হাতে প্রদান)

কেনা। (বিনীত অভিবাদন করিয়া)। আজ্ঞে, না হবে কেন? আপনার মত মনিব না হলে গুণ কে বোঝে! দেখছি বেয়ালার আওয়াজে আপনার 'কানে খাটর' ব্যারামটাও সেরে গেল। ভাল ভাল, আর এ ব্যারামের সুত্রপাত দেখলে আমায় খবর দেবেন, আমি বেয়ালা নিয়ে এসে চিকিৎসা করব। (দীর্ঘ অভিবাদন করিয়া প্রস্থান)

বেচা। হতভাগা বেটা, লক্ষীছাড়া বেটা, জোচ্চোর, বাটপাড়, ডাকাত-বেটাকে দেখাচ্ছি। পুলিস। পুলিস। চোর-চোর!

চতুর্থ দৃশ্য

(বিচারালয়। ব্যস্তভাবে বেচারামের প্রবেশ)

for more books visit www.rashal.com

বেচা। দোহাই হুজুর, আমাকে ধনে-প্রাণে মেরেছে, ও হো হো (ক্রন্দন)

বিচারক। আরে ব্যাপার কি? তোমার কি হয়েছে?

বেচা। (কাঁটার আঁচড় ও ভবিত শরীর দেখইয়া)-আর কি হবে, আমি ধনে-প্রানে গিয়েছি। বড় রাস্তার ধারে ঐ কেনা বেটা আমাকে মেরে ধরে টাকাকড়ি কেড়ে নিয়েছে-এঁ হেঁ হেঁ (ক্রন্দন)। বেটাকে তিন বছর আমি খাইয়ে মানুষ কলুম, আর তার এই প্রতিশোধ দিলে। বেটা দিনরাত বেহালা নিয়ে ফেরে, এখনি ধরতে পাঠান, তাকে দেখলেই চিনতে পারবেন!

বিচারক। চারজন লোক এখনি গিয়ে কেনারামকে ধরে নিয়ে এসো।

(কেনারামকে লইয়া চারজন লোকের প্রবেশ)

বেচা। ঐ! ঐ! ঐ বেটা। হুজুর! ঐ কেনারাম বেটা আমার সর্বনাশ করেছে, বেটাকে আচ্ছা করে-

বিচারক। চুপ। (কেনার প্রতি) তুমি একে মেরে এর টাকা কেড়ে নিয়েছ?

কেনা। সে কি, হুজুর! উনি আমার বেয়ালা বাজানো শুনে আমায় এক থলি টাকা পুরস্কার দিয়েছেন-আমি যথার্থ বলছি।

বিচারক। ওর যে চেহারা দেখছি, তাতে ও যে বেহালা শুনে তোমায় এতগুলো টাকা দিয়েছে, তা আমি কিছুতেই বিশ্বাস কত্তে পারিনে। আর ওর গায়েও এই-সব দাগ দেখছি। সুতরাং প্রমান হচ্ছে, তুমিই ওকে মেরে টাকার থলি কেড়ে নিয়েছ। এ ডাকাতি। ডাকাতির শাস্তি ফাঁসি-তোমার ফাঁসি হবে। এখন তোমার যদি কোন আকাঙ্খা থাকে ত বলো।

কেনা। হুজুর, আমার আর কোন সাধ নেই। খালি জন্মের মত বেয়ালা খানা একবার বাজাতে চাই।

বেচা। সর্বনাশ! হুজুর এমন হুকুম দেবেন না।

চাপরাশী। (বেচারামকে রুলের গুঁতো মারিয়া) চুপ্ রও।

বিচারক। আর কোন সাধ তোমার নাই? আচ্ছা বাজাও।

(কেনারামের উৎসাহের সঙ্গে বেহালাবাদন ও বিচারক হইতে চাপরাশী পর্যন্ত সকলে নৃত্য।)

বিচারক। হাঁপাইতে হাঁপাইতে।) আরে বাপু! থাম্ থাম্। শিগ্‌গির থাম্; তোকে বেকসুর খালাস দিচ্ছি, প্রাণ যায়-থাম্। বাপ রে, এ কি রকম বেহালা বাজনা!

কেনা। (সেলাম করিয়া)। হুজুর! বেচুবাবুকে এখন সমস্ত ঘটনা বলতে হুকুম হয়। নইলে আমি পুনরায় বেয়ালায় ছড়ি দিলাম।

বিচারক। (বেচারামের প্রতি সরোষে)। বল্ বেটা কি হয়েছিল, সত্যি করে এখনি বল্।

বেচা। ওগো, না গো, আর বেহালা ধরো না। ও টাকা আমিই দিয়েছি-দিয়েছি।

বিচারক। তুই এত টাকা কোথা পেলি, বল।

বেচা। আমি-আমি-

কেনা। এই বেয়ালা ধরেছি।

for more books visit www.rashal.com

বেচা। না না-আমি, হুজুর আমি-কাল রাত্তিরে হুজুর, চুরি করেছিলাম। দোহাই হুজুর।

কেনা। ধর্মের ঢাক আপনি বাজে। দেখলেন ত বেচুবাবু?

বিচারক। একে পঁচিশ ঘা বেত মারো।

ঝানু চোর চানু

ছেলেবেলা থেকেই চানু শয়তানের একশেষ, আশেপাশের লোকজন তার জ্বালায় অস্থির। চানুর বাবা বড় গরিব ছিল, চানু ভাবল-বিদেশে গিয়ে টাকা পয়সা রোজগার করে আনবে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ, একদিন সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। খানিক দূরে গিয়েই বনের ভিতর দিয়ে একটা নির্জন রাস্তা-চানু সেই রাস্তা ধরে চলল। সমস্ত দিন বৃষ্টিতে ভিজে শ্রান্ত-কান্ত হয়ে স্যার সময় পথের ধারেই একটি কুঁড়েঘর ছিল, সেখানে এসে উপস্থিত।

ঘরের ভিতর আগুনের পাশে একটি বুড়ি বসেছিল, চানুকে দেখে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই বাপু তোমার?'

চানু বলল, 'চাইব আর কি, কিছু খাবার দাবার চাই, আর একটি বিছানা চাই।'

বুড়ি বলল, 'সরে পড় বাপু, এখানে কিছু পাবে না। আমার ছয়টি ছেলে, সারাদিন খেটেখুটে তারা এখনই বাড়ি ফিরবে। তোমাকে এখানে দেখতে পেলে তারা তোমার চামড়া তুলে ফেলবে।'

চানু। 'সেটা আর বেশি কথা কি? এই ঠাণ্ডায় বাইরে গাছের তলায় দাড়িয়ে মরার চাইতে গায়ের চামড়া তুলে ফেলবে, সেইটাই বরং ভাল।'

বুড়ি দেখলে, সে সহজ লোকের পালায় পড়েনি। কি আর করে,চানুকে পেট ভরে খেতে দিল। শুতে যাবার সময় চানু বুড়িকে বলল, 'দেখো বুড়ি! তোমার ছেলেরা এসে যদি আমার ঘুম ভাঙ্গায়, তা হলে কিন্তু বড্ড মুশকিল হবে বলছি।'

পরের দিন ঘুম ভাঙলে পর চানু দেখল, ছয় জন অতি বদ চেহারার লোক তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে-সে তাদের দেখেও গ্রাহ্যও করল না।

দলের সদারটি তখন জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে হে বাপু? কি চাও এখানে?'

চানু। 'আমার নাম সর্দার চোর, আমার দলের জন্য লোক খুঁজে বেড়াচ্ছি। তোমরা যদি চালাক চতুর হও, তা হলে তোমাদের অনেক বিদ্যে শিখিয়ে দেব।'

সর্দার বলল, 'আচ্ছা বেশ, তুমি তা হলে এখন উঠে একটু খাও-দাও,তারপর দেখা যাবে এখন, কে সর্দার।'

বিছানা থেকে উঠে সকলের সঙ্গে বসে চানু খেল। ঠিক তারপরই সকলে দেখল, একটা সুন্দর ছাগল সঙ্গে নিয়ে একজন কৃষক বনের পাশে যাচ্ছে। তখন চানু বলল, 'আচ্ছা, তোমাদের কেউ কোনরকম জবরদস্তি না করে শুধু ফাঁকি দিয়ে ঐ লোকটার ছাগলটা নিয়ে আসতে পার?' একজন করে সকলেই বললে, 'না ভাই, আমরা কেউ তা পারব না।'

চানু। 'ব্যস, ত হলেই দেখো আমি তোমাদের সর্দার কিনা-অমি ছাগলটা নিয়ে আসছি।' এই বলে তো তখনই বনের ভিতর দিয়ে রাস্তার মোড়ে তার ডান পায়ের জুতোটা রেখে দিল, তারপর ছুটে গিয়ে কিছু দূরে রাস্তার আর একটা মোড়ে বাঁ পায়ের জুতোটাও রেখে রাস্তার ধারে বনের ভিতর চুপ করে লুকিয়ে রইল।

for more books visit www.reshal.com

খানিক পরেই সেই কৃষক এসে প্রথম জুতোটা দেখে মনে করল, 'খাসা জুতোটা পড়ে রয়েছে, কিন্তু এক পাটী জুতো দিয়ে কি হবে, আর এক পাটীও থাকলে ভাল হত।'

খানিক দূরে এগিয়ে গিয়ে কৃষক আর-এক পাটী জুতো দেখে ভাবল, 'আমি কি বোকা, ও পাটীটা যদি নিয়ে আসতাম। যাই, তা হলে ওটা নিয়ে আসি গিয়ে।' একটা গাছে ছাগলটা বেঁধে সে চলল জুতো আনতে। এদিকে চানু কিন্তু ছুটে গিয়ে আগেই সেটা নিয়ে এসেছে। তারপর কৃষক ছাগলটাকে বেঁধে রেখে যখন চলে গেল, তখন চানুও বাঁ পায়ের জুতোটা নিয়ে ছাগলটার বাঁধন খুলে সেটাকেও নিয়ে বনের ভিতর দিয়ে বুড়ির কুটিরে এসে উপস্থিত।

কৃষক গিয়ে প্রথম জুতোটাও পেল না, ফিরে এসে পরের জুতোটাও পেল না। তার উপর আবার যখন দেখল যে ছাগলটিও সেখানে নেই, তখন সে ভাবল, এখন করি কি? গিন্নিকে যে বলে এসেছি, বাজারে ছাগলটা বেচে তার জন্যে একখানা গায়ের চাদর কিনে নিয়ে যাব! যাই তা হলে, চুপচাপ গিয়ে আর-একটা জন্তু নিয়ে আসি, ত নইলে যে ধরা পড়ে যাব-গিন্নি ভাববে, আমি বোকার একশেষ।

এদিকে চানু ছাগল নিয়ে বুড়ির বাড়িতে যখন গেল, তখন সেই চোরেরা ত একেবারে অবাক! চানুকে কত করে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু কিছুতেই সে বলল না, কি করে সেই ছাগল আনল।

খানিক বাদেই সেই কৃষক একটা মোটাসোটা সুন্দর ভেড়া নিয়ে এসে উপস্থিত। চানু বলল, 'যাও দেখি, কে জবরদস্তি না করে ভেড়াটা আনতে পার।' ছয় চোরের সকলেই অস্বীকার করল। তখন চানু বলল, 'আচ্ছা, দেখি আমি পারি কি না। আমাকে একটা দড়ি দাও দেখি।' দড়ি নিয়ে চানু বনের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

এদিকে কৃষকটি তার ছাগল চুরির কথা ভাবতে ভাবতে রাস্তা দিয়ে চলেছে, মোড়ের কাছেই এসে দেখে, গাছের ডালে একটা মড়া ঝুলছে। মড়া দেখেই তার গায়ে কাঁটা দিল, 'রক্ষা করো বাবা। খানিক আগে ত এখানে মড়া-টড়া কিছু দেখতে পাই নি!' সামনের মোড়ে গিয়ে কৃষক দেখল আর একটা মড়া গাছের ডালে ঝুলছে। 'রাম রাম রাম-এ হল কি? আমার মাথাটা গুলিয়ে যায় নি ত?' কৃষক তাড়াতাড়ি চলল। কিন্তু কি সর্বনাশ! রাস্তার আর একটা মোড়ে গিয়ে দেখে, সেখানেও একটা মড়া ঝুলছে। পর পর তিন-তিনটে মড়া এতটা কাছাকাছি ঝুলছে দেখে তার মনে সন্দেহ হল-'নাঃ, এ কখনই হতে পারে না। আমারই বোধ করি মাথ খারাপ হয়েছে। আচ্ছা, দেখে আসি আগের মড়া দুটো এখনো গাছে ঝুলছে কি না।' কৃষক সবে মাত্র মোড়টা ফিরেছে, তখন ডালের মরা চট করে নেমে এসে বাঁধন খুলে ভেড়াটাকে নিয়ে বনের ভিতর দিয়ে একেবারে বুড়ির বাড়ি গিয়ে হাজির।

এদিকে কৃষক গিয়ে দেখল, মড়া-টরা কিছুই গাছে ঝুলছে না। ফিরে এসে দেখল তার ভেড়াটাও নেই, কে জানি দড়ি খুলে নিয়ে চম্পট দিয়েছে। তখন তার মনটা কেমন হল তা বুঝতেই পার! বেচারি মাথা খুঁড়তে লাগল-'হায়, হায়। কার মুখ দেখে আজ বেরিয়েছিলাম! এখন গিন্নি কি বলবে? সমস্ত সকালটাই মাটি হয়ে গেল, ছাগল ভেড়া দুটোই গেল। এখন করি কি? একটা কিছু এনে বাজারে বিক্রি করে গিন্নির শাল না কিনলেই চলবে না। আসবার সময় দেখেছিলাম, ষাঁড়টা মাঠে চরে বেড়াচ্ছে। যাই, সেটাই নিয়ে আসি-গিন্নিও দেখতে পারে না।'

চানু যখন চোরদের বাড়ি ভেড়া নিয়ে গিয়ে উপস্থিত, তখন চোরদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। সর্দার চোরটি বলল, 'আর-একটা যদি এরকম চালাকি খেলতে পার, তাহলে তোমাকেই আমাদের সর্দার করব।'

ততক্ষণে কৃষকটিও ষাঁড় নিয়ে এরে উপস্থিত। চানু বলল, 'যাও ত, জবরদস্তি না করে ষাঁড়টা ফাঁকি দিয়ে আনতে পার? কেউ যখন ভরসা পেল না। তখন সে বলল, আচ্ছা, দেখি, আমি পারি কি না।' চানু বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

কৃষকটি খানিক দূর এগিয়ে গিয়েই বনের মধ্যে একটা ছাগলের ডাক শুনতে পেল। ঠিক তার পরেই একটা ভেড়াও ডেকে উঠল। আর তাকে রাখে কে! একটা গাছে ষাঁড়টাকে বেঁধে রেখে ছুটল বনের ভিতর। কৃষক যত যায়, ততই শোনে এই একটু আগেই ডাকছে, দেখতে দেখতে প্রায় আধ মাইল দূরে চলে গেল। তখন হঠাৎ সব চুপচাপ, ভেড়া ছাগলের ডাক আর শুনেত পাওয়া গেল না। এদিক-ওদিক খুঁজে কৃষক একেবারে হয়রান হয়ে গেল-কোথায় বা ছাগল আর কোথাই বা ভেড়া। বেচারি কাহিল হয়ে আবার ফিরে এল। কিন্তু সর্বনাশ! এসে দেখে, ষাঁড়টিও সেখানে নেই। বন উলট পালট করে ফেলল, কিছুতেই আর ষাঁড়ের খোঁজ পেল না।

for more books visit www.rashal.com

চানু যখন ষাঁড় নিয়ে এসে উপস্থিত, তখন আর কথাটি নেই। চোরেরা চানুকে তাদের সর্দার করল। তাদের আনন্দ দেখে কে, সমস্তটা দিন এমন করেই কাটিয়ে দিল। লুটপাট করে চোরেরা যা-কিছু আনত, একটা গহ্বরের মধ্যে সব লুকিয়ে রাখত, রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর তারা চানুকে নিয়ে সেই সমস্ত টাকাকড়ি সব দেখিয়ে দিল-চানুই যে এখন তাদের সর্দার, তাকে সব না দেখালে চলবে কেন।

দলের সর্দার হবার প্রায় এক সপ্তাহ পরে চোরেরা একদিন চানুকে বাড়ির জিম্মায় রেখে চুরি করতে গেল। খালি বাড়ি, চানু সেই শয়তান বুড়িকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, তুমি যে এদের ঘর সংসার দেখ, এরা তোমাকে তার দরুণ কিছু বকশিশ-টকশিশ দেয় না?

বুড়ি। 'বকশিশ দেয়, না ওদের মাথা দেয়!'

চানু! 'বটে, কিছু দেয় না! আচ্ছা এসো আমার সঙ্গে, আমি তোমাকে ঢের টাকা দেব।' বুড়িকে সঙ্গে করে চানু টাকার ঘরে গেল। জন্মেও বুড়ি এত ধন কোনোদিন দেকে নি-মুখ হাঁ করে সেই রাশি রাশি টাকা মোহরের দিকে বুড়ি খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর বুড়ির আহ্লাদ আর ধরি না। হাঁটু গেড়ে মাটিতে পড়ে দুই হাতে টাকাগুলো ঘাঁটতে লাগল। সময় বুঝে চানুও তার পকেট বোঝাই ত করলেই, তারপর একটা থলে মোহর দিয়ে ভর্তি করে চুপিচুপি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের দিক থেকে দরজায় চাবি লাগিয়ে দিল। বুড়ি সেই টাকার ঘরেই আটকা পড়ে রইল।

বেরিয়ে এসেই চানু সুন্দর একটা পোশাক পরলে, তারপর সেই ছাগল, ভেড়া আর ষাঁড়টাকে নেয়ে একেবারে সেই কৃষকের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত। কৃষক তার স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ির দরজায়ই বসেছিল, তারপর সেই হারানো জন্তুগুলো কার বলতে পার কি?

'এগুলো যে আমাদের, আপনি কোথায় পেলেন মশায়?

'এই বনের ভিতর চরে বেড়াচ্ছিল। আচ্ছা, ছাগলটার গলায় একটা থলে ঝুলছে, তাতে দশটা মোহর রয়েছে-ওগুলিও কি তোমাদের?

'না মশায় আমরা গরীব দুঃখী লোক, মোহর কোথা পাব?

'আচ্ছা, মোহরগুলোও তোমরা নাও, আমার কিছু দরকার নেই। 'মোহরগুলি নিয়ে দুই হাত তুলে কৃষক চানুকে আশীর্বাদ করল।

সমস্ত দিন চলে চানু প্রায় সায় সময় তার বাড়িতে এসে উপস্থিত। বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখল, তার মা বাবা বসে আছে। চানু বলল, 'ভগবান আপনাদের ভাল করুন, আজ রাতটা আপনাদের বাড়ি থাকতে পারি কি?

'আপনার মত ভদ্রলোক কি এখানে থাকতে পারবেন? আমরা যে বড্ড গরিব।'

চানু আর চুপ থাকতে পারল না, 'বাবা, তুমি কি তোমার ছেলেকেও চিনতে পারছ না?'

চানুর মা-বাবা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে রইল, তারপর চানুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'এমন সুন্দর পোশাক তুমি কোয়ায় পেলে বাবা?'

চানুঃ 'পোশাক দেখেই অবাক হয়ে গেলে, তা হলে এই টাকাগুলো দেখে কি করবে?' এই বলে চানু পকেট খালি করে সব মোহর টেবিলের উপর রাখল।

এতগুলো মোহর দেখে চানুর বাবার বড্ড ভয় হল। চানু তখন সব কথা খুলে বলল। তার আশ্চর্য বুদ্ধির কথা শুনে চানুর মা-বাপের আনন্দ আর ধরে না।

পরের দিন সকালে চানু বাবাকে বলল, 'বাবা, যাও জমিদারবাড়ি। বলো গিয়ে, আমি তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।'

চানুর কথা শুনে তার বাবার চোখ বড় হয়ে গেল, 'বলিস কিরে বেটা! তা হলে যে আমার পিছনে কুকুর লেলিয়ে দেবে।'

for more books visit www.rashai.com

‘না! তুমি বোলো যে আমি সর্দার চোর, আমার মত ঝানু চোর দুনিয়ায় নেই, জবরদস্ত ও ওস্তাদ চোরদের ফাঁকি দিয়ে লাখ টাকা রোজগার করে এনেছি। দেখো বাবা, যখন দেখবে জমিদারের মেয়েও সেখানে আছে, তখনই এ-সব কথা বোলো।’

‘আচ্ছা, এত করে যখন বলছ, যাচ্ছি। কিন্তু কিছু হবে বলে মনে হয় না।’ প্রায় দুই ঘণ্টা পরে চানুর বাবা ফিরে এল। চানু বলল, ‘কি করে এলে, বাবা?’

‘নেহাত মন্দ নয়। মেয়েটি যে বড় অনিচ্ছুক, তা ত মনে হল না। বোধ করি বাবাজি তুমি এর আগেও তার কাছে এ প্রস্তাবটি করেছ-না? যা হোক, জমিদার বললেন, আসছে রবিবারে তাঁরা বাকি একটি হাঁস ভেজে খাবেন। তুমি যদি কড়া থেকে হাঁসটা বে-মালুম চুরি করতে পার, তা হলে তিনি তোমার কথা ভেবে দেখবেন।’

‘এ আর তেমন শক্ত কাজ কি? দেখা যাবে এখন।’

রবিবার দিন জমিদার এবং বাড়ির সকলে রান্নাঘরে রয়েছেন। হাঁস ভাজা হচ্ছে, এমন সময় রান্নাঘরের দরজা খুলে গেল। একটা অতি কুৎসিত বুড়ো ভিখারি, পিঠে তার একটা মস্তবড় থলে ঝুলছে, সে এসে রান্নাঘরের দরজায় উঁকি মেরে বলল, ‘জয় হোক বাবা! আপনাদের খেয়ে-দেয়ে কিছু থাকলে আমি বুড়ো ভিখারি কিছু খেতে পাব কি?’

জমিদারমশায় বললেন, ‘অবশ্যি পাবে। রান্নাঘরের দাওয়ায় একটু বোসো।’

জানালার পাশে একজন লোক বসেছিল। খানিক পরে সে চেঁচিয়ে উঠল, ‘আরে, মস্তবড় একটা খরগোশ ছুটে বাগানের দিকে যাচ্ছে-এটাকে মারলে হয় না?’

জমিদার ধমক দিয়ে বললেন, ‘খরগোশ মারবার ঢের সময় মিলবে, এখন চুপ করে বসে থাকো।’ খরগোশটা বাগানে গিয়ে ঢুকল। ভিখারি পোশাক- পরা চানু থলের থেকে আর-একটা খরগোশ ছেড়ে দিল। একটু পরেই চাকর আবার চেঁচিয়ে উঠল, ‘বাবু বাবু, খরগোশটা এখনো রয়েছে- এখনো চেষ্টা করলে মারা যায়।’

আবার জমিদার ধমক দিলেন, ‘চুপ করে থাকো বলছি।’

খানিক বাদে চানু আরো একটা খরগোশ থলে থেকে বের করে ছেড়ে দিল। চাকরও চেঁচিয়ে উঠল-আর যায় কোথা! একজন একজন করে সবকটি চাকর রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে খরগোশের পেছনে তাড়া করল, জমিদারমশায়ও বাদ পড়লেন না।

খরগোশ তাড়িয়ে সকলে ফিরে এসে দেখে, ভিখারিও নেই, কড়ার মধ্যে হাঁসও নেই। জমিদারমশাই বললেন, ‘আচ্ছা ফাঁকিটা দিয়েছে চানু, সত্যি সত্যি আমাকে জব্দ করেছে।’

একটু পরেই চানুদের বাড়ি থেকে একজন চাকর এসে জমিদারমশায়কে বলল, ‘আজ্ঞে, আমার মনিব বলে পাঠিয়েছেন, আপনারা অনুগ্রহ করে আমাদের বাড়ি গিয়ে খাবেন।’

জমিদার বড় চমৎকার সাদাসিধে লোক ছিলেন, মনে একটুও অহংকার ছিল না। স্ত্রীকে ও মেয়েকে নিয়ে চানুদের বাড়ি গেলেন। চানুর চালাকির কথা বলে জমিদারমশায় হাসতে হাসতে পাঁজরে ব্যথা ধরিয়ে ফেললেন। মেয়েটি ত আগে থেকেই চানুকে পছন্দ করত, এখন তার পোশাক দেখে এবং তার আদব-কায়দা দেখে মনে মনে আরো খুশি হল।

খাওয়া-দাওয়ার পর জমিদার বললেন, ‘চানু, শুধু হাঁস চুরি করেই আমার মেয়ে পাবে না। কাল রাত্রে আমার আস্তাবল থেকে আমার ছয়টি ঘোড়া যদি চুরি করতে পার, তা হলে দেখা যাবে এখন। ছ’জন সহিস কিন্তু ছয়টি ঘোড়ার পিঠে চড়ে পাহারা দেবে মনে রেখো।’

চানু বললে ‘আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখব এখন।’

for more books visit www.rashal.com

সোমবার রাত্রে জমিদারের আস্তাবলে ছয়জন সহিস ছয়টি ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। বেজায় ঠাণ্ডা, রক্ত যেন জমে যেতে চায়। তাই প্রত্যেকের জামার পকেটে একটি করে মদের বোতল, খানিক পরে পরে একটু করে মদ খেয়ে গা গরম করে নিচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না, তাই সকলে মিলে মহা গল্প জুড়ে দিল। চানুর জন্য আস্তাবলের দরজা খোলাই রেখেছিল। রাত যত বেশি হতে লাগল, ঠাণ্ডাটাও যেন বাড়তে লাগল। মদে আর শানায় না, গায়ে কাঁপুনি ধরে গেল। এমন সময় ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে একটা কদাকার বুড়ি এরে উকি মেরে বলল, 'বাবা সকল, শীতে জমে গেলাম, একমুঠো খড় দাও ত, আস্তাবলের এককোণে রাতটা পড়ে থাকি। তা না হলে বুড়ো মানুষ-শীতে মরেই যাব। 'বুড়ির পিঠে ছয়টা খলে, মুখে প্রায় দু আঙ্গুল লম্বা দাড়ি-চেহারাটি কুৎসিতের একশেষ!

বুড়ি আস্তাবলের দরজার উঁকি মেরে বলল, 'লক্ষ্মী বাপ আমার, বুড়ো মানুষ শীতে মরে গেলাম, ঐ কোণটাতে একটু জায়গা দাও, একমুঠো খড়া নিয়ে পড়ে থাকব এখন।'

সহিসরা ভাবল, 'এলই বা বুড়ি, বেচারি শীতে জমাট বেঁধে গেল, ও ত আর কোনো অনিষ্ট করবে না।' আস্তাবলের কোণে খড় পেতে বুড়ি বেশ আরামে বসল। সহিসরা দেখল, বুড়ি খানিক পরিই একটা কালো বোতল বের করে একটু মদ খেল। তার মুখে আর হাসি ধরে না, যেন সে খুবই আরাম বোধ করেছে। সহিসদের বুড়ি বলল, 'বাবা, তোমাদের সব বোধ করি শেষ করে ফেলেছ, তা আমার কাছে ঢের আছে। তরে কিনা তোমরা পাছে কিছু মনে কর, তাই তোমাদের দিতে ভরসা পাচ্ছি না।' এতে বেজায় শীত, তার উপরে সত্যি সত্যি তাদের মদ শেষ হয়ে গেছে, বুড়ির কথা শুনে সহিসরা যেন হাতে চাঁদ পেল-' সে কি বুড়িমা, তুমি দাও তা হলে ত বেঁচে যাই। ঠাণ্ডায় মরে গেলাম।

বুড়ির বোতলটি দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল, তবুও সহিসদের শীত গেল না। শয়তান বুড়ি তখন আর একটি বোতল বের করে তাদের দিল। এ বোতলটার মদের সঙ্গে কি মেশানো ছিল, খাবা মাত্র সত কটা সহিস ঘোড়ার পিঠে গদির উপরে বসেই নাক ডাকিয়ে ঘুম দিল।

তখন বুড়ি উঠে সব কটা সহিসকে খড়ের উপর শুইয়ে ঘোড়াগুলোর পায়ে মোজা পরিয়ে দিল। তারপর সবগুলিকে নিয়ে একেবারে চানুদের বাইরের একটা ঘরে গিয়ে হাজির।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে জমিদারমশায় প্রথমেই কি দেখলেন? তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়েই চানু ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে, আর তার ঘোড়ার পিছনে পিছনে অপর পাঁচটা ঘোড়াও চলেছে।

জমিদারমশায় অবাক হয়ে রইলেন। মনে মনে বললেন, 'গোল্লায় যা তুই চানু, আর যাদের চোখে ধুলো দিয়েছিস সে বেচারারাও গোল্লায় যাক।' আস্তাবলে গিয়ে সহিস বেটাদের জাগতে জমিদারমশায়কে বেগ পেতে হয়েছিল।

সকালবেলা জমিদারমশায় খেতে বসেছেন, চানুকেও ডেকে এনেছেন, খেতে খেতে চানুকে বললেন, 'কতগুলো বোকা পাঁঠার চোখে ধুলো দিয়েছ এতে তেমন বাহাদুরি নেই। আচ্ছা, আজ বেলা একটা থেকে তিনটে পর্যন্ত আমি ঘোড়ায় চড়ে বাড়ির সামনে ঘুরে বেড়াব। নিও দেখি বাপু আমার ঘোড়াটা চুরি করে! তা হলে বুঝব তুমি বাহাদুর এবং আমার জামাই হবার উপযুক্ত।'

চানু মাথা নিচু করে উত্তর করল, 'যে আজ্ঞে, একবার চেষ্টা করে দেখব এখন।'

একটার পর থেকে জমিদার ঘোড়ায় চড়ে পাইচারি করে একেবারে কাহিল হয়ে পড়লেন। তিনটে বেজে গেল, চানুর টিকিটিও দেখতে পেলেন না মনে করলেন এবারে বাড়ি ফিরে যাবেন, এমন সময় তাঁর একটা চাকর পাগলের মত ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে হাজির-'কর্তা শিগগির বাড়ি যান, মা ঠাকরুনকে বুঝি বা আর দেখতে পেলেন না। সিঁড়ির উপর থেকে তিনি পড়ে গেছেন। বোধ করি হাত-পা সব ভেঙে গেছে, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। আমি চললাম ডাক্তারের বাড়ি।'

জমিদারের হোঁচট খেতে খেতে বাড়ি এসে উপস্থিত। এসে দেখলেন, সাড়া শব্দ কিছু নেই, সব চুপচাপ। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বাড়ির ভেতরে গেলেন, সেখানে বসবার ঘরে গিন্নি আর মেয়ে দিব্যি আরাম করে বসে আছেন। ততক্ষণে জমিদারমশায়ের চৈতন্য হল। তিনি বুঝতে পারলেন, এ-সব চানু বেটারই চালাকি-বেটা তাঁকে আচ্ছা ঘোল খাইয়েছে।

for more books visit www.rashal.com

খানিক পরেই দেখলেন, চানু তাঁর ঘোড়ায় চড়ে বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছে। সেই চাকর বেটার কিন্তু আর কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। চাকর তার জন্য একটুও কেয়ার করে না, নাইবা করল তার চাকরি-চানু যে তাকে দশটা মোহর দিয়েছিল, তা দিয়ে তার অনেক দিন চলবে।

পরের দিন চানু এসে জমিদার বাড়ি উপস্থিত। জমিদার বললেন, 'তুমি বাপু এবারে নেহাত ফাঁকি দিয়েছ, ওতে তোমার উপার আমার বড্ড রাগ হয়েছে। যা হোক আজ রাত্তিরে যদি আমাদের বিছানার থেকে চাদরখানা চুরি করতে পার, তা হলে কালকেই বিয়ের আয়োজন করব।'

চানু বলল, 'আজ্ঞে আচ্ছা, একবার চেষ্টা করে দেখব। কিন্তু এবারেও যদি ফাঁকি দেন তা হলে কিন্তু আপনার মেয়েকেই চুরি করি নিয়ে যাব।'

রাত্রে জমিদার আর তাঁর গিন্নি শুয়েছেন। দিব্যি জ্যোৎস্না। কাঁচের জানালার ভিতর দিয়ে চাঁদের আলো এসে ঘরে পড়েছে। জমিদারমশাই দেখলেন, হঠাৎ যেন একটা মাথা জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে যাচ্ছিল, তাঁদের দেখতে পেয়েই আবার সরে পড়ল।

জমিদার গিন্নিকে বললেন-'দেখলে ত? এ বেটা নিশ্চয় চানু।' তারপর বন্দুকটা হাতে করে নিয়ে বললেন, 'দেখো, আমি বেটাকে এখনি চমকে দিচ্ছি।'

বন্দুক দেখেই জমিদার গিন্নি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কর কি, চানুকে গুলি করবে না কি?

জমিদার বললেন, 'আরে না, তুমি কি পাগল হলে নাকি? বন্দুকে কি আর গুলি পুরেছি-শুধু বারুদ।'

খানিক পরেই আবার জানালায় মাথা উঁকি মারল, দড়াম করে জমিদার বন্দুক ছুঁড়ে দিলেন-সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলেন, ধপ করে কি নীচে পড়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লেগেছে।

জমিদার গিন্নি চেঁচিঁয়ে উঠলেন, 'হায় ভগবান, বেচারি বোধ করি মরে গেছে, আর নাহয় জন্মের মত খোঁড়া কানা হয়ে থাকবে।'

জমিদার মশায় কেমন জানি থতমত খেয়ে গেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন- দরজা খোলাই পড়ে রইল।

জমিদার মশায় বোধ করি তখনো বাইরের জানালার কাছে পৌঁছান নি, কিন্তু গিন্নিঠাকরুণ শুনলেন, কর্তা ফিরে এরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'শিগগির বিছানার চাদরখানা দাও। বেটা মরেনি বোধ হয়, কিন্তু বেজায় রক্ত পড়ছে-একটু পরিস্কার করে বেঁধে ঢেঁধে ওকে নিয়ে আসব।'

গিন্নিঠাকরুন একটানে চাদরখানা বিছানা থেকে তুলে দরজায় ছুঁড়ে দিলেন। চাদর নিয়ে জমিদারমশায় আবার ছুটলেন। কিন্তু কি আর্শ্চয, সেই মুহূর্তেই তিনি ফিরে এসে ঘরে উপস্থিত-সে সময়ের মধ্যে বাগানে জানালার কাছে গিয়ে ফিরে আসা একেবারে অসম্ভব।

ঘরে ঢুকেই জমিদার রেগে মেগে বলতে লাগলেন-'বেটা পাজি চানু, তোকে ফাঁসি দেওয়া দরকার।'

কর্তার কথা শুনে গিন্নি অবাক হয়ে বললেন-বেচারির বেজায় লেগেছে আর তুমি কিনা তাকে গালাগালি দিচ্ছ!

'ওর বাস্তবিক লাগাটাই উচিত ছিল। বেটার বদমাইশি দেখেছ? খড় দিয়ে একটা মানুষ বানিয়ে সেটাকে কাপড়-চোপড় পরিয়ে এনে জানালায় ধরেছিল।'

'কী ছাই মাথা মুণ্ডু বলছ, আমি বুঝতেই পারছি না। খড়ের মানুষ হলে তার রক্ত মুছবার জন্য আবার বিছানার চাদর চেয়ে নিয়ে গেলে কেন?

for more books visit www.rashal.com

‘বিছানার চাদর-বলছ কি! আমি ত বিছানার চাদর-টাদর চাইতে আসি নি।’

‘চাদর চাইতে আস আর না আস, আমি সে-সব কিছু জানি না। তুমি এস দরজায় দাঁড়িয়ে চাদর চাইলে, আর আমিও তোমাকে দিয়েছি।’

গিন্নির কথা শুনে জমিদার মশায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন-‘কি ভীষণ শয়তান রে বাবা চানু ওর সঙ্গে আর পেরে উঠব না। কাল সকালেই বিয়ের বন্দোবস্ত করতে হবে দেখছে।’

এরপর চানুর সঙ্গে জমিদার মশায় কন্যার বিয়ে হয়ে গেল বিয়ের পর চানু খুব ভাল হয়ে গেল। তার মত জামাই সচরাচর মেলে না। জমিদার মশায় এবং তাঁর গিন্নি শতমুখে চানুর সুখ্যাতি করেন আর লোকের কাছে বলেন- ‘আমার ঝানু চোর চানু।’

ছোট ভাই

সাতটি ভাই ছিল, তাদের সকলের ছোটটির নাম ছিল রুরু। দেশের মধ্যে তারা সাতটি ভাই দেখতে আর সকল ছেলের চেয়ে সুন্দর ছিল। তাদের মধ্যে আবার রুরু ছিল সকলের চেয়ে সুন্দর। রুরুকে সকলেই কেন এত সুন্দর বলে আর তাদের ব'লে না, এই জন্য রুরুর বড় ভাইয়েরা তাকে বড্ড হিংসা করত। ভাল ভাল কাপড়গুলো সব তারা ছ'জনায় পরে বেড়াত, রুরুকে পরতে দিত শুধু ছেঁড়া ন্যাকড়া। যত বিচ্ছিরি নোংরা কাজ, সব তারা রুরুকে দিয়ে করাত, আর নিজেরা বাবুগিরি করে বেড়াত। তবু সকল লোকে রুরুকেই বেশি ভালবাসত, বড় কটিকে কেউ দেখতে পারত না। তাতে তারা আরো চটে রুরুকে যখন তখন ধরে ঠ্যাঙাত। বেচারাকে এক দণ্ডও সুখে থাকতে দিত না।

রুরুদের গ্রাম থেকে ঢের দূরে ররঙ্গা বলে একটি মেয়ে থাকত। এমন সুন্দর মেয়ে এই পৃথিবীতে আর কোথাও ছিল না। তার কথা শুনেই রুরুর দাদারা বলল, ‘চল, আমরা সেই মেয়েকে দেখতে যাব। আমাদের মত সুন্দর ছেলে আর কোথায় আছে? আমাদের দেখলেই নিশ্চয় সেই মেয়ে আমাদের একজনকে বিয়ে করে ফেলবে।’

তখন ত তাদের খুবই আনন্দ আর উৎসাহ হল। ছ'জনের প্রত্যেকে ভাবল, ‘ররঙ্গা নিশ্চয়ই আমাকে বিয়ে করবে।’ কত গহনা এনে যে তারা তাদের ছ'টি পুঁটলির ভিতরে পুরল, তার লেখাজোখা নেই। মস্ত বড় পানসি তাদের জন্য তয়ের হল। ছ'ভাই মিলে আজ কতরকম করেই পোশাক পরেছে আর চুল আঁচড়েছে, একটু পরে পানসিতে চড়ে বউ আনতে যাবে।

তাদের মা জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হ্যাঁরে, তোরা রুরুকে সঙ্গে নিবি না?’ অমনি তারা ছ'জন একসঙ্গে বলল, ‘নেব বইকি। নইলে আমাদের রান্না কে করবে? ররঙ্গাকে দেখতে যাবার সময় আমরা তাকে আমাদের বাসায় রেখে যাব। ও যে ছেঁড়া কাপড় পরে, ও আমাদের ভাই, এ কথা জানলে লোকে কি বলবে?’

রুরু সবই শুনল, কিন্তু কিছু বলল না। সেও তার দাদাদের সঙ্গে সেই পানসি চড়ে ররঙ্গাদের দেশে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানকার লোকেরা এর আগেই শুনতে পেয়েছিল যে, কয়েকটি খুব সুন্দর ছেলে তাদের দেশে বউ খুঁজতে যাচ্ছে। তারা সেই পানসি পৌছিবামাত্রই এসে রুরুর দাদাদের আদর করে তাদের গ্রামে নিয়ে গেল। সেখানে তারা বাড়ি ঘর সাজিয়ে মস্ত ভোজের আয়োজন আগেই করে রেখেছিল।

ছ'ভাই হাসতে হাসতে দুলতে দুলতে তাদের সঙ্গে চলে গেল। রুরুকে বলে গেল, ‘আমাদের জন্য একটি বাসা ঠিক করে জিনিসপত্র সব তাতে নিয়ে রাখবি।’

তারপর তাদের খাওয়া-দাওয়া আমোদ-আহ্লাদ খুবই হল। সেখানে অনেক মেয়ে ছিল, কিন্তু তাদের কোনটি যে ররঙ্গা, ছ'ভাইয়ের কেউ তা বুঝতে পারল না। তাদের প্রত্যেকেই তার পাশের মেয়েটিকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করল, ‘কোনটি ররঙ্গা?’ সেই মেয়েদের প্রত্যেকেই বলল, ‘আমিই ররঙ্গা, কাউকে বোলো না।’

for more books visit www.tanbir.com

এ কথা শুনে ত ভাইদের আনন্দের সীমাই রইল না। অত সহজে ররঙ্গাকে পেয়ে যাবে, তা তারা মোটেই ভাবে নে। তারা তখনই সেই মেয়েগুলোর সঙ্গে বিয়ের কথা ঠিক করে ফেলল। তারপর কয়েক দিনের মধ্যেই তাদের বিয়ে হয়ে গেল। সকলেই ভাবল, ররঙ্গাকে বিয়ে করেছি। ঠকেছে যে, সে কথা কারুরই মনে হল না।

রুবু বিচারা এত কথার কিচ্ছু জানে না, আর তার জানবার দরকারই বা কি? প্রথম দিন বাসা ঠিকঠাক করে সে কলসী হাতে জল আনতে বেরিয়েছিল। জল কোথায় আছে, তা ত সে আর জানে না, তাই সে একটি ছোট্ট মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁ গা, কোথায় জল পাব?' মেয়েটি বলল, 'ঐ যে ররঙ্গার বাড়ি, তার পাশে ঝরনা আছে।'

রুবু সেই দিকে জল আনতে চলল। যেতে যেতে সে ভাবল, 'ররঙ্গা ত ভোজে গিয়েছে। এর মধ্যে আমি একটি উঁকি মেরে দেখে নিই না, তার বাড়িটি কেমন।' এই ভেবে সে আস্তে আস্তে সেই ঘরটির দরজার কাছে গিয়ে উঁকি মারল। উঁকি মেরে আর তার সেখান থেকে চলে আসবার কথা মনে রইল না। সে দেখল, ঘরের ভিতরে ররঙ্গা বসে আছে! নিশ্চয় সে ররঙ্গা, নইলে এত সুন্দর আর কে হবে?

ররঙ্গা তাকে দেখেই ভারি খুশি হয়ে অমনি তাকে ডাকল, 'এসো, এসো, ঘরে এসো।' রুবু জড়সড় হয়ে গেল। তখন ররঙ্গার জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে?' রুবু বলল, 'সেই যে ছ'জন লোক বউ খুঁজতে এসেছে, যাদের জন্য ভোজ হচ্ছে, আমি তাদের ছোট ভাই।' ররঙ্গা বলর, 'তুমি কেন তবে ভোজে যাও নি?' রুবু বলল, 'আমাকে তারা নিয়ে যায় নি, কাজ করবার জন্য বাসায় রেখে গেছে। আমার এর চেয়ে ভাল কাপড় নেই। এগুলো কাজ করতে করতে ময়লা হয়ে ছিঁড়ে গেছে।'

রুবুকে দেখেই ররঙ্গার যার পর নাই ভাল লেগেছিল, তার কথা শুনে তার বড়ই দুঃখ হল। সে বুঝতে পারল যে রুবুর দাদারা বড় দুষ্টু, তাকে কষ্ট দেয়। তখন রুবুকে তার আরো ভাল লাগল। দুদিন পরে তাদে বিয়ে হয়ে গেল।

তার পরদিন রুবুর দাদারা বউ নিয়ে ঘরে যাবে। রুবুযে তার আগেই ররঙ্গাকে নিয়ে নৌকোর তলায় লুকিয়ে রেখেছে, সে কথা তাদের কেউ টের পায় নি। তারা ভারি ধুমধাম করে দেশে এল। তারপর বউ নিয়ে বাড়িতে পা দিয়েই সকলের বড় ভাই তাদের মাকে বলল, 'এই দেখো মা, ররঙ্গাকে বিয়ে করে এনেছি!' অমনি তার ছোট ভাই তার চেয়ে বেশি করে চেঁচিয়ে বলল, 'না মা, ও মিছে কথা বলছে, আমি ররঙ্গাকে এনেছি।'

তখন ত ভারি মজা হল। সবাই বলছে, 'ওদের কথা মিথ্যে, আমি ররঙ্গাকে এনেছি।'

ভয়ানক চটাচটি, মারামারি হয় হয়। বউ কটি থতমত খেয়ে মুখ চাওয়া- চাওয়ি করছে, তারা ভাবে নি যে অত সহজে ধরা পড়ে যাবে।

তখন মা বললেন, 'বাবা, ররঙ্গা ত ছটি নয়, আর এদের একটিও তেমন সুন্দরীও নয়। তোমরা ঠকে এসেছ।' রুবু এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, মার কথা শুনে সে বলল, 'ঠিক বলেছ মা, ঠকে এসেছে। আমার সঙ্গে এসো, আমি ররঙ্গাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

এ কথায় রুবুর দাদারা ত হেসেই গড়াগড়ি দিতে লাগল। কিন্তু মা বললেন, 'আচ্ছা গিয়েই দেখি না।' বলেই তিনি রুবুর সঙ্গে নৌকায় এলেন, আর একটিবার ররঙ্গার মুখের দিকে চেয়েই তাকে কোলে নিয়ে আনন্দে নাচতে লাগলেন। সে খরব দেখতে দেখতে গ্রামময় ছেয়ে ফেলল। তখন পাড়ার ছেলে বুড়ো, গিন্নি বউ সকলে ছুটে এসে ররঙ্গাকে ঘিরে নাচতে লাগল।

এ সব দেখে দাদারা চোখ লাল করে, দাঁত খিঁচিয়ে তাদের স্ত্রীদের বলল, 'ফাঁকি দিয়েছিস?' শুনে সকলে হো হো করে হাসল। তাদের মা বললেন, 'আর কেন বাছা? চুপ করো! তোমরা যেমন, তোমাদের তেমনি জুটেছে।'

কাজির বিচার

for more books visit www.rashal.com

রামকানাই ভাল মানুষ-নেহাত গোবেচারা। কিন্তু ঝুটারাম লোকটি বেজায় ফন্দিবাজ। দুইজনে দেখা-শোনা আলাপ-সালাপ হল। ঝুটরাম বললে, 'ভাই দুজনেই বোঝা বয়ে কামকা কষ্ট পাই কেন? এই নাও, আমার পুঁটলিটাও তোমায় দিই-এখন তুমি সব বয়ে নাও। ফিরবার সময় আমি বইব। 'রামকানাই ভালমানুষের মত দুজনের বোঝা ঘাড়ে বয়ে চলল।

গ্রামের কাছে এসে তাদের খুব খিদে পেয়েছে। রামকানাই বলল, 'এখন খাওয়া যাক-কী বল?' ঝুটারাম বলল, 'বেশ ত, এক কাজ করো, খাবারের হাঁড়ি দুটোই খুলে কাজ নেই মিছামিছি দুটোই নষ্ট হবে কেন? এখন তোমারটা থেকে খাওয়া যাক। ফিরবার সময় আমার খাবারটা খাওয়া যাবে। রামকানাই তাই করল। ঝুটরাম বলল, 'ভাই তোমার বাড়ি কে কে আছে?' রামকানাই তার বাবা, মা, ভাই, বোন, স্ত্রী ছেলেপিলে সকলের কথা বলতে লাগল-তার মেয়ে কত বড় হয়েছে-তার ছেলে কি করে-সব কথা বলল। রামকানাই যত কথা বলে, ঝুটারাম ততই আরো প্রশ্ন করে, আর গপাগপ ভাত মুখে দেয়। রামকানাই গল্পেই মত্ত, তার যখন হুঁশ হল- ততক্ষণে খাবার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

ঝুটারাম খাওয়া দাওয়া শেষ করে গম্ভীরভাবে ধুয়ে বলল, 'ভাই একটি কথা। তুমি যে আমায় খাওয়ালে, সে এমন বিশ্রী রান্না, যে কি বলব! তুমি এমন খারাপ লোক, তা আমি জানতাম না। নেহাত তুমি বন্ধু লোক, তোমায় আর বেশি কি বলব, কিন্তু এরপর আর তোমার সঙ্গে আমার ভাব রাখা চলে না। আমি চললাম।' এই বলে সে ভরা হাঁড়ি কাঁধে নিয়ে হন হন করে চলে গেল। সন্ধ্যার সময় পেটে খিদে নিয়ে এতখানি পথে হেঁটে কি করে সে বাড়ি ফিরবে-তাই ভেবে কাঁদতে লাগল।

এমন সময় কাজির পেয়াদা সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। সে রামকানাইকে বললে, 'কাঁদ কেন?' রামকানাই তাকে সব কাথা বলল। পেয়াদা বলল, 'এই কথা। চলো দেখি বাজি সাহেবের কাছে। তিনি এর বিচার করেন।' কাজির কাছে হাজির হতেই হুজুর বললেন, 'কি চাও?' রামকানাই তাঁকেও সব শোনাল। কাজি শুনে বললেন, 'হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! এমন মজা ত কখনো শুনি নি! আরে, তোকে দিয়ে জিনিস বইয়ে, আবার তোরই ভাত খেতে গেল? তোর আক্কেল ছিল কোথায়? হাঃ-হাঃ-হাঃ- বোলাও ঝুটারামকো!' পেয়াদা ছুটল-তিন মিনেটের মধ্যে ঝুটারামের ঝুঁটি ধরে কাজির সামনে দাঁড় করাল।

কাজি বললেন, 'আরে দাঁড়াও দাঁড়াও। মোড়লকে ডাকো, শেঠজীকে ডাকো, কোটাল বদ্যি গুরুমশাই - ঢাক পিটিয়ে সবাইকে ডাকো, এমন মজার কথাটা সবাই এসে শুনে যাক।' দেখতে দেখতে ঘর ভরিয়ে ভিড় জমিয়ে লোকের দল হাজির হল। তখন কাজি বললেন, 'বাবা ঝুটারাম, এবার তুমি বলো দেখি, তোমাতে আর এতে কি হয়েছিল? ঝুটারাম ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'দোহাই হুজুর, আমি কিছুই জানি না। ঐ হতভাগা আমায় ভুলিয়ে খানিকটা খাবার খাইয়েছিল-সেই থেকে আমার মাথা ঘুরছে আর গা কেমন করছে।'

এই কথা শুনে রেগে চিৎকার করে কাজি বললেন, 'পাজি, আমার মজার গল্পটা মাটি করলি। খাবার থেলি আর মাথা ঘুরল, এ কি একটা কথা হল? পেয়াদা, দেখ ত ওর কাছে কি আছে। সব কেড়ে রাখ। ব্যাটার গল্পের মধ্যে যদি একটু রস থাকে। ও-সব ঐ রামকানাইকে দিয়ে দে। ও যা বলছে সত্যি হোক, মিথ্যা হোক, তার মধ্যে মজা আছে। আরে-হাঃ-হাঃ- হাঃ-হোঃ-হোঃ-হোঃ।'

সাতমার পালোয়ান

এক রাজার দেশে এক কুমার ছিল, তার নাম ছিল কানাই।

কানাই কিছু একটা গড়িতে গেলেই তাহা বাঁকা হইয়া যাইত, কাজেই তাহা কেহ কিনিত না। কিন্তু তাহার স্ত্রী খুব সুন্দর হাঁড়ি কলসি গড়িতে পারিত্ ইহাতে কানাইয়ের বেশ সুবিধা হইবারই কথা ছিল। সে সকল মেহন্নত তাহার স্ত্রী ঘাড়ে ফেলিয়া সুখে বেড়িয়া বেড়াইতে পারিত। কিন্তু তাহার স্ত্রী বড়ই রাগী ছিল, কানাইকে আলস্য করিতে দেখিলেই সে ঝাঁটা লইয়া আসিত। সুতরাং মোটের উপর বেচারার কষ্টই ছিল বলিতে হইবে।

একদিন কানাইয়ের স্ত্রী কতকগুলি হাঁড়ি রোদে দিয়ে বলিল, 'দেখ যেন কিছুতে মাড়ায় না।'

কানাই কিছু চিঁড়ে আর ঝোলাগুড় এবং এবং একটা লাঠি লইয়া হাঁড়ি পাহারা দিতে বসিল। এক-একবার চিঁড়ে খায় আর এক-একবার হাঁড়ির পানে তাকাইয়া দেখে, কিছুতে মাড়াইল কি না। কানাইয়ের ঝোলাগুড়ের খানিকটা কেমন করিয়া হাঁড়ির উপর পড়িয়াছিল, অনেকগুলি

for more books visit www.rasmal.com

মাছি রোসো!' এই বলিয়া সে তাহার লাঠি দিয়া মাছিগুলিকে এমন এক ঘা লাগাইল যে তাহাতে মাছিও মরিয়া গেল, হাঁড়িও গুঁড়া হইয়া গেল।

কানাই গনিয়া দেখিল যে, সাতটা মাছি মরিয়াছে। তাহাতে সে লাঠি বগলে করিয়া ভারি গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। হাঁড়ি ভাঙ্গার শব্দ শুনিয়া তাহার স্ত্রী ঝাঁটা হাতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়েছে?' কানাই কথা কয় না। তাহার স্ত্রী যতই জিজ্ঞাসা করে, সে খালি আরো গম্ভীর হইয়া যায়।

শেষটা যখন তাহার স্ত্রী বাড়াবাড়ি করিল, তখন সে চোখ লাল করিয়া বলিল, 'দেখ, হিসেব করে কথা কোস। এক ঘায় সাতটা মেরেছি, জানিস?'

কানাই আর কাহারো সঙ্গে কথা কয় না। বেশি পীড়াপীড়ি করিলে খালি বলে, 'হিসেব করে কথা কোস্। এক ঘায় সাতটা মেরেছি, জানিস?'

শেষে একদিন কানাই এক থান মার্কিন দিয়া মাথায় একটা পাগড়ি বাঁধিল। বনের ভিতর হইতে বাঁশ কাটিয়া একটা ভয়ানক মোটা লাঠি তয়ের করিল। তারপর পিরান গায়ে দিয়া কোমর বাঁধিয়া, ঢাল হাতে করিয়া, জুতা পায় দিয়া, রাজার বাড়িতে পালেয়ানগিরি করিতে চলিয়া যাইবার সময় তাহার স্ত্রীকে বলিয়া গেল-'আমি আর তোদের এখানে থাকব না। আমি এক ঘায় সাতটা মারতে পারি।'

পথের লোক জিজ্ঞাসা করে , 'কানাই, কোথায় যাও?' কানাই সে কথার কোন উত্তর দেয় না। সে মনে করিয়াছে যেন এখন আর কানাই বলিয়া ডাকিলে উত্তর দিবে না। সে এক ঘায় সাতটা মারিয়া ফেলিয়াছে! এখন কি আর তাহাকে কানাই ডাকা সাজে? এখন তাহাকে বলিতে হইবে, 'সাতমার পালোয়ান।'

রাজার নিকট গিয়া কানাই জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল। রাজা তাহার সেই এক থান মার্কিনের পাগড়ি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা কারিলেন,
'তোমার নাম কি হে?' কানাই বলিল, 'মহারাজ, আমার নাম সাতমার পালোয়ান। আমি এক ঘায় সাতটাকে মারতে পারে।'

কানাই রাজার বাড়িতে পালোয়ান নিযুক্ত হইল। মাইনে পঞ্চাশ টাকা। এখন তার দিন সুখেই যায়।

ইহার মধ্যে একদিন সেই রাজার দেশে এক বাঘ আসিয়া উপস্থিত। সে মানুষ মারিয়া গরু বাছুর খাইয়া, দৌরাত্ম্য করিয়া দেশ ছারখার করিবার জোগাড় করিল। যত শিকারী তাহাকে মারিতে গেল, সব কটাকে সে জলযোগ করিয়া ফেলিল। রাজামহাশয় অবধি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, 'দেশ আর থাকে না।'

এমন সময় কোথাকার এক দুষ্ট লোক আসিয়া রাজার কানে কানে বলিল, 'মহারাজশয়, এত যে ভাবছেন, তবে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে পালোয়ান রেখেছেন কি করতে? তাকে ডেকে কেন বাঘ মেরে দিতে হুকুম করুন না।'

রাজা বলিলেন, 'আরে তাই ত। ডাক্ পালোয়ানকে!'

রাজার তলব পাইয়া কানাই আসিয়া হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইরে রাজা বলিলেন, 'সাতমার পালোয়ান, তোমাকে ঐ বাঘ মেরে দিতে হবে। নইলে তোমার মাথা কাটব।'

কানাই লম্বা সেলাম করিয়া বলিল, 'বহুত আচ্ছা মহারাজ, এখনি যাচ্ছি।'

ঘরে আসিয়া কানাই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। হায়, হায়! এমন সুখের চাকরিটা আর রহিল না, সঙ্গে সঙ্গে বুঝি প্রাণটাও যায়! কানাই বলিল, 'এখন আর কি? বাঘ মারতে গেলে বাঘে খাবে, না গেলে রাজা মারবে। দূর হোক গে, আমি আর এদেশে থাকব না।'

for more books visit www.rashal.com

সেদিন সন্ধ্যার পর কানাই তাহার পাগড়িটা মাথায় জড়াইয়া, কোমরটা আঁটিয়া বাঁধিল। এক হাতে ঢাল, আর-এক হাতে ডান্ডা, পিঠে পুঁটুলি, পায়ে নাগরা জুতো। সকলে মনে করিল, সাতমার পালোয়ান বাঘ মারিতে চলিয়াছে। কানাই মনে করির, এ রাজার দেশ ছাড়িয়া যাইতে হইবে।

যত শীঘ্র যাওয়া যায় ততই ভাল। একটা ঘোড়া হইলে আরো শীঘ্র যাওয়া হইত।

ততক্ষণে বাঘ করিয়াছে কি-এক বুড়ির ঘরের পিছনে চুপ মারিয়া বসিয়া আছে। ইচ্ছাটা, বুড়ি কিংবা তাহার নাতনী একটিবার বাহিরে আসিলেই ধরিয়া খাইবে। বুড়ি ঘরের ভিতরে লেপ মুড়ি গিয়া শুইয়াছে। তাহার বাহিরে আসিবার ইচ্ছা একেবারেই নাই। এতক্ষণে যে কখন ঘুমাইয়া পড়িত, খালি নাতনীটার জ্বালায় পারিতেছে না। বুড়ি অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তাহাকে ঘুম পাড়াইতে পারে নাই। শেষে রাগিয়া বলিল, 'তোকে বাঘে ধরে নেবে।' নাতনী বলিল, আমি বাঘে ভয় করি না।' বুড়ি বলিল, 'তবে তোকে ট্যাঁপায় নেবে।'

বাস্তবিক ট্যাঁপা বলিতে একটা কিছু নাই, বুড়ি তাহার নাতনীকে ভয় দেখাইবার জন্যই ঐ নামটা তয়ের করিয়াছিল। কিন্তু বাঘ ঘরের পিছন হইতে ট্যাঁপার নাম শুনিয়া ভারি ভয় পাইয়া গেল। সে মনে মনে বলিল, 'বাস রে! আমাকে ভয় করে না, কিন্তু ট্যাঁপাকে ভয় করবে! সেটা না জানি কেমন ভয়ঙ্কর জানোয়ার। যদি একবার সেই জানোয়ারটা এই দিক দিয়ে আসে, তা হরল ত মুশকিল? দেখছি।'

অন্ধকারে বসিয়া বাঘ এইরূপ ভাবিতেছে, আর ঠিক এমনি সময় কানাই সেই পথে পলায়ন করিতেছে। বাঘকে দেখিয়া কানাই মনে ভাবিল, 'বাঃ, এই ত একটা ঘোড়া বসে আছে!' এই বলিয়াই সে কোমরের কাপড়টা খুলিয়া বাঘের গলায় বাঁধিল।

আন্ধকারে বাঘকে কানাই ভাল করিয়া চিনিতে পারে নাই। বাঘও কানাইকে তাহার পাগড়ি-টাগড়ি সুদ্ধ একটা নিতান্তই অদ্ভুত জন্তুর মতন দেখিল। একটা মানুষ হঠাৎ আসিয়া যে তার মতন জন্তুর সামনে একটা বেয়াদবি করিয়া বসিবে, এ কথা তাহার মাথায় ঢুকে নাই। সে বেচারা নেহাত ভয় পাইয়া ভাবিতে লাগিল-'এই রে, মাটি করেছে। আমাকে ট্যাঁপায় ধরেছে!'

কানাই ভাবিল, 'ঘোড়া যখন পেয়েছি, তখন আর তাড়াতাড়ি কিসের? ঘরে একটু ঘুমুই, তারপর শেষরাত্রে ঘোড়ায় চড়ে ছুট দেব।' এই ভাবিয়া বাঘকে তাহাকে বাড়ির পানে টানিয়া লইয়া চলিল। বাঘ বেচারা আর কি করে! মনে করিল, 'এখন ট্যাঁপার হাতে পড়েছি, এর কথা মতনই চলতে হবে।'

বাড়ি আসিয়া কানাই বাঘকে একটা ঘরে বন্ধ করিয়া দরজা আঁটিয়া দিল। তারপর বিছানায় শুইয়া ভাবিতে লাগিল, 'শেষ রাতেই উঠে পালাব।'

কানাইয়ের ঘুম ভাঙিতে ফরসা হইয়া গেল। তখন সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘোড়া আনিতে গিয়া দেখে-সর্বনাশ! বাঘ যে ঘরে বন্ধ আছে! বাহিরে আসিয়া তাহাকে খাইতে পারিবে না, সে কথা তখন তাহার মনেই হইল না। সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়া দরজার হুড়কা আঁটিয়া বসিয়া কাঁপিতে লাগিল।

এদিকে সকাল বেলা সকলে সাতমার পালোয়ানের বাড়িতে খবর লইতে আসিয়াছে, বাঘ মারা হইল কি না। তাহারা আসিয়া দেখিল যে, বাঘ ঘরে বাঁধা রহিয়াছে। তখন সকলে ছুটিয়া গিয়া রাজাকে বলিল, 'রাজামশাই, দেখুন এসে, সাতমার পালোয়ান বাঘকে ধরে এনে ঘরে বেঁধে রেখেছে!'

রাজামহাশয় আশ্চর্য হইয়া সাতমার পালোয়ানের বাড়ি চলিলেন। সেখানে গিয়া দেখেন যে সত্যই বাঘ ঘরে বাঁধা। ততক্ষণে কানাই ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া আসিয়া রাজামহাশয়কে সেলাম করিয়া দাঁড়াইয়াছে। রাজা বলিলেন, 'সাতমার, ওটাকে মার নি কেন?'

কানাই বলিল, 'মহারাজ, আমি এক ঝায় সাতটাকে মারি, ও যে শুধু একটা।'

এখন হইতে সাতমার পালোয়ানের নাম দেশ বিদেশে রাষ্ট্র হইয়া গেল। রাজামহাশয় যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া তাহার মাইনে পাঁচ শত টাকা করিয়া দিলেন। কানাইয়ের দিন খুব সুখেই কাটিতে লাগিল।

কিন্তু সুখের দিন কি চিরকাল তাকে? দেখিতে দেখিতে বানাইয়ের আর এক নূতন বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল।

for more books visit www.rasmai.com

এবারে বাঘ নয়, আর-একটা রাজা! সে অনেক হাজার সৈন্য লইয়া এই রাজার দেশ লুটিতে আসিয়াছে। এ রাজাটা নাকি বড়ই ভয়ানক লোক, তাহার সঙ্গে কিছুতেই আঁটা যায় না।

রাজামহাশয় বলিলেন, 'সাতমার, এখন উপায়? তুমি না বাঁচালে আমার আর রক্ষে নেই। তোমাকে আমার অর্ধেক রাজ্য দেব, যদি এবার বাঁচিয়ে দিতে পার।'

কানাই বলিল, 'রাজামশাই, কোনা চিন্তা করবেন না, এই আমি যাচ্ছি! আমাকে একটা ভাল ঘোড়া দিন।'

রাজার হুকুমে সরকারি আস্তাবলের সকলের চাইতে ভাল যুদ্ধের ঘোড়াটি আনিয়া কানাইকে দেওয়া হইল।

কানাই আজ দুই থান মার্কিন দিয়া পাগড়ি বাঁধিল। পোশাকটাও দস্তুর মতল করিল। মনে মনে কিন্তু তাহার মতলব এই যে, যুদ্ধে যাইবার ভান একবার ঘোড়ার পিঠে চড়িতে পারিলেই পলায়নের সুবিধা হয়।

কিন্তু হায়, সেটা যে যুদ্ধের ঘোড়া কানাই তাহা জানিত না। সে বেচারা যতই ঘোড়াটাকে অন্য দিকে লইয়া যাইতে চায়, ঘোড়া কিছুতে রাজি হয় না। যুদ্ধের বাজনা শুনিয়া ঘোড়া যখন নাচিতে লাগিল, কানাইয়ের তখন পিঠে টিকিয়া থাকা ভার হইল। শেষে ঘোড়া তাহার কোন কথা না শুনিয়া একেবারে যুদ্ধের জায়গায় গিয়া উপস্থিত। পথে কানাই লতাপাতা গাছপালা খড়ের গাদা যাহা কিছু পাইয়াছে, তাহাকেই আঁকড়িয়া ধুরিয়া ঘোড়া থামাইতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই সে ঘোড়া থামিল না। সেই গাছপালা আর খড়ের গাদা সব শুদ্ধই সে কানাইকে লইয়া ছুটিল।

এদিকে সেই বিদেশী রাজার সৈন্যরা শুনিতে পাইয়াছে যে এদেশে একটা সাতমার পালোয়ান আছে, সে এক ঘায় সাতটাকে মারে-বাঘকে ধরিয়া আনিয়া ঘরে বাঁধিয়া রাখে! এ কথা শুনিয়াই তাহারা বলাবলি করিতেছে 'ভাই' ওটা আসিলে আর যুদ্ধ-টুদ্ধ করা হইবে না। বাপরে, এক ঘায় সাতটাকে মারিবে।'

এমন সময় সাতমারের ঘোড়া সেই দুই থান মার্কিনের পাগড়ি আর সেই সব গাছপালা আর খড়ের গাদা সুদ্ধু সাতমারকে লইয়া আসিয়া দেখা দিল! দূর হইতে বোধ হইতে লাগিল, যেন একটা পাহাড়-পর্বত ছুটিয়া আসিতেছে। বিদেশী রাজার সৈন্যরা তাহা একবার দেখিয়া আর দুবার দেখিবার জন্য দাঁড়াইল না। একজন যেই চেঁচাইয়া বলিল, 'ঐ রে আসছে। এবারে গাছ পাথর ছুঁড়ে মারবে।' অমনি মুহূর্তের মধ্যে সেই হাজার হাজার সৈন্য চ্যাঁচাইয়া চ্যাঁচাইয়া কোথায় ছুটিয়া পালাইল তাহার ঠিকানা নাই।

কানাই দেখিল যে, বিদেশী সৈন্য সব পালাইয়াছে, খালি তাহাদের রাজাটা ছুটিতে পারে নাই বলিয়া ভ্যাবাচ্যাকা লাগিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কানাই মনে মনে ভাবিল, 'এ তা মন্দ নয়। পালাতে চেয়েছিলুম, মাঝখানে থেকে কেমন করে যুদ্ধ জিতে গেলুম! এখন রাজাটাকে বেঁধে নিলেই হয়! আর কি! এখন ত সাতমার পালোয়ানের জয়জয়কার! অর্ধেক রাজ্য পাইয়া এখন সে পরম সুখে বাস করিতে লাগিল।

কুঁজো আর ভূত

কানাই বলে একটি লোক ছিল, তার পিঠে তার পিঠে ছিল ভয়ঙ্কর একটা কুঁজ। বেচারা বড্ড ভালমানুষ ছিল, লোকের অসুখ-বিসুখে ওষুধপত্র দিয়ে তাদের কত উপকার করত। কিন্তু কুঁজো বলে তাকে কেউ ভালবাসত না।

কানাইয়ের ঝুড়ির দোকান লোক ছিল। আর কোনো ঝুড়িওয়ালা তার মত ঝুড়ি বুনতে পারত না। তারা তাকে ভারি হিংসা করত, আর তার নামে যা-তা বলে বেড়াত। তা শুনে লোকে ভাবত, কানাই বড় দুষ্টু লোক। তাকে দেখতে পেলে সকলে মুখ ফিরিয়ে থাকত। বেচারার দুঃখের সীমাই ছিল না।

এত বড় কুঁজ নিয়ে মাথা গুঁজে চলতে কানাইয়ের বড়ই কষ্ট হত। একদিন সে একটু দূরে এক জায়গায় ঝুড়ি বেচতে গেল, আর দিন থাকতে ঘরে ফিরতে পারল না। পথে একটা পুরনো বাড়ির কাছে এসে এমনি অন্ধকার হল, আর তার এতই কাহিল বোধ হল যে, আর চলা অসম্ভব। সে জায়গাটা ভারি বিশ্রী; লোকে প্রাণান্তেও সে পথে আসতে চায় না। বলে, ওটা ভূদের বাড়ি। কিন্তু কানাইয়ের বড্ডই পরিশ্রম হয়েছে, চলবার আর সাধ্য নেই। কাজেই সে সেখানে পথের পাশে একটু না বসে আর কি করি?

for more books visit www.rashal.com

কতৎষণ সে এভাবে বসে ছিল তার কিন্তু ঠিক নেই। বসে থাকতে থাকতে তার মনে হল, যেন সেই পুরনো বাড়িটার ভিতর থেকে আওয়াজ আসছে অনেকগুলো গলা মেলে। আহা, কি সুন্দর সুরেই গাইছে। শুনে কানাইয়ের প্রাণ জুড়িয়ে গেল। সে অবাক হয়ে খালি শুনতেই লাগল। গানের সুরটি অতি আশ্চর্য, কিন্তু কথা কালি এইটুকুঃ

'লুন হ্যায়,তেল হ্যায়, ইম্‌লী হ্যায়, হিং হ্যায়!'

শুনতে শুনতে কানাই একেবারে মেতে গেল। সে ভাবল যে তারও গানটা না গাইলেই চলছে না। কাজেই সেও খুব করে গলা ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে ধরলঃ

'লুন হ্যায়, তেল হ্যায়, ইম্‌লী হ্যায়, হিং হ্যায়!'

এইটুকুই গেয়েই ঝাঁ করে তার বুদ্ধি খুলে গেল, সে আরো উঁচু সুরে গাইল

'লসুন হ্যায়, মরীচ হ্যায়, চ্যাং ব্যাং শুঁটকি হ্যায়।'

কানাই এই কথাগুলো খুব গলা ছেড়েই গেয়েছিল। সে গলার আওয়াজ যে সেই বাড়ির ভিতরের গাইয়েদের কানে গিয়ে পৌঁছিয়েছিল, তাতে আর কোন ভুল নেই। সে গাইয়েগুলো ছিল অবশ্য ভূত। তারা সেই নূতন কথাগুলো শুনে এতই খুশি হল যে, তখনই ছুটে কানাইয়ের কাছে না এসে আর থাকতে পারল না। তারা এসে কানাইকে কোলে করে নাচতে নাচতে সেই বাড়ির ভিতরে বেয়ে গেল, আর যে আদরটা করল! মিঠাই যে তাকে কত খাওয়াল, তার অন্ত নেই। তারপর সকলে মেলে নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে গাইতে লাগলঃ

'লুন হ্যায়, তেল হ্যায়, ইম্‌লী হ্যায়, হিং হ্যায়!'
'লসুন হ্যায়, মরীচ হ্যায়, চ্যাং ব্যাং শুঁটকি হ্যায়।'

কানাইকেও তাদের সঙ্গে নেচে নেচে গানটি গাইতে হল। তখন তার মনে হল, 'কি আশ্চর্য, আমি কুঁজ নিয়ে চলতে পারি না, আমি আবার নাচলুম কি করে?' বলতে বলতেই তার হাতখানি পিঠের দিকে গেল-এ কি? তার সে কুঁজ যে আর নেই! একজন ভূত বলল, 'কি, দেখছিস বাপ? ওটা আর ওখানে নেই। ঐ দেখ, তোর পাশে পড়ে আছে।'

সত্যি সত্যে সে কুঁজ আর কানাইয়ের পিঠে ছিল না, তখন তার পাশে পড়ে ছিল। আহা! কানাইয়ের তখন কি অনন্দই হল। আর হালকা আর আরাম বোধ হল এমনি যে, সে তখনই সেইখানে মেঝেতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর যখন পরদিন সকালে তার ঘুম ভাঙল, তখন সে দেখল যে সেই বাড়ির বাইরে রাস্তার ধারে শুয়ে আছে। ভূতেরা তাকে একটি চমৎকার নূতন পোশাক পরিয়ে সেখানে এনে রেখে গিয়েছে। তখন সে তাড়াতাড়ি উঠে, মনের সুখে বাড়ি চলে এল। সেখানকার লোকেরা তার মুখের পানে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়, কেউ তাকে চিনতে পারে না। সে যে তাদের সেই কুঁজো কানাই, ভূতেরা তার কুঁজ ফেলে তার এমনি সুন্দর চেহারা করে দিয়েছে, এ কথা তাদের বোঝাতে তার অনেকক্ষণ লেগেছিল।

তারপর দেখতে দেখতে কানাইয়ের কুঁজের গল্প দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। যে শুনল, সেই ভাবল যে, এমন আশ্চর্য কথা আর কখনো শোনে নি। এখন আর লোকে তাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে থাকে না; তারা হাসতে হাসতে ছুটে এসে তার সঙ্গে কথা কয়, আর বাড়ির লোককে তার এই আশ্চর্য খবর শোনাবার জন্য তাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যায়। কত লোকে শুধু সেই গল্প শোনাবার জন্যই তার ঝুড়ি কিনতে আসে। ঝুড়ি বেচে সে বড়লোক হয়ে গেল।

এমনি করি দিন যাচ্ছে। তারপর একদিন কানাই তার ঘরের দাওয়ায় বসে ঝুড়ি বুনছে, এমন সময় একটি বুড়ি সেই পথে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাগো, কেবলহাটি যাব কোন পথে? কানাই বললে, 'এই ত কেবলহাটি। তুমি কি চাও?' বুড়ি বলল, 'তোমাদের গ্রামে নাকি কানাই বলে কে আছে, ভুতেরা তার কুঁজ সারিয়ে দিয়েছিল। তার মন্তরটা তার কাছ থেকে শিখে নিতে পারলে আমাদের মানিকের কুঁজটাও সারিয়ে নিতুম।'

for more books visit www.rasmi.com

কানাই বলল, 'আমি ত সেই কানাই ভূতেরা আমারই কুঁজ সারিয়ে দিয়েছিল। এর ত মন্তর-টন্তর কিছু নেই, তারা রাত জেগে গাইছিল, আমি পথের ধারে শুয়ে শুয়ে তাদের গানে নতুন কথা জুড়ে দিয়েছিলাম। তাইতে তারা খুশি হয়ে আমার কুঁজ সারিয়ে, নূতন পোশাক পরিয়ে দিয়েছিল।' বুড়ি তখন খুঁটে খুঁটে সব কানাইয়ের কাছ থেকে জেনে নিয়ে তাকে অনেক আশীর্বাদ করে সেখান থেকে চলে গেল।

সেই বুড়ির ছেলে যে মানিক, তার পিঠে ছিল কানাইয়ের কুঁজের চেয়েও ঢের বড় একটা কুঁজ। লোকটা এমনি দুষ্ট আর হিংসুটে ছিল যে পাড়ার লোকে তার জ্বালায় অস্থির থাকত। সেই মানিকের কুঁজ সারাবার জন্য তার বাড়ির লোকেরা একদিন রাত্রে তাকে গাড়ি করে এরে ভূতের বাড়ির কাছে রেখে গেল। সেখানে পড়ে পড়ে মানিক ভাবছে, ভূতেরা কখন গান ধরবে, আর তাতে সে কথা জুড়ে দেবে, আর তার কুঁজ সেরে গাবে। তারপর যেই ভূতেরা বলেছেঃ 'লুন হ্যায়, তেল হ্যায় , ইম্‌লী হ্যায়,' অমনি মানিক আর তাদের শেষ করতে না দিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'গুরুচরণ ময়রার দোকানের কাঁচা গোল্লা হ্যায়।'

তখন গানের তাল ভেঙে ত গেলই, কাঁচাগোল্লার নাম শুনে অনেক ভূতের বমি পর্যন্ত হতে লাগল। ভূতেরা এ সব জিনিসকে বড্ড ঘৃণা করে, এর নাম অবধি শুনতে পারে না। কাজেই তারা তাতে বেজায় চটে দাঁত খিঁচুতে খিচুতে এসে বললম 'কে রে তুই অসভ্য বেতালা বেটা, আমাদের গান মাটি করে দিলি? দাঁড়া তোকে দিখাচ্ছি!' এই বলে তারা কানাইয়ের সেই কুঁজটা এনে মানিকের কুঁজের উপর বসিয়ে এমনি করে জুড়ে দিল যে আর কিছুতেই তাকে তাকে তুলবার জো নেই।

পরদিন মানিকের বাড়ির লোকেরা এসে তাকে দেখে অবশ্য খুবই আশ্চর্য আর দুঃখিত হল। কিন্তু গ্রামের লোকেরা বলল, 'বেটা যেমন দুষ্টু, তেমনি সাজা হয়েছে।'

জাপানী দেবতা

জাপান দেশে 'কোজিকী' বলে একখানা পুরানো পুঁথি আছে। তাতে লেখা আছে যে, পৃথিবীটা যখন হয়েছিল সেটা তেলের মত পাতলা ছিল, আর ফেনার মত সমুদ্রে বেসে বেড়াত।

তখন নাকি মোটে তিনটি দেবতা ছিলেন। এই তিনটি মরে গেলে আর দুটি হলেন; তাঁরা মরে গেলে আর দুটি হলেন; তাঁরা মরে গেল আর দুটি- তাঁরা মরে গেরে আবার দশটি দেবতা হলেন।

এই দশটি দেবতার একজন ছিলেন 'ইজানাগী'; তাঁর স্ত্রী নাম ছিল 'ইজানামী'

অন্য দেবতারা এঁদের দুজনের হাতে একটা শূল দিয়ে বললেন, 'তোমরা এই তেলের মতন জিনিসটা থেকে পৃথিবী তয়ের করো।'

ইজানাগী আর ইজানামী বললেন, 'আচ্ছা।' বলে তাঁরা সেই শূল দিয়ে সমুদ্রটাকে ঘাঁটতে লাগলেন। তারপর যখন শূল তুললেন, তখন তার মুখ বেয়ে যে জল পড়েছিল, তাই থেকে একটা দ্বীপ হল, তার নাম 'ওনগরো'। এই ওনগরো দ্বীপে একটি সুন্দর বাড়ি তয়ের করে, তার ভিতরে ইজানাগী আর ইজানামী বাস করতে লাগলেন। সেইখান থেকেই তাঁরা জাপান দেশটাকে গড়েছিলেন। এই দেশকে আমরা বলি 'জাপান' কিন্তু সে দেশের লোকেরা বলে 'নেপ্পন' বা 'দাই-নিপ্পন'।

ইজানাগী আর ইজানামীর অনেক ছেলে মেয়ে। তার মধ্যে 'আগুন-দেবতা' একজন। এই দেবতার জন্মের সময় ইজানামী মরে গেলেন। তখন মনের দুঃখে ইজানাগী চোখের জল ফেলতে লাগলেন, আর সেই চোখের জল থেকে 'কান্না-পরীর' জন্ম হ'ল। কাঁদতে কাঁদতে শেষে ইজানাগীর রাগ হল। তখন তিনি তলোয়ার দিয়ে আগুন-দেবতার মাথা কেটে ফেললেন, তাতে সেই কাটা দেবতার শরীর আর রক্ত হতে ষোলটা দেবতা উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু ইজানাগীর মনের দুঃখ তাতেও ঘুচল না। শেষে তিনি ইজানামীকে খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে পাতালে উপস্থিত হলেন-সেই যেখানে মৃত্যুর পরে সকলকেই যেতে হয়। পাতালের ভিতর মস্ত পুরী আছে, সেই পুরীর দরজার গিয়ে ইজানামীর সঙ্গে তাঁর দেখা হল। ইজানামী তাঁকে বললেন, 'একটু দাঁড়াও। আমি জিজ্ঞাসা করে আসি, তারপর তোমার সঙ্গে যাব।' এই বলে ইজানামী ভিতরে গেলেন। ইজানাগী খানিক বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন, শেষে ইজানামীর দেরি দেখে তিনিও ভিতরে গেলেন। ভিতরে যেতেই এমনি ভয়ানক গন্ধ এসে তাঁর নাকে লাগল যে কি বলব। এমন ভয়ঙ্কর নোংরা জায়গায় কথা কেউ ভাবতেও পারে নাঃ আর সেখানে থেকে থেকে ইজানামীও এমন নোংরা হয়ে গিয়েছেন

for more books visit www.rashal.com

যে, তাঁর কাছে যাবার সাধ্য নাই। এ-সব দেখে ইজানাগী নাকে হাত দিয়ে সেখান থেকে ছুটে পালালেন। পেয়াদাগুলো তাঁকে পালাতে দেখে 'ধর্ ধর্' বলে তাড়া করেছিল, কিন্তু ধরতে পারে নি।

কি বিষম গন্ধই সে জায়গায় ছিল! দেশে ফিরেও ইজানাগীর গা থেকে সে গন্ধ গেল না। গন্ধে অস্থির হয়ে তিনি নদীতে স্নান করতে গেলেন। সেই সময়ে তাঁর কাপড় আর গা থেকে অনেকগুলি দেবতা বেরিয়েছিলেন।

এঁদের মধ্যে একটি মেয়ে ইজানাগীর বাম চোখ দিয়ে বেরিয়েছিলেন, সেটি এমন সুন্দর যে তেমন আর কেউ দেখে নি। সেই মেয়েটির নাম 'গগন আলো' তিনি সূর্যের দিবতা!

ইজানাগীর ডান চোখ দিয়ে আর-একটি দেবতা বেরিয়েছিলেন, সেটির নাম 'তেজবীর'।

তখন ইজানাগী তাঁর নিজের গলার হার গগন-আলোর গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, 'মা তুমি হলে স্বর্গের রানী।'

চন্দ্রপতিকে তিনি বললেন, 'তুমি হরে রাত্রির রাজা।' আর তেজবীরকে বললেন, 'তুমি হবে সমুদ্রের রাজা।' তখন গগন আলো গিয়ে স্বর্গের রানী হলেন, চন্দ্রপতি গিয়ে রাত্রির রাজা হলেন। কিন্তু তেজাবীর সেইখানে বসেই কাঁদতে লাগলেন। দিন নাই, রাত নাই, কেবলই গালে হাত দিয়ে কান্না। তাঁর দাড়ি লম্বা হয়ে ভুঁড়িতে গিয়ে ঠেকল, তবুও তাঁর কান্না থামল না।

ইজানাগী বলরেন, 'আরে তোর হল কি? রাজ্য দিলাম, রাজ্যে গেলি না, খালি যে কাঁদছিস?'

তেজবীর বললেন, 'আমি রাজ্য চাই না। আমি সেই পাতালে আমার মার কাছে যাব।'

ইজানাগী বললেন, 'তবে যা বেটা তুই এখান থেকে দূর হয়ে।' বলে তিনি তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন।'

যখন তেজবীর স্বর্গে গিয়ে গগন-আলোর কাছে উপস্থিত হলেন। গগন- আলো জানতেন, তাঁর মন ভাল নয়, কাজেই তিনি তাঁকে দেখে ভাবলেন, 'না জানি কেন এসেছে!'

তেজবীর কিন্তু বললেন, 'বাবা তাড়িয়ে দিয়েছেন, তাই মার কাছে চলেছি যাবার আগে তোমাকে দেখতে এলাম।'

গগন-আলো বললে, 'তাই যদি হয়, তবে তোমার তলোয়ারখানা দাও ত।'

তেজবীরের কাছ থেকে তলোয়ার নিয়ে গগন-আলো সেটাকে চিবিয়ে গুঁড়ো করে ফেললেন। সেই গুঁড়ো থেকে তিনটি দেবতা জন্মাল।

তখন তেজবীর বললেন, 'আচ্ছা, এখন তোমার গহনাগুলি দাও ত?' গহনা নিয়ে তিনি চিবিয়ে গুঁড়ো করে ফেললেন, আর সেই গুঁড়ো তেকে পাঁচটি দেবতা হল।

এখন, এই যে সব দেবতা হল, এরা কারা? গগন-আলো বললেন, 'তোমার তলোয়ার থেকে যারা হয়েছে, তারা তোমার, আর আমার গহনা থেকে যারা হয়েছে তারা আমার।'

কথাটা ত বেশ ভালোই হয়েছিল, কিন্তু হলে কি হয়, গগন-আলোর গহনা
থেকেই যে বেশি দেবতা হয়েছিল। কাজেই সে সে কথা তেজবীরের পছন্দ হল না। তাতে বিষম চটে গিয়ে গগন-আলোর ক্ষেত মাড়িয়ে, খাল বুজিয়ে, বাগান ভেঙে, বিষম দৌরাত্ম্য আরম্ভ করলেন।

পর্বতের গুহার ভিতরে নিজের ঘরে বসে সখীদের নিয়ে গগন-আলো কাপড় বুনছিলেন, সেই ঘরের ছাত ভেঙে তেজবীর ভিতরে ছাল-ছাড়ানো মরা ঘোড়া ফেলে দিলেন।

for more books visit www.rashal.com

কাজেই তখন আর গগন-আলো কি করেন, তিনি তেজবীরের ভয়ে গুহার দরজা বন্ধ করে দিলেন। এখন তিনিই হলেন সূর্যের দেবতা, আলোর মালিক। সেই আলোর মালিক হখন গুহায় লুকোতে গেলেন, তখন কাজেই জগৎ-সংসার অন্ধকার হয়ে গেল।

সকলে বলল, 'সর্বনাশ! এখন উপায়?' তখন তারা করল কি, তারা সবাই মিলে অনেক যুক্তি করে একখানা চমৎকার আরশি তয়ের করল, আর যার পর নাই সুন্দর একছড়া মণির মালা গড়াল, আরো কত কি জিনিস। তারা হেসে, গেয়ে, নেচে, লাফিয়ে চেঁচিয়ে, মোরগ ডাকিয়ে কি যে একটা শোরগোল জুড়ে দিলে, তা না শুনলে বোঝা যায় না।

শুহার ভিতর থেকে সেই গোলমাল শুনে গগন-আলো ভাবলেন, 'না জানি কি হয়েছে।' তিনি আস্তে আস্তে গুহার দরজা একটু ফাঁক করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আরে তোরা কিসের এত গোলমাল করছিস?'

তারা বলল, 'গোলমার করব না? দেখো এসে, তোমার চেয়ে কত সুন্দর একটি মেয়ে পেয়েছি।' বলেই সেই আরশিখানা এনে তাঁর সামনে ধরল।

সেই আরশির ভিতরে নিজের সুন্দর মুখখানি দেখে আর সূর্যের দেবতা লুকিয়ে থাকতে পারলেন না। তিনি তখনি ছুটে বেরিয়ে এলেন-আর অমনি সকালে গিয়ে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে হুড়কো এঁটে দিল।

তখন আবার সূর্য উঠল, আবার আলো হল, আবার সংসারে সুখ এল। তারপর সবাই মিলে সেই দুষ্ট তেজবীরকে দূর করে তাড়িয়ে দিল।

সেখান থেকে তাড়া খেয়ে, তেজবীর ঘুরতে হী নদীর ধারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে দুটি বুড়োবুড়ি একটি ছোট্ট মেয়েতে নিয়ে বসে কাঁদছিল, তাদের দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কাঁদছ কেন? কি হয়েছে?'

বুড়োটি বলল, 'বাবা, আমার দুঃখের কথা শুনে কি করবে? আমার আটটি মেয়ে ছিল, তার সাতটি অজগরে খেয়েছে, এই একটি আছে। সে বড় ভয়ঙ্কর অজগর, তার আটটি মাথা। বছরে একবার করে আসে, আর আমার একটি মেয়েকে খেয়ে যায়। আবার তার আসবার সময় হয়েছে, এবারে এটিকেও খাবে। তাই আমরা কাঁদছি।'

তেজবীর বললেন, 'এই কথা? আচ্ছ তোমাদের কোনো চিন্তা নাই। আমি যা বলছি, তাই করো। আট জালা খুব কড়া রকমের সাকী (জাপানী মদ) তয়ের করো ত। করে, ঐ জায়গায় রেখে দাও, তারপর দেখো কি হয়।'

বুড়ো সেইদিনই আট জালা সাকী তয়ের করে তেজবীরের কথামত সাজিয়ে রেখে দিল। সাকীর গন্ধে চারিদিকে ভুর ভুর করতে লাগল। ঠিক সেই সময় অজগর গড়াতে গড়াতে আর ফোঁস ফোঁস করতে করতে এসে উপস্থিত হয়েছে, আর সকলের আগে সেই সাকীর গন্ধ গিয়েছে তার নাকে। আর কি সে বেটা তার লোভ সামলাতে পারে? সে অমনি আট জালায় আট মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে সাকী খেতে লাগল। খেতে খেতে তার চোখ বুঁজে এল, মাথা ঢুলে পড়ল; তবু হুশ নাই, সে চোঁ চোঁ করে খাচ্ছে। শেষে ঘুমে অচেতন হয়ে একেবারে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। তা দেখে তেজবীর বললেন, আর কি? এই বেলা!' বলেই তিনি তাঁর তলোয়ার নেয়ে এসে সেটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললেন। তখন তেজবীর খুঁজে দেখলেন যে, সেই লেজের ভিতরে আশ্চর্য রকমের একখানা তলোয়ার রয়েছে। তিনি তখই সেই তলোয়ারখানা বার করে নিলেন।

তখন ত সকলেরই খুব সুখ হল। তারপর বুড়োর মেয়েকে বিয়ে করে, সেই দেশে সুন্দর বাড়ি তয়ের করে, দুজনে সুখে বাস করতে লাগলেন। আর সেই বাড়িতে যারপরনাই আদর যত্নে থেকে বুড়োবুড়িরও শেষকাল খুব আরামেই কাটল।

গগন-আলোর যে নাতি, তাঁর তিন ছেলে; দীপ্তানল, ক্ষিপ্তানল আর তৃপ্তানল।

দীপ্তানল মাছ ধরেন আর তৃপ্তানল শিকার করেন। একদিন তৃপ্তানল দীপ্তানলকে বললেন, 'দাদা, চলো না, তোমার কাজটি আমি করিম আর আমার কাজটা তুমি করো-দেখি কেমন হয়।' বলে, নিজের তীরধনুক দাদাকে দেয়ে, দাদার বঁড়শি আর ছিপ তিনি চেয়ে নিলেন। নিয়ে মাছ ত ধরলেন খুবই, লাভের মধ্যে বঁড়শিটা মাছে ছিড়ে নিয়ে গেল।

for more books visit www.rasinal.com

তারপর একদিন দীপ্তানর বললেন, 'ভাই, শখ কি মিটেছে? এখন কেন আমার বঁড়শি আর আমাকে ফিরিয়ে দাও না।' তাতে তৃপ্তানল ভারি লজ্জিত হয়ে বললেন, 'দাদা বঁড়শি ত মাছে নিয়ে গেছে। এখন কি করে দিই?' এ কথায় দীপ্তানর যার পর নাই রেগে বললেন, সে আমি জানি না। আমার বড়শি আমাকে এনে দাও।'

তখন তৃপ্তানল আর কি করেন, নিজের তলোয়রখানা ভেঙে টুকরো টুকরো করে তাই দিয়ে বঁড়শি বানিয়ে দাদাকে দিলেন। কিন্তু দাদার তাতে মন উঠল না। তিনি বললেন, 'ও আমি চাই না, আমার বঁড়শি নিয়েছে, তাই এনে আমাকে দাও।'

তৃপ্তানল হাজার বঁড়শি এনে দীপ্তানলকে দিতে গেলেন, তাতেও হল না। দৃপ্তানল আরো রেগে গিয়ে বললেন, 'আমার সেই বঁড়শিটি আমাকে এনে দিতে হবে।' তা শুনে তৃপ্তানল মাথা হেঁট করে চোখের জল ফেলতে সেখান থেকে চলে গেলেন। ভাবলেন, 'হায়! এখন আমি কি করি? সমুদ্রের মাছে বঁড়শি নিয়ে গেছে, তাকে আমি কোথায় খুঁজে পাব?'

এই কথা ভাবতে ভাবতে তিনি সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসে কাঁদছেন, এমন সময় সমুদ্রের দেবতা লবণেশ্বর সেইখানে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কি হয়েছে বাছা? তুমি কাঁদছ কেন? তৃপ্তানল বললেন, 'দাদার বঁড়শি নিয়ে মাছ ধরতে এসেছিলাম, সেটা মাছে নিয়ে গেছে। তাতে দাদা বড্ড রাগ করেছেন। আমি আরো কত কাঁটা তাঁকে দিতে গেলাম, তিনি নিলেন না, বললেন, আমার তাই করো।' বলে, তিনি তখনি একখানা নৌকা তয়ের করে তৃপ্তানলকে তাতে বসিয়ে দিলেন, আর দিয়ে গড়া একটা বাড়ি দেখতে পাবে, সেইকানে সমুদ্রর রাজা সিন্ধুপতি থাকেন। সেই বাড়ির পাশে বাগানের ভিতরে কুয়োর ধারে একটা গাছ আছে, তার আগায় উঠে তুমি বসে থাকবে। সে বাগানে রাজার মেয়ে বেড়াতে আসেম সে তোমাকে তোমার বঁড়শির কথা বলে দেবে।'

এ কথায় তৃপ্তানল সেই নৌকা বেয়ে, সেই রাজার বাড়িতে গিয়ে সেই গাছে উঠে বসে রইলেন। খানিক বাদে রাজার মেয়ের দাসীরা কলসী হাতে করে সেই কুয়ো থেকে জল নিতে এল। এসে তারা দেখল যে, গাছের উপরে কেমন সুন্দর একটি রাজপুত্র বসে আছে। তৃপ্তানল তাদের বললেন, 'হ্যাঁ গা, তোমরা দয়া করে আমাকে একটু জল খেতে দেবে? দাসীরা অমনি সোনার গেলাসে দেবার সময়ে নিজের গলা থেকে মণি খুলে তার ভিতর ফেলে দিলেন। দাসীরা তা দেখতে পায় নি, তারা সেই মণিসুদ্ধ গেলাস নিয়ে রাজার মেয়ের ঘরে রেখে দিয়েছে।

তারপর রাজার মেয়ে জল খাবার জন্য গেলাস খুঁজতে এসে বললেন-'এ কি? গেলাসের ভিতর মণে কোত্থেকে এল রে?' তা ত আমরা জানি না, কুয়োর ধারে একটি রাজপুত্র খেতে দিলাম। মণি হয়ত তারই হবে।'

রাজার মেয়ে তখনি ছুটে গিয়ে তাঁর বাবাকে সব কথা বললেন। রাজা সিন্ধুপতিও এ কথা শুনেই তাড়াতাড়ি সেই কুয়োর ধারে চলে এলেন। এসে গাছের উপরি তৃপ্তানলকে দেখেই তিনি যার পর নাই আশ্চর্য আর খুশি হয়ে বললেন, 'আরে, তোমার নাম না তৃপ্তানল? আমাদের স্বর্গের রানী গগন-আলোর নাতির ছেলে! তুমি কেন কুয়োর ধারে বসে থাকবে বাবা? এসো এসো, ঘরে এসো!' বলে, তাঁকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে রাজা তাঁকে সভায় নিয়ে এলেন। সভার লোক তাঁর নাম শুনেই ব্যস্ত হয়ে উঠে তাঁকে সেলাম করে জোড়হাতে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বাজা অনেক ধূমধাম করে তাঁর সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিলেন।

তারপর থেকে বেশ সুখেই দিন যায়। রাজা রোজই খবর নেন, তৃপ্তানল কেমন আছেন, রাজার মেয়ে বলেন, 'বেশ ভাল আছেন।' এমন করে তিন বৎসর চলে গেল। তারপর একদিন রাজা খবর নিতে এসে শুনলেন যে, তৃপ্তানল বিচানায় শুয়ে একটা খুব লম্বা নিশ্বাস ফেলেছিলেন।

অমনি রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবা, তুমি কেন নিশ্বাস ফেলেছিলে? তোমার কিসের দুঃখ?' তৃপ্তানল বলরেন, 'দাদার বঁড়শি নিয়ে মাছ ধরতে এসেছিলাম, সেই বঁড়শি মাছে নিয়ে গেছে। এতে দাদার বড্ড রাগ হয়েছে, আর বলেছেন যে, সেই বঁড়শি তাঁকে ফিরিয়ে না দিলে কিছুতেই হবে না।' শুনে রাজা বললেন, 'এই কথা? আচ্ছা-ডাক ত রে সকল মাছকে!' রাজার হুকুমে পৃথিবীর যত মাছ কতরে এসে তাঁর কাছে হাজির হল, আর রাজা তাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলো ত, তোমাদের কার গলায় সেই বঁড়শি আটকেছিল?' তারা সকলে বললেন 'তাই মাছের গলায় সেই বঁড়শি আটকেছিল। আজও তার খোঁচা লাগে।' তখন রাজামশায় তাকে বললেন, 'হাঁ কর, ব্যাটা, দেখি তোর গলাচ কি আছে!' এ কথায় তাই যেই 'অ-অ-অ-আ-ক!' করে দুহাত চওড়া হাঁ-টি করেছে, অমনি দেখা গেল যে ঠিক সেই বঁড়শিটি তার গলায় বিঁধে রয়েছে। অমনি চিমটা দিয়ে সেটাকে বার করে আনা হল। তখন ত আর তৃপ্তানলের আনন্দের সীমা রইল না। রাজামশাই তাঁর হতে সেই বঁড়শীটি দিয়ে আরো দুটি মাণিক তাঁকে দিলেন! তার একটির নাম জোয়ার-মাণিক; তাকে ছুঁড়ে মারলে সেই সমূদ্র ছুটে এসে শত্রুকে ডুবিয়ে দেয়। আর একটির নাম ভাটা-মাণিক; তাকে ছুঁড়ে মারলে সেই সমুদ্র ফিরে চলে যায়।

for more books visit www.rashal.com

তারপর কুমিরের রাজাকে ডেকে সিন্ধুপতি বললেন, 'তুমি তৃপ্তানলকে তার দেশে পৌঁছিয়ে দিয়ে এসো। দেখো যেন তার কোনো ক্ষতি না হয়।'

সেই পাহাড়ের মত কুমির তৃপ্তানলকে পিঠে করে তাঁর দেশে পৌঁছিয়ে দিয়ে এল। তারপর দীপ্তানলকে তাঁর বঁড়শি ফিরিয়ে দিতে আর বেশিক্ষণ লাগল না। কিন্তু দীপ্তানল কোথায় তাঁর বঁড়শি পেয়ে খুশি হবেন, না তিনি আরো রেগে তলোয়ার নিয়ে তৃপ্তানলকে কাটতে গেলেন। তখন তৃপ্তানল আর কি করেন, তাড়াতাড়ি সেই জোয়ার-মানিককে ছুড়ে মারলেন। মারতেই ত সমুদ্রের জল পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে এসে দীপ্তানলকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। তখন আর তিনি যাবেন কোথায়? ঢকঢক জল খেতে খেতে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, 'রক্ষে করো ভাই! আমার ঘাট হয়েছে, আমি- আর অমন করব না!' সে কথায় তৃপ্তানল ভাটা-মানিক ছুঁড়ে জল সরিয়ে তাঁকে বাঁচালেন। তারপর থেকে দীপ্তানল ভাল মানুষ হয়ে গেলেন, আর ছোট ভাইকেই রাজ্য ছেড়ে দিলেন।

তিনটি বর

এক দেশে এক কামার ছিল, তার মত অভাগা আর কোনো দেশে কখনো জন্মায় নি। তাকে এক জিনিস গড়তে দিলে তার জায়গায় আর-এক জিনিস গড়ে রাখত। একটা কিছু সারাতে দিলে তাকে ভেঙে আরো খোঁড়া করে দিত। আর লোককে ফাঁকি যে দিত, সে কি বলব! কাজেই কেউ তাকে কোনো কাজ করতে দিতে চাইত না, তার দুবেলা দুটি ভাতও জুটত না। লাভের মধ্যে সে তার গিন্নীর তাড়া খেয়ে সারা হত।

একদিন সে দোকানে বসে গালে হাত দিয়ে ভবছে। ভয়ানক শীত, গায়ে জড়াবার কিছু নেই। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে, ঘরে খাবার নেই। এমন সময় কোত্থেকে এক লম্বা সাদা দাড়িওয়ালা বুড়ো লাঠি ভর করে কাঁপতে কাঁপতে এসে তার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'জয় হোক বাবা, দুঃখী বুড়োকে কিছু খেতে দাও।'

কামার বলল, 'বাবা, খাবার যদি থাকত, তবে নিজেই দুটি খেয়ে বাঁচতুম। দুদিন পেটে কিছু পড়ি নি। ছেলেপুলে নিয়ে উপোস করছি- তোমাকে কোত্থেকে দেব? তুমি না হয় ঘরে এসে একটু গরম হয়ে যাও, আমি হাপর ঠেলে আগুনটা উসকিয়ে দিচ্ছি।'

বুড়ো তখন কাঁপতে কাঁপতে ঘরে এসে বলল, 'আহা, বাঁচালে বাবা। শীতে জমে গিয়েছিলুম। তুমি দেখছি তবে আমার চেয়েও দুঃখী। আমার নিজে খেতে পেলেই চলে, তোমার আবার স্ত্রী আর ছেলেপুলেও আছে।'

এই বলে বুড়ো আগুনের কাছে এসে বসল, কামার খুব করে হাপর ঠেলে আগুন উসকিয়ে তাকে গরম করে দিল। যাবার সময় বুড়ো তাকে বলল, 'তমি আমাকে খেতে দিতে পার নি, তবু তোমার যতদূর সাধ্য তুমি করেছ। এখন তোমার যেমন ইচ্ছা তিনটি বর চাও, আমি নিশ্চয় দেব।'

এ কথায় কামার অনেকক্ষণ বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে মাথা চুলকোতে লাগল, কিন্তু কি বর চাইতে হবে, বুঝতে পারল না। বুড়ো বলল, 'শিগগির বলো। আমার বড্ড তাড়াতাড়ি-ঢের কাজ আছে।'

তখন কামার থতমত খেয়ে বলল, 'আচ্ছা, তবে এই বর দিন যে, আমার এই হাতুড়িটি যে একবার হাতে করবে, সে আর আমার হুকুম ছাড়া সেটি রেখে দিতে পাবে না। আর যদি তা দিয়ে ঠুকতে আরম্ভ করে, তবে আমি থামতে না বললে আর থামতে পারবে না।'

বুড়ো বলল, 'আচ্ছা, তাই হবে। আর কি বর চাই?'

কামার বলল, 'আমার এই কেদারাখানিতে যে বসবে, সে আমর হুকুম ছাড়া তা থেকে উঠছে পারবে না।'

বুড়ো বলল, 'আচ্ছা, তাও হবে। আর কি?'

কামার বলল, 'আমার এই থলিটির ভিতরে আমি কোনো টাকা রাখলে আমি ছাড়া আর কেউ তাকে তা থেকে বার করতে পারবে না।'

for more books visit www.mrshal.com

সেই বুড়ো ছিলেন এক দেবতা। তিনি এই শেষ বরটিও সেই কামারকে দিয়ে ভয়ানক রেগে বললেন, 'অভাগা, তুই ইচ্ছা করলে এই তিন বরে পরিবার সুদ্ধ স্বর্গে চলে যেতে পারতিস, তার মধ্যে তোর এই দুর্মতি!'

এই বলে দেবতা চলে গেলেন, কামার আবার বসে বসে ভাবতে লাগল্ হঠাৎ তার মনে যে, তাই ত, এই তিন বরের জোরে ত আমি বেশ দু পয়সা রোজগার করে নিতে পারি।

তখন সে দেশময় এই কথা রটিয়ে দিল যে, 'আমার দোকানে এলে আমি বিনে পয়সায় কাজ করে দেব।' দেশের যত কিপটে পয়সাওয়ালা লোক, সে কথা শুনে তার দোকানে এসে উপস্থিত হতে লাগল। এক-একজন আসে, আর কামার তাকে দু হাতে লম্বা লম্বা সেলাম করে তার সেই কেদারাখানায় নিয়ে বসতে দেয়। বিনি পয়সায় কাজ করিয়ে চলে যাবার সময় আর সে বেচারা তা থেকে উঠতে পারে না, কামারও বেশ ভালমতে তার কাছ মেকে কিছু টাকা আদায় না করে তাকে উঠতে দেয় না। এমনি করে দিন কতক সে খুব টাকা পেতে লাগল। কাউকে এনে চেয়ারে বসায়, কারু হাতে তার হাতুড়িখানা তুলে দেয়, তারপর টাকা না দিলে আর তাকে ছাড়ে না।

যা হোক, ক্রমে সকলেই তার দুষ্টুমি টের পেয়ে গেল। তখন আর কেউ তার কাছে আসে না, কাজেই আবার তার দুর্দশার একশেষ হতে লাগল। এই সময় কামার একদিন বনের ভিতর বেড়াতে গিয়ে একটি সাদাসিধে গোছের বুড়োকে দেখতে পেল। বুড়োকে দেখে সে আগে ভাবল, বুঝি কোনো উকিল হবে। কিন্তু তখনই আবার কোনো উকিলের সেই বনের ভিতর আসা তার ভারি অসম্ভব মনে হল। তারপর সে আবার ভাল করে চেয়ে দেখল যে, সেই লোকটার পা দুখানিতে ঠিক ছাগলের পায়ের মত খুর আছে। তখন আর তার বুঝতে বাকি রইল না যে, সেই বুড়ো আর কেউ নয়, স্বয়ং শয়তান। শয়তানের পা ঠিক ছাগলের মত থাকে, এ কথা সেই কামার ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছিল।

আর কেউ হলে তখনই সেখান থেকে ছুটে পালাত। কিন্তু সেই কামার তেমন কিছু না করে জোড়হাতে শয়তানকে নমস্কার করে বলল, 'প্রণাম হই।'

শয়তান অমনি হাসতে হাসতে তার নাম ধরে বলল, 'কি হে, কেমন আছ?'

কামার বলল, 'আজ্ঞে। কেমন আর থাকব? দুবেলা দুটি ভাতও খেতে পাই নে।'

শয়তান বলল, 'বটে! তুমি এতই কস্ট পাচ্ছ? তুমি কেন আমার চাকরি করো না, আমি তোমাকে ঢের টাকা দেব।'

ঢের টাকার নাম শুনে কামার তখনই শয়তানের কথায় রাজি হল, যদিও সে জানত যে তা কাজে একবার ঢুকলে আর কেউ ছেড়ে আসতে পারে না। শয়তান তখন তাকে তিন থলি মোহর দিয়ে খুব আরামে খাও-দাও। সাত বছর পরে আমি তোমার কাছে আসব, তখন তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।' এই বলে শয়তান চলে গেল। কামারও হাসতে হাসতে টাকার থলি নিয়ে ঘরে ফিরল।

সেই তিন থলি মোহর নিয়ে কামার যার পর নাই খুশি হয়ে নাচতে নাচতে বাড়ি এল। ভাবল, এখন সাত বছর এই মোহর দিয়ে খুব ধুমধাম করে নেবে। সাত বছর পরে শয়তানের তাকে নিতে আসবার কথা, তখন তার সঙ্গে যেতেই হবে।

তারপর লোকে দেখল যে কামার কেমন করে রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেছে। এখন আর সে হাপরও ঠেলে না, লোহাও পেটে না। এখন তার গাড়ি ঘোড়া চাকর বাকরের অন্ত নেই। দিন যাচ্ছে আর তার বাবুগিরি ক্রমেই বেড়ে উঠছে। সে বাবুগিরিতে সাত বছর শেষ হবার ঢের আগেই শয়তানের দেওয়া সব টাকা ফুরিয়ে গেল, আর ঘরে একটি পয়সা নেই, নইলে খাবে কি?

তারপর একদিন সে তার দোকানে বসে একটা লোহা পিটছে আর ভবছে, কখন খদ্দের আসবে, এমন সময় একজন বুড়ো-হেন লোক ধীরে ধীরে এসে তার কাছে দাঁড়াল। কামার আগে ভাবল, 'এই রে, খদ্দের!' তারপর চেয়ে দেখল, 'ওমা! এ যে শয়তান!'

শয়তান বলল, মনে আছে ত? সাত বছর শেষ হয়েছে, এখন আমার সঙ্গে চলো।'

for more books visit www.rashal.com

কামার বলল, 'তুমি ছাড়বেই না যখন, তখন ত চলতেই হবে। কিন্তু আমার হাতের এই কাজটি শেষ করে যেতে পারলে আমার ছেলেগুলোর পক্ষে বড় ভাল হত-এর দরুন কিছু পয়সা পাওয়া যাবে। তুমি দাদা আমার এই উপকারটুকু করো না-আমি সকলের কাছে বিদায় হয়ে নিই, ততক্ষণ বসে এই হাতুড়িটা দিয়ে এই লোহাখানিকে পেটো।'

শয়তান কাজে এমন দুষ্টু হলেও কথাবার্তায় ভারি ভদ্রলোক, সে কামারের কথা শুনে তখনই তার হাত থেকে হাতুড়িটি নিয়ে লোহাটাকে পেটাতে লাগল। সে জানত না যে সেটা সেই দেবতার বর দেওয়া সর্বনেশে হাতুড়ি, তা দিয়ে একবার পিটতে আরম্ভ করলে আর কামারের হুকুম ছাড়া থামবার উপায় নেই। কামার তার হাতে সেই হাতুড়ি দিয়েই অমনি যে ঘর থেকে বেরুল, আর একমাসের ভিতরে সেই মুখেই হল না।

একমাস পরে কামার দোকানে ফিরে এসে দিখল যে, শয়তান তখনো ঠনাঠন ঠনাঠন করে বেদম হাতুড়ি পিটছে, আর তার দশা যে হয়েছে! খালি শয়তান বলে সে এতক্ষণ বেঁচে আছে,আর কেউ হলে মরেই যেত। কামারকে দেখে সে অনেক মিনতি করে বলল, 'ভাই, ঢের ত হয়েছে। আমাকে মেরে ফেলে তোমার লাভ কি? তার চেয়ে তোমাকে আরো তিন থলি মোহর দিচ্ছি, আরো সাত বছরের ছুটি দিচ্ছি, আমাকে ছেড়ে দাও।'

কামার ভাবল, মন্দ কি। আর তিন থলি মোহর দিয়ে সাত বছর সুখে কাটানো যাক। কাজেই সে শয়তানকে বলল, 'আচ্ছা তবে তাই হোক।'

তখন শয়তান কামারকে আবার তিন থলি মোহর দিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেল, কামারও সেই টাকা দিয়ে আবার ধুমধাম জুড়ে দিল। তারপর সে টাকা শেষ হতেও আর বেশি দেরি হল না, তখন আর হাতুড়ি পেটা ভিন্ন উপায় নেই। এমনি করে আবার সাত বছর কেটে গেল।

এবার শয়তান কামারকে নিতে এসে দেখে, তার বাড়িতে ভারি গোলমাল। কি কথা নিয়ে কামার তার গিন্নির উপর বিষম চটেছে, আর তাকে ধরে ভয়ানক মারছে। কামার গিন্নিও যেমন-তেমন মেয়ে নয়, পাড়ার সকলে তার জ্বালায় অস্থির থাকে। কামারকে সে ঝাঁটা দিয়ে কম নাকাল করছে না, কিন্তু কামারের হাতে কিনা হাতুড়ি, কাজেই জিত হচ্ছে তারই। শয়তান এসে এ সব দেখে কামারকে ভয়ানক দুই থাপ্পড় লাগিয়ে বলল, 'বেটা পাজি, স্ত্রীকে ধরে মারিস? চল্, আমার সঙ্গে চল্।'

শয়তান ভেবেছিল, এতে কামারের স্ত্রী খুব খুশি হয়ে তার সাহায্য করবে। কিন্তু কামারের স্ত্রী তার কিছু না করে, 'বটে রে হতভাগা, তোর এতবড় স্পর্ধা! আমার স্বামীর গায়ে হাত তুলছিস!' বলে, সেই ঝাঁটা দিয়ে শয়তানের নাকে মুখে এমনি সপাংসপ মারতে লাগল সে বেচাবার দমই ফেলা দায়। সে তাতে বেজায় থতমত খেয়ে একটা চেয়ারের উপর বসে পড়ল-সেই চেয়ার, যাতে একবার বসলে আর বিনা হুকুমে ওঠবার জো নেই।

কামার দেখল যে, শয়তান এবারে বেশ ভালমতেই ধরা পড়েছে, হাজার টানাটানিতেও উঠতে পারছে না। তখন সে তার চিমটেখানি আগুনে তাতিয়ে নিয়ে আচ্ছা করে তার নাকটা টিরে ধরল। তারপর তারা স্বামী- স্ত্রী দুজনে মিলে 'হেঁইয়ো' বলে সেই চিমটে ধরে টানতেই নাকটা রবারের মত লম্বা হতে লাগল। এক হাত, দু হাত, চার হাত, আট হাত-নাক যতই লম্বা হচ্ছে, শয়তান বেটা ততই ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছে। নাকটা যখন কুড়ি হাত লম্বা হল, তখন শয়তান আর থাকতে না পেরে নাকি সুরে বলল, 'দোহাই দাদা! আর টেনো না, মরে যাব।'

কামার বলল, 'আরো তিন থলি টাকা, আর সাত বছরের ছুটি-দেবে কিনা বলো।' শয়তান ব্যস্ত হয়ে বলল, 'এক্ষুনি এক্ষুনি, এই নাও।' বলতে বলতেই তিন থলি ঝকঝকে মোহর এসে কামারের কাছে হাজির হল। কামার সেগুলো সিন্দুকে তুলে শয়তানকে বলল, 'আচ্ছা, তবে যাও।' শয়তান ছাড়া পেয়েই সেখান থেকে এমনি ছুট দিল যে, ছুট যাকে বলে।

তখন কামার আর তার স্ত্রী মেঝেয় গড়াগড়ি দিয়ে যে হাসিটা হাসল! আর সাত বছরের জন্য তাদের কোনো ভাবনা রইল না। সাত বছর যখন শেষ হল, তখন কামারের টাকাও ফুরিয়ে গেল, তাকে আবার তার ব্যবসা ধরতে হল, ততদিনে শয়তানও আবার তাকে নেবার জন্য এসে উপস্থিত হল।

for more books visit www.rashal.com

সাত বছর পরে শয়তান আবার কামারকে নেবার জন্য উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু গতবারে সে নাকে যে চিমটি খেয়ে গিয়েছিল, তার কথা ভেবে আর সে সোজাসুজি কামারের সামনে এসে দাঁড়াতে ভরসা পাচ্ছে না, তাই এবারে সে এক ফন্দি এঁটে এসেছে।

শয়তান জানে যে, কেউ যদি তাকে নিজে থেকে আদর করে নিয়ে যায়, তা হলে আর সে কিছুতেই তার হাত ছাড়তে পারে না। তখন শয়তান করল কি, একটি ঝকঝকে মোহর হয়ে ঠিক কামারের দোকানের সামনে রাস্তায় গিয়ে পড়ে রইল। সে ভাবল যে, কামার খেতে পায় না, মোহরটি দেখলে সে পরম আদরে এসে তুলে নিয়ে যাবে। তারপর আর সে শয়তানকে ফাঁকি দিয়ে যাবে কোথায়?

যে কথা সেই কাজ। কামার সেই মোহরটিকে দেখতে পাওয়া মাত্রই ছুটে গিয়ে সেটিকে তুলে এনে তার থলেয় পুরল। তখন থলের ভিতর থেকে শয়তান হেসে তাকে বলল, 'কি বাপু, এখন কোথায় যাবে? নিজে ধরে আমাকে ঘরে এনেছ, তার মজাটা এখনই দেখতে পাবে!'

কামার বলল, 'কি রে বেটা? তুই নাকি! তোর বুঝি আর মরবার জায়গা জোটে নি, তাই আমার থলের ভিতরে এসেছিস? দাঁড়া, তোকে দেখাচ্ছি!'

এ কথায় শয়তান এমনি রেগে গেল যে, পারলে সে তখনই কামারকে মেরে শেষ করে। কিন্তু থলের বাইরে এলে তবে ত শেষ করবে! সে যে সেই বিষম থলে-তার ভিতর ঢুকলে আর বেরোবার হুকুম নেই! শয়তান বেচারার খালি ছটফটই সার হল, সে আর থলের ভিতর থেকে বেরুতে পারল না। ততক্ষণে কামার সেই থলেটি তার নেহাইয়ের উপর রেখে গিন্নীকে ডেকে দুজনে দুই প্রকাণ্ড হাতুড়ি নিয়ে, দমাদ্দম দমাদ্দম এনি পিটুনি জুড়ল যে পিটুনি যাকে বলে! পিটুনি খেয়ে শয়তান খানিক খুব চেঁচাল। তরপর যখন আর চেঁচানি আসে না, তখন গোঙাতে গোঙাতে বলল, 'ছেড়ে দাও দাদা, তোমার পায়ে পড়ি। এবার তোমাকে বিশাল বিশাল ছয় থলে ভরা মোহর দেব, আর-কখনো তোমার কাছে আসব না।'

এ কথায় কামারের গিন্নি বলল, 'ওগো, সে হলে নেহাত মন্দ হবে না। দাও হতভাগাকে ছেড়ে।' তখন কামার বলল, 'কই তোর মোহরের থলে?' বলতে বলতেই এমনি বড় বড় মোহরের থলে এসে হাজির হল যে তারা দুজনে মিলেও তার একটাকে তুলতে পারল না। তখন কামার একগাল হেসে, তার থলের মুখ খুলে দিয়ে বলল, 'যা বেটা। ফের তোর পোড়া মুখ এখানে দেখাতে আসবি ত টের পাবি।' ততক্ষণে শয়তান থলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এমনি ব্যস্ত হয়ে ছুট দিল যে, কামারের সব-কথা শুনতেও পেলনা।'

সেই ছটা থলের ভিতর এতই মোহর ছিল যে, কামার হাজার ধুমধাম করেও তা শেষ করতে পারল না। চার থলে ভাল করে ফুরুতেই সে বুড়ো হয়ে শেষে একদিন মরে গেল। মরে গিয়ে ভূত হয়ে সে ভাবল যে, এখন ত হয় স্বর্গে না হয় নরকে দুটোর একটায় যেতে হবে। আগে স্বর্গের দিকে গিয়েই দেখি-না, যদি কোনোমতে সেখানে ঢুকতে পারি।

স্বর্গের ফটকের সামনে গিয়ে তার সেই দেবতাটির সঙ্গে দেখা হল, যিনি তাকে সেই বর দিয়েছিলেন। তাঁকে দেখে কামার ভারি খুশি হয়ে ভাবল, 'এই ঠাকুরটি না আমাকে সেই চমৎকার বরগুলো দিয়েছিলেন? ইনি অবশ্য আমাকে ঢুকতেও দেবেন।'

কিন্তু দেবতা তাকে দেখেই যার পর নাই রেগো বললেন, 'এখানে এসেছিস কি করতে? পালা হতাভাগা, শিগগির পালা!'

কাজেই তখন বেচারা আর কি করে? সে সেখান থেকে ফিরে নরকের দিকে চলল। সেখানকার ফটকের সামনে উপস্থিত হলে শয়তানের দারোয়ানেরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম?'

কামার তার নাম বলতেই পাঁচ-ছয়টা দারোয়ান ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে শয়তানকে বলল, 'মহারাজ! সেই কামার এসেছে!' তা শুনে শয়তান বিষম চমকে গিয়ে একটা লাফ যে দিল! তারপর পাগলের মত ফটকের কাছে ছুটে এসে দারোয়ানদের বলল, 'শিগগির দরজা বন্ধ কর! আঁট্ হুড়কো! লাগা তালা! খবরদার! ও বেটাকে ঢুকতে দিবি না! ও এলে আর কি আমাদের রক্ষা থাকবে!'

শয়তানের গলা শুনে কামার গরাদের ভিতর দিয়ে উঁকি মেরে হাসতে হাসতে বলল, 'কি দাদা! কি খবর?' সে কথা শেষ না হতেই শয়তান এক লাফে এসে অমনি তার নাক মলে দিল যে কি বলব! কামার তখনই সেখান থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে পালাল, কিন্তু তার আগেই তার নাকে আগুন ধরে গিয়েছিল। সে আগুন আজও নেবেনি। কামার তার জ্বালায় অস্থির হয়ে জলায় জলায় নাক ডুবিয়ে বেড়ায়। সে আগুন দেখতে পেলে লোকে বলে, 'ঐ আলেয়া।'

for more books visit www.rashal.com

গুপি গাইন ও বাঘা বাইন

তোমরা গান গাইতে পার? আমি একজন লোকের কথা বলব, সে একটা গান গাইতে পারত। তার নাম ছিল গুপি কাইন, তার বাবার নাম ছিল কানু কাইন। তার একটা মুদীর দোকান ছিল। গুপি কিনা একটা গান গাইতে পারত, আর সে গ্রামের আর কেউ কিছু গাইতে পারত না, তাই তারা তাকে খাতির ক'রে বলত, গুপি 'গাইন'।

গুপি যদিও একটা বই গান জানত না, কিন্তু সেই একটা গান সে খুব ক'রেই গাইত। সেটা না গেয়ে সে তিলেকও থাকতে পারত না, তার দম আটকে আসত। যখন সে ঘরে বসে গাইত, তখন তার বাবার দোকানের খদ্দের সব ছুটে পালাত। যখন সে মাঠে গিয়ে গান গাইত, তখন মাঠের যত গরু সব দড়ি ছিঁড়ে ভাগত। শেষে আর তার ভয়ে তার বাবার দোকানে খদ্দেরই আসে না, রাখালেরাও মাঠে গরু নিয়ে যেতে পারে না। তখন একদিন কানু কাইন তাকে এই বড় বাঁশ নিয়ে তাড়া করতে সে ছুটে মাঠে চ'লে গেল। সেখানে রাখালের দল লাঠি নিয়ে আসতে বনের ভিতর গিয়ে খুব ক'রে গলা ভাঁজতে লাগল।

গুপিদের গ্রামের কাছেই আরেকটা গ্রামে একজন লোক থাকত, তার নাম ছিল পাঁচু পাইন। পাঁচুর ছেলেটির বড্ড ঢোলক বাজাবার শখ ছিল। বাজাতে বাজাতে সে বিষম চুলতে থাকত, আর পা নাড়ত আর চোখ পাকাত, আর দাঁত খিঁচোত, আর ভ্রুকুটি করত। তার গ্রামের লোকেরা তা দেখে হাঁ ক'রে থাকত আর বলত, 'আহা! আ-আ-আ!! অ-অ-অ-হ-হ- হ!!!' শেষে যখন 'হাঃ, হাঃ, হা-হা!' বলে বাঘের মত খেঁকিয়ে উঠত, তখন সকলে পালাবার ফাঁক না পেয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে যেত। তাই থেকে সকলে তাকে বলত 'বাঘা বাইন।' তার এই বাঘা নামই রটে গিয়েছিল। আসল নাম যে তার কি, তা কেউ জানত না।

বাঘা ঢোলক বাজাত আর রোজ একটা ক'রে ঢোলক ভাঙত। শেষে আর পাঁচু তার ঢোলকের পয়সা দিয়ে উঠতে পারে না! কিন্তু বাঘার বাজনা বন্ধ হবে, তাও কি হয়? গ্রামের লোকেরা পাঁচুকে বলল, 'তুমি না পার, না হয় আমরাই সকলে চাঁদা করে ঢোলকের পয়সাটা দি। আমাদের গ্রামে এমন একটা ওস্তাদ হয়েছে, তার বাজনাটা বন্ধ হয়ে যাবে!' শেষে ঠিক হল যে গ্রামের সকলে চাঁদা করে বাঘাকে ঢোলক কিনে দেবে, আর সেই ঢোলকটি আর তার ছাউনি খুব মজবুত হবে, যাতে বাঘার হাতেও সেটা আর সহজে না ছেঁড়ে।

সে যা ঢোলক হল! তার মুখ হল সাড়ে-তিন হাত চওড়া, আর ছাউনি মোষের চামড়ার। বাঘা সেটা পেয়ে যার পর নাই খুশি হয়ে বলল, 'আমি দাঁড়িয়ে বাজাব।'

তখন থেকে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই ঢোলক লাঠি দিয়ে বাজায়। দেড় মাস দিনরাত বাজিয়েও বাঘা সেটাকে ছিঁড়তে পারল না। ততদিনে তার বাজনা শুনে শুনে তার বাপ মা পাগল হয়ে গেল, গ্রামের লোকের মাথা ঘুরতে লাগল। আর দিনকতক এইভাবে চললে কি হত বলা যায় না। এর মধ্যে একদিন গ্রামের সকলে মিলে মোটা মোটা লাঠি নিয়ে এসে বাঘাকে বললে, 'লক্ষ্মী, দাদা! তোমাকে দশ হাঁড়ি মিঠাই দিচ্ছি, অন্য কোথাও চলে যাও, নইলে আমরা সবাই পাগল হয়ে যাব!'

বাঘা আর কি করে? কাজেই তখন তাকে অন্য একটা গ্রামে যেতে হল। সেখানে দুদিন না থাকতে সেখানকার সকলে মিলে তাকে গ্রাম থেকে বার করে দিল। তারপর থেকে সে যেখানেই যায়, সেখান থেকেই তাকে তাড়িয়ে দেয়। তখন সে করল কি, সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায়, ক্ষুধার সময় তার নিজের গ্রামে গিয়ে ঢোলক বাজাতে থাকে, আর গ্রামের লোক তাড়াতাড়ি তাকে কিছু খাবার দিয়ে বিদায় করে বলে, 'বাঁচলাম!'

তারপর এমন হল যে আর কেউ তাকে খেতে দেয় না। আর তার ঢোলকের আওয়াজ শুনলেই আশপাশের সকল গ্রামের লোক লাঠি নিয়ে আসে। তখন বেচারা ভাবল, 'আর না! মূর্খদের কাছে থাকার চেয়ে বনে চলে যাওয়াই ভাল। না হয় বাঘে খাবে, তবু আমার বাজনা চলবে!' এই বলে বাঘা তার ঢোলকটিকে ঘাড়ে ক'রে বনে চ'লে গেল।

এখন বাঘার বেশ মজাই হয়েছে। এখন আর কেউ তার বাজনা শুনে লাঠি নিয়ে আসে না। বাঘে খাবে দূরে থাক, সে বনে বাঘ-ভালুক কিছু নেই। আছে খালি একটা ভয়ানক জানোয়ার। বাঘা আজও তাকে দেখতে পায় নি, শুধু দূর থেকে তারি ডাক শুনে ভয়ে থরথরিয়ে কাঁপে আর ভাবে, 'বাবা গো। ওটা এলেই ত ঢোলক-সুদ্ধ আমাকে গিলে খাবে!'

for more books visit www.rashal.com

সে ভয়ানক জানোয়ার কিন্তু কেউ নয়, সে গুপি গাইন। বাঘা যে হাক শুনে কাঁপে, সে গুপির গলা ভাঁজা। গুপিও বাঘার বাজনা শুনতে পায়, আর বাঘারই মত ভয়ে কাঁপে। শেষে একটু ভাবল, 'এ বনে থাকলে কখন প্রানটা যাবে, তার চেয়ে এই বেলা এখান থেকে পালাই।' এই ভেবে গুপি চুপিচুপি বন থেকে বেরিয়ে পড়ল। বেরিয়েই দেখে, আর-একটি লোকও এক বিশাল ঢোল মাথায় ক'রে সেই বনের ভিতর থেকে আসছে। তাকে দেখেই ভারি আশ্চর্য হয়ে গুপি জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে হে?'

বাঘা বললে, 'আমি বাঘা বাইন; তুমি কে?'

গুপি বললে, 'আমি গুপি গাইন; তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

বাঘা বললে, 'যেখানে জায়গা জোটে, সেইখানেই যাচ্ছি। গ্রামের লোকগুলো গাধা, গানবাজনা বোঝে না, তাই ঢোলটি নিয়ে বনে চলে এসেছিলাম। তা ভাই, এখানে যে ভয়ঙ্কর জানোয়ারের ডাক শুনেছি, তার সামনে পড়লে আর প্রাণটি থাকবে না। তাই পালিয়ে যাচ্ছি।'

গুপি বললে, 'তাই ত! আমিও যে একটা জানোয়ারের ডাক শুনেই পালিয়ে যাচ্ছিলাম। বলো ত, তুমি জানোয়ারটাকে কোথায় বসে ডাকতে শুনেছিলে?'

বাঘা বললে, 'বনের পূর্বধারে, বটগাছের তলায়।'

গুপি বললে, 'আচ্ছা, সে যে আমারই গান শুনেছ। সে কেন জানোয়ারের ডাক হবে? সেই জানোয়ারটা ডাকে বনের পশ্চিম ধারে, হরতুকীতলায় ব'সে।'

বাঘা বললে, 'সে ত আমার ঢোলকের আওয়াজ, আমি যে ঐখানে থাকতাম।'

এতক্ষণে তারা বুঝতে পারল যে, তারা তাদের নিজেদের গান আর বাজনা শুনেই ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। তখন যে দুজনার কি হাসি! অনেক হেসে তারপর গুপি বললে, 'ভাই, আমি যেমন গাইন, তুমি তেমনি বাইন! আমরা দুজনে জুটলে নিশ্চয় একটা কিছু করতে পারি।'

এ কথায় বাঘারও খুবই মত হল। কাজেই তারা খানিক কথাবার্তার পর ঠিক করল যে, তারা দুজনায় মিলে রাজামশাইকে গান শোনাতে যাবে। রাজা মশাই যে তাতে খুব খুশি হবেন, তাতে ত আর ভুলই নেই। চাই কি অর্ধেক রাজ্য বা মেয়ের সঙ্গে বিয়েও দিয়ে ফেলতে পারেন।

গুপির আর বাঘার মনে এখন খুবই আনন্দ, তারা রাজাকে গান শোনাতে যাবে। দুজনে হাসতে হাসতে আর নাচতে নাচতে এক প্রকাণ্ড নদীর ধারে এসে উপস্থিত হল। সেই নদী পার হয়ে রাজবাড়ি যেতে হয়।

নদীতে খেয়া আছে, কিন্তু নেয়ে পয়সা চায়। বেচারারা বন থেকে এসেছে, পয়সা কোথায় পাবে! তারা বলল 'ভাই, আমাদের কাছে ত পয়সা-পয়সা' নেই, আমরা না হয় তোমাদের গেয়ে বাজিয়ে শোনাব, আমাদের পার করে দাও।' তাতে খেয়ার চড়নদারেরা খুব খুশি হয়ে নেয়েকে বলল, 'আমরা চাঁদা ক'রে এদের পয়সা দেব, তুমি এদের তুলে নাও।'

বাঘার ঢোলটি দেখেই নেয়েরও বাজনা শুনতে ভারি সাধ হয়েছিল, কাজেই সে এক কথায় আর কোনো আপত্তি করল না। গুপিকে আর বাঘাকে তুলে নিয়ে নৌকো ছেড়ে দেওয়া হল। নৌকো-ভরা লোক, ব'সে বাজাবার জায়গা কোথায় হবে? অনেক কষ্টে সকলের মাঝখানে খানিকটা জায়গা হতে হতে নৌকোও নদীর মাঝখানে এসে পড়ল। তারপর খানিকটা একটু গুনগুনিয়ে গুপি গান ধরল, বাঘা তার ঢোলকে লাঠি লাগাল, আর অমনি নৌকোসুদ্ধ সকল লোক বিষম চমকে গিয়ে গড়াগড়ি আর জড়াজড়ি করে দিল নৌকোখানাকে উলটে।

তখন ত আর বিপদের অন্ত নেই। ভাগ্যিস বাঘার ঢোলকটি এত বড় ছিল, তাই আঁকড়ে ধরে দুজনার প্রাণরক্ষা হল। কিন্তু তাদের আর রাজবাড়ি যাওয়া ঘটল না। তারা সারাদিন সেই নদীর স্রোতে ভেসে শেষে সন্ধ্যাবেলায় এক ভীষণ বনের ভিতর গিয়ে কূলে ঠেকল। সে বনে দিনের বেলায় গেলেই ভয়ে বয়ে প্রাণ উড়ে যায়, রাত্রির ত আর কথাই নেই। তখন বাঘা বলল, 'গুপিদা, বড়ই ত বিষম দিখছি!

for more books visit www.rashal.com

এখন কি করি বলত।' গুপি বলল, 'করব আর কি?' আমি গাইব, তুমি বাজাবে। নিতান্তই যখন বাঘে খাবে, তখন আমাদের বিদ্যোটা তাকে না দেখিয়ে ছাড়ি কেন?

বাঘা বলল, 'ঠিক বলেছ দাদা। মরতে হয় ত ওস্তাদলোকের মতন মরি, পাড়াগেঁয়ে ভূতের মত মরতে রাজি নই!'

এই ব'লে দুজনায় সেই ভিজা কাপড়েই প্রাণ খুলে গান বাজানা শুরু করল। বাঘার ঢোলটি সেদিন কিনা ভিজা ছিল, তাইতে তার আওয়াজটি হয়েছিল যার পর নাই গম্ভীর। আর গুপিও ভাবছিল, এই তার শেষ গান, কাজেই তার গলার আওয়াজটিও খুবই গম্ভীর হয়েছিল। সে গান যে কি জমাট হয়েছিল, সে আর কি বলব? এক ঘন্টা দু ঘন্টা ক'রে দুপুর রাত হয়ে গেল, তবু তাদের সে গান থামছেই না।

এমন সময় তাদের দুজনারই মনে হল, যেন চারিদিকে একটা কি কাণ্ড হচ্ছে। ঝাপসা ঝাপসা কালো কালো, এই বড় বড় কি যেন সব গাছের উপর থেকে উঁকি মারতে লেগেছে। তাদের চোখগুলো জ্বলছে যেন আগুনের ভাঁটা, দাঁতগুলো বেরুচ্ছে যেন মুলোর সার। তা দেখে তখনই আপনা হতে বাঘার বাজানা থেমে গেল, তার সঙ্গে সঙ্গে দুজনার হাত-পা গুটিয়ে, পিট বেঁকে, ঘাড় বসে, চোখ বেরিয়ে মুখ হাঁ করে এল। তাদের গায়ে এমনি কাঁপুনি আর দাঁতে এমনি ঠকঠকি ধ'রে গেল যে, আর তাদের ছুটে পালাবারও জো রইল না।

ভূতগুলি কিন্তু তাদের কিছু করল না। তারা তাদের গান বাজনা শুনে ভারি খুশি হয়ে এসেছে, তাদের রাজার ছেলের বিয়েতে গুপির আর বাঘার বায়না করতে। গান থামতে দেখে তারা নাকিসুরে বলল, 'থামলি কেন বাপ? বাজা, বাজা, বাজা!'

এ কথায় গুপির আর বাঘার একটু সাহস হল। তারা ভাবল, 'এ ত মন্দ মজা নয়, তবে একটু গেয়েই দেখি না।' এই ব'লে যেই তারা আবার গান ধরেছে, অমনি ভূতেরা একজন দুজন ক'রে গাছ থেকে নেমে এসে তাদের ঘিরে নাচতে লাগল।

সে যে কি কাণ্ডকারখানা হয়েছিল, সে কি না দেখলে বোঝবার জো আছে! গুপি আর বাঘা তাদের জীবনে আর কখনো এমন সমজদারে দেখা পায় নি। সে রাত এমনি ভাবেই কেটে গেল ভোর হলে ত আর ভূতেদের বাইরে থাকবার জো নেই, কাজেই তার একটু আগেই তারা বলল, 'চল্ বাবা মোদের গোদার বেটার বে'তে! তোদের খুশি ক'রে দিব।'

গুপি বলল, 'আমরা যে রাজাবাড়ি যাব! ভূতেরা বলল, 'সে যাবি এখন, আগে মোদের বাড়ি একটু গানবাজনা শুনিয়ে যা! তোদের খুশি করে দিব!' কাজেই তখন তারা দুজনে ঢোল নিয়ে ভূতেদের বাড়ি চলল। সেখান গান-বাজনা যা হল, সে আর বলে কাজ নেই। তারপর তাদের বিদায় করবার সময় ভূতেরা বলল, 'তোরা কি চাস্?

গুপি বলল, 'আমরা এই চাই যে, আমরা যেন গেয়ে বাজিয়ে সকলকে খুশি করতে পারি।' ভূতেরা বলল, 'তাই হবে, তোদের গানবাজনা শুনলে আর সে গান শেষ হওয়ার আগে কেউ সেখান থেকে উঠে যেতে পারবে না। আর কি চাস্?

গুপি বলল, 'আমরা এই চাই যে আমাদের যেন খাওয়া-পরার কষ্ট না হয়।' এ কথায় ভূতেরা তাদের একটি থলে দিয়ে বলল, 'তোরা যখন যা খেতে বা পরতে চাস, এই থলের ভিতরে হাত দিলেই তা পাবি। আর কি চাস্?'

গুপি বলল, 'আর কি চাইব, তা ত বুঝতে পারছি না!' তখন ভূতেরা হাসতে হাসতে তাদের দুজনকে দুজোড়া জুতো এনে দিয়ে বলল, 'এই জুতো পায়ে দিয়ে তোরা যেখানে যেতে চাইবি, অমনি সেখানে গিয়ে হাজির হবি।'

তখন ত আর কোনো ভাবনাই রইলো না। গুপি আর বাঘা ভূতদের কাছে বিদায় হয়ে সেই জুতো পায়ে দিয়েই বলল, 'তবে আমরা এখন রাজবাড়ি যাব।' অমনে সেই ভীষণ বন কোথায় যেন মিলিয়ে গেল গুপি আর বাঘা দেখল, তারা দুজনে একটা প্রকাণ্ড বাড়ির ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এত বড় আর সুন্দর বাড়ি তারা তাদের জীবনে কখনো দেখে নি। তারা তখনই বুঝতে পারল যে, এ রাজবাড়ি।

কিন্তু এর মধ্যে ভারি একটা মুশকিল হল্ রাজাবাড়ির ফটকে যমদূতের মত কতকগুলো দারোয়ান দাঁড়িয়ে ছিল, তারা গুপি আর বাঘাকে সেই ঢোল নিয়ে আসতে দেখেই দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'এইয়ো! কাঁহা যাতা হ্যায়?' গুপি থতমত খেয়ে বলল, 'বাবা, আমরা রাজামশাইকে গান

for more books visit www.rashal.com

শোনাতে এসেছি।' তাতে দারোয়ানগুলো আরো বিষম চটে গিয়ে লাঠি দেখিয়ে বলল, 'ভাগো হিঁয়াসে।' গুপিও তখন নাক সিঁটকিয়ে বলল, 'ঈস্! আমরা ত রাজার কাছে যাবই।' বলতেই অমনি সেই জুতোর গুণে, তারা তৎক্ষণাৎ গিয়ে রাজামশায়ের সামনে উপস্থিত হল।

রাজবাড়ির অন্দর মহলে রাজামহাশয় ঘুমিয়ে আছেন, রানী তাঁর মাথার কাছে বসে তাঁকে হাওয়া করছেন, এমন সময় কথা নেই বার্তা নেই, গুপি আর বাঘা সেই সর্বনেশে ঢোল নিয়ে হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হল। জুতোর এমনি গুণ, দরজা জানালা সব ব রয়েছে, তাতে তাদের একটুও আটকায় নি। কিন্তু আসবার বেলা আটকাক, আর নাই আটকাক, আসবার পরে খুবই আটকাল। রানী তাদের দেখে বিষম ভয় পেয়ে, এক চিৎকার দিয়ে তখনই অজ্ঞান হয়ে গেলেন। রাজামশাই লাফিয়ে উঠে পাগলের মত ছুটাছুটি করতে লাগলেন। রাজবাড়িময় হুলস্থুল পড়ে গেল। সিপাই সান্ত্রী সব খাঁড়া ঢাল নিয়ে ছুটে এল।

বেগতিক দেকে গুপি আর বাঘার মাথায় গোল লেগে গেল। তারা যদি তখন শুধু বলে, 'আমরা এখান থেকে অমুক জায়গায় চলে যাব, 'তবেই তাদের জুতোর গুণে সকল ল্যাঠা চুকে যায় কিন্তু সে কথা তাদের মনেই হল না। তারা গেল ছুটে পালাতে, আর দু-পা যেতে না যেতে না যেতেই বেচারারা যে মারটা খেল! জুতো, লাঠি, চাবুক, কিল, চড়, কানমলা- কিছুই তাদের বাকি রইল না। শেষে রাজামশাই হুকুম দিলেন, 'বেটাদের নিয়ে তিন দিন হাজতে ফেলে রাখো। তারপর বিচার করে, হয় এদের মাথা কাটব, না হয় কুত্তা দিয়ে খাওয়াব।'

হায় গুপি! হায় বাঘা! বেচারারা এসেছিল রাজাকে গান শুনিয়ে কতই বকশিশ পাবে ভেবে, তার মধ্যে একি বিপদ? পেয়াদারা বেঁধে মারতে মারতে একটা অন্ধকার ঘরে নিয়ে ফেলে রাখল। সেখানে পড়ে বেচারারা একদিন আর গায়ের ব্যাথায় নড়তে চড়তে পারল না। তাতে তেমন দুঃখ ছিল না, কিন্তু বাঘার ঢোলটি যে গেল, সেই হল সর্বনাশের কথা! বাঘা বুক মাথা চাপড়িয়ে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদছে, কাঁদছে আর বলছে, 'ও গুপিদা।-ওঃ-ওঃ-হ-হ-হ-অ-অ! আরে ও গুপিদা! মার খেলাম, প্রাণ যাবে, তাতে দুঃখ নেই কিন্তু দাদা, আমার ঢোলকটি যে গেল!'

গুপির কিন্তু ততক্ষণে মাথা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সে বাঘার গায় মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'ভয় কা দাদা? ঢোল গিয়েছে, জুতো আর খলে তো আছে। আমরা নিতান্ত বেকুব, তাই এতগুলো মার খেলাম।' যা হোক, যা হবার হয়ে গিয়েছে, এখন এর ভিতর থেকে একটা মজা ক'রে নিতে হবে।' বাঘা এ কথায় একটু শান্ত হয়ে বলল, কি মজা হবে দাদা?' গুপি বলল, আগে ত খাবার মজাটা ক'রে নিই, তারপর অন্য মজার কথা ভেবে দেখব এখন।

এই ব'লে সেই ভূতের দেওয়া থলির ভিতরে হাত দিয়ে বলল, 'দাও ত দেখি, এক হাঁড়ি পোলাও।' অমনে একটা সুগন্ধ যে বেরুল! তেমন পোলাও রাজরাও সচরাচর খেতে পান না। আর সে কি বিশাল হাঁড়ি! গুপি কি সেটা থলির ভিতর তেকে তুলে আনতে পারে? যা হোক, কোনমতে সেটাকে বার ক'রে এনে তারপর থলিকে বলর, 'ভাজা ব্যঞ্জন, চাটনি, মিঠাই, দই, রাবড়ি, শরবত। শিগগির দাও।' দেখতে দেখতে খাবার জিনিসে আর সোনা-রূপোর বাসনে ভ'রে গেল। দুজন লোকে আর কত খাবে? সে অপূর্ব খাবার খেয়ে তাদের গায়ের ব্যথা কোথায় চলে গেল তার আর ঠিক নেই।

তখন বাঘা বলল, 'দাদা চলো এই বেলা এখান থেকে পালাই, নইলে শেষে কুত্তা দিয়ে খাওয়াবে? দেখাই যাক-না, কি হয়।' এ কথায় বাঘা খুব খুশি হল। সে বুঝতে পারল যে, গুপিদা একটা-কিছু মজা করবে।

দুদিন চ'লে গেল, আর একদিন পরেই রাজা তাদের বিচার করবেন। বিচারের দিন রাত থাকতে উঠে গুপি থলের ভিতর হাত দিয়ে বলল, 'আমাদের দুজনের রাজপোশাক চাই।' বলতেই তার ভিতর থেকে এমন সুন্দর পোশাক বেরুল যে, তেমন পোশাক কেউ তয়েরই করতে পারে না। সেই পোশাক তারা দুজনে পরে তাদের পুরনো কাপড় আর বাসন কখানি পুঁটলি বেঁধে নিয়ে জুতো পায় দিয়ে তার বলল, 'এখন আমরা মাঠে হাওয়া খেতে যাব।' অমনি দেখে, রাজবাড়ির বাইরের প্রকাণ্ড মাঠে চ'লে এসেছে। সে মাঠের এক জায়গায় তাদের পুঁটুলিটি লুকিয়ে রেখে, তারা বেড়াতে এরে রাজবাড়ির সামনে উপস্থিত হল।

দূর থেকে তাদের আসতে দেখেই রাজার লোক ছুটে গিয়ে তাঁকে খবর দিয়েছিল যে, 'মহারাজ, দুজন রাজা আসছেন।' রাজাও তা শুনে তাঁর ফটকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বাঘা আর গুপি আসতেই তিনি তাদের যার পর নাই আদর দেখিয়ে বাড়ির ভিতর নিয়ে গেলেন। চমৎকার একটি ঘরে তাদের বাসা দেওয়া হল। কত চাকর, বামুন, পেয়াদা, পাইক তাদের সেবাতে লেগে গেল, তার অন্ত নেই।

for more books visit www.rashal.com

তারপর গুপি আর বাঘা হাত-পা ধুয়ে জলযোগ করে একটু ঠাণ্ডা হলেই রাজামশাই তাদের খবর নিতে এলেন। তাদের পোশাক দেখে অবধিই তিনি ভেবে নিয়েছেন যে, 'না জানি এঁরা কত বড় রাজাই হবেন।' তারপর শেষে যখন তিনি গুপিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কোন দেশের রাজা?' তখন গুপি হাত জোড় ক'রে তাঁকে বলল, 'মহারাজা! আমরা কি রাজা হতে পারি? আমরা আপনার চাকর!'

গুপি সত্য কথাই বলেছিল, কিন্তু রাজার তাতে বিশ্বাস হল না। তিনি ভাবলেন,'কি ভাল মানুষ, কেমন নরম হয়ে কথা বলে। যেমন বড় রাজা, তেমনি ভদ্রলোকও দেখছি!' তিনি তখন আর বিশেষ কিছু না বলে তাদের দুজনকে তাঁর সভায় নিয়ে এলেন। সেখানে সেদিন সে দুটো লোকের বিচার হবে-তিনদিন আগে যারা গিয়ে তাঁর শোবার ঘরে ঢুকেছিল। বিচারের সময় উপস্থিত, আসামী দুটোকে আনতে পেয়াদা গিয়েছে। কিন্তু তাদের আর কোথায় পাবে? এ তিন দিন তাদের ঘরে তালা বন্ধ ছিল, সেই তালা খুলে দেখা হল, সেখানে কেই নেই, খালি ঘর প'ড়ে আছে।

তখন ত ভারি একটা ছুটোছুটি হাঁকাহাঁকি পড়ে গেল। দারোগামশাই বিষম ক্ষেপে গিয়ে পেয়াদা গুলোকে বকতে লাগলেন। পেয়াদারা তাহ জোড় করে বলল, 'হুজুর! আমাদের কোনো কসুর নেই। আমরা তালা দিয়ে রেখেছিলা, তার উপর আবার আগাগোড়া দরজার সামনে দাড়িয়েছিলা,। ও দুটো ত মানুষ ছিল না, ও দুটো ছিল ভুত; নইলে এর ভিতর থেকে কি ক'রে পালাল?'

এ কথায় সকলেরই বিশ্বাস হল। রাজামশাইও প্রথমে দারোগার উপর রেগে তাকে কেটেই ফেলতে গিয়েছিলেন, শেষে ঐ কথা শুনে বললেন, 'ঠিক, ও দুটো নিশ্চয় ভূত। আমার ঘরও ত বন্ধ ছিল, তার ভিতর এত বড় ঢোল নিয়ে কি করে ঢুকেছিল?'

তা শুনে সকলেই বলল, 'হাঁ হাঁ, ঠিক ঠিক, ও দুটো ভূত!' বলতে বলতেই তাদের শরীর শিউরে উঠল, গা বেয়ে ঘাম পড়তে লাগল। তখন তারা বাঘার সেই ঢোলকটির কথা মনে করে বলল, 'মহারাজ! ভূতের ঢোল বড় সর্বনেশে জিনিস! ওটাকে কখনো আপনার ঘরে রাখবেন না। ওটাকে এখুনি পুড়িয়ে ফেলুন।'

রাজামশাইও বললেন, 'বাপ্ রে! ভূতের ঢোল ঘরে রাখব? এক্ষুনি ওটাকে এনে পোড়াও! যেই এ কথা বলা, অমনি বাঘা দুহাতে চোখ ঢেকে 'হাউ- হাউ-হাউ-হাউ-হাউ' ক'রে কেঁদে গড়াগড়ি দিতে লাগল!

সেদিন বাঘাকে নিয়ে গুপির কি মুশকিলই হয়েছিল। ঢোল পোড়াবার নাম শুনেই বাঘা কাঁদতে আরম্ভ করেছে, ঢোল এনে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে না-জানি সে কি করবে। তখন, সেটা যে তারই ঢোল, সে কথা কি আর বাঘা সামলে রাখতে পারবে? সর্বনাশ! এখন বুঝি ধরা প'ড়ে প্রাণটাই হারাতে হয়।

গুপির বড়ই ইচ্ছা হচ্ছিল যে বাঘাকে নিয়ে ছুটে পালায়। কিন্তু তার ত আর জো নেই। সভায় বসবার সময় যে সেই জুতোগুলো পা থেকে খুলে রাখা হয়েছে।

এদিকে কিন্তু বাঘার কাণ্ড দেখে সভাময় এক বিষম হুলুস্থুল প'ড়ে গেছে। সবাই ভাবছে, বাঘার নিশ্চয় একটা ভারি অসুখ হয়েছে, আর সে বাঁচবে না। রাজবাড়ির বদ্যিঠাকুর এসে বাগার নাড়ী দেখে যার পর নাই গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন। বাঘাকে খুব ক'রে জোলাপের ওষুধ খাইয়ে তার পেটে বেলেস্তারা লাগিয়ে দেওয়া হল। তারপর বদ্যিঠাকুর বললেন, 'এতে যদি বেদনা না সারে, তবে পিঠে আর-একটা, তাতেও না সারলে দুপাশে আর দুটো বেলেস্তারা লাগাতে হবে।'

এ কথা শুনেই বাঘার কান্না তৎক্ষণাৎ থেমে গেল। তখন সকলে বালল যে, বদ্যিঠাকুর কি চমৎকার ওষুধই দিয়েছেন, দিতে বেদনা সেরে গেছে।

যা হোক, বাঘা যখন দেখল যে তার কান্নাতে ঢোল পোড়াবার কথাটা চাপা প'ড়ে গেছে, তখন সেই বেলেস্তারার বেদনার ভিতরেই তার মনটা কতক ঠাণ্ডা হল। রাজামশাই তখন তাকে খুব যত্নের সহিত তার ঘরে শুইয়ে রেখে এলেন। গুপি তার কাছে ব'সে তার বেলেনস্তারায় হাওয়া করতে লাগল।

for more books visit www.rashal.com

তারপর সকলে ঘর থেকে চলে গেলে গুপি বাঘাকে বলল, 'ছি ভাই, যেখানে-সেখানে কি এমন করে কাঁদতে আছে। দেখ দেখি, এখন কি মুশকিলটা হল।' বাগা বলল, 'আমি যদি না কাঁদতুম, তা হলে ত এতক্ষণে আমার ঢোলকটি পুড়িয়ে শেষ করে দিত। এখন না হয় একটু জ্বলুনি সইতে হচ্ছে, কিন্তু আমার ঢোলকটা ত বেঁচে গেছে!'

বাঘা আর গুপি এমনি কথাবার্তা বলছে। এদিকে রাজামশাই সভায় ফিরে এলে দারোগামশাই তাঁর কানে কানে বললেন, 'মহারাজ, একটা কথা আছে, অনুমতি হয় ত বলি।' 'রাজা বললেন, 'কি কথা?' দারোগা বললেন, 'মহারাজ, ঐ যে লোকটা গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদল, সে আর তার সঙ্গের ঐ লোকটা সেই দুই ভূত। আমি চিনতে পেরেছি।' রাজা বললেন, 'তাই ত হে, আমারও একটু যেন সেইরকম ঠেকছিল। তা হলে ত বড় মুশকিল দেখছি। বলো ত এখন কি করা যায়?'

তখন এ কথা নিয়ে সভার ভারি একটা কানাকানি শুরু হল। কেউ বলল, 'রোজা ডাকো, ও দুটোকে তাড়িয়ে দিক।' আর-একজন বলল, 'রোজা গদি তাড়াতে না পারে, তখন ত সে দুটো কে পুড়িয়ে মারুন না।'

এ কথাটা সকলেরই খুব পছন্দ হল, কিন্তু এর মধ্যে একটু মুশকিল এই দেখা গেল যে, ভূতদের পোড়াতে গেলে রাজবাড়িতেও তখন আগুন ধরে গেদে পারে। শেষে অনেক যুক্তির পর এই স্থির হল যে, একটা বাগানবাড়িতে তাদের বাসা দেওয়া হবে। বাগানবাড়ি পুড়ে গেলেও বিশেষ ক্ষতি হবে না। রাজামশাই বললেন, 'সেই ঢোলকটাকেও তা হলে সেই বাগানবাড়িতে নিয়ে রাখা যাক। বাগানবাড়ি পোড়াবার সময় একসঙ্গে সকল আপদ চুকে যাবে।'

বাগানবাড়ি যাবার কথা শুনে গুপি আর বাঘা খুব খুশি হল। তারা ত জানে না যে এর ভিতর কি ভয়ানক ফন্দি রয়েছে। তারা খালি ভাবল যে বেশ আরামে নিরিবিলি থাকা যাবে, সংগীত চর্চার সুবিধা হতে পারে। জায়গাটি খুবই নিরিবিলি আর সুন্দর। বাড়িটি কাঠের, কিন্তু, দেখতে চমৎকার। সেখানে গিয়ে দেখতে দেখতে বাঘা ভাল হয়ে গেল। তখন গুপি তাকে বলল, 'ভাই, আর এখানে থেকে কাজ কি? চলো আমরা এখান থেকে চ'লে যাই।' বাঘা বলল, 'দাদা, এমন সুন্দর জায়গায় ত আর থাকতে পাব না, দুদিন এখানে রইলামই বা। আহা, আমার ঢোলকটি যদি থাকত!'

সেদিন বাঘা বাড়ির এঘর-ওঘর ঘুরে বেড়াচ্ছে, গুপি বাগানের এক জায়গায় ব'সে গুনগুন করছে, এমন সময় হঠাৎ বাঘা ভয়ানক চেঁচামেচি ক'রে উঠল। তার সকল কথা বোঝা গেল না, খালি 'ও গুপিদা। ও গুপিদা!' হাকটা খুবই শোনা যেতে লাগল। গুপি তখন ছুটে এসে দেখল যে, বাঘা তার সেই ঢোলকটা মাথায় ক'রে পাগলের মত নাচছে, আর যা-তা আবোল-তাবোল বলতে বলতে 'গুপিদা গুপিদা চেঁচাচ্ছে! ঢোলক পেয়ে তার এত আনন্দ হয়েছে যে, সে আর কিছুতেই স্থির হতে পারছে না, গুছিয়ে কথাও বলতে পারছে না। এমনি ক'রে প্রায় আধঘণ্টা চলে গেলে পর বাঘা একটু শান্ত হয়ে বলল, 'গুপিদা, দেখছ কি, এই ঘরে আমার ঢোলকটি-আর কি মজা-হাঃ-হাঃ' বলে আবার সে মিনিট দশেক খুব নেচে নিল। তারপর সে বলল, 'দাদা, এত দুঃখের পর ঢোলকটি পেয়েছে। খাওয়া দাওয়ার পর রাত্রে বারান্দায় ব'সে দুজনায় খুব ক'রে গানবাজনা করা যাবে।'

রাজামশাই কিন্তু ঠিক করেছেন, সেই রাত্রেই তাদের পুড়িয়ে মারবেন। দারোগার উপর হুকুম হয়েছে যে, সেদিন সন্ধ্যার সময় সেই বাগানবাড়িতে মস্ত ভোজের আয়োজন করতে হবে। দারোগামশায় পঞ্চাশ-ষাট জন লোক নিয়ে সেই ভোজে উপস্থিত থাকবেন। খাওয়াদাওয়ার পর গুপি আর বাঘা ঘুমিয়ে পড়লে, তাঁরা সকলে মিলে একসঙ্গে সেই কাঠের বাড়ির চারদিকে আগুন দিয়ে তাদের পালাবার পথ বন্ধ করবেন।

সেদিনকার খাওয়া বেশ ভালমতই হল। গুপি আর বাঘা ভাবল যে, লোকজন চ'লে গেলেই তারা গান বাজনা আরম্ভ করবে। দারোগামশাই ভাবলেন যে গুপি আর বাঘা ঘুমোলেই ঘরে আগুন দেবেন। তিনি তাদের ঘুম পড়াবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর ভাব দেখে যখন স্পষ্টই বোঝা গেল যে, তারা না ঘুমোলে তিনি সেখান থেকে যাবেন না, তখন গুপি বাঘাকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় প'ড়ে নাক ডাকাতে লাগল।

একটু পরেই গুপি আর বাঘা দেখল যে লোকজন সব চ'লে গেছে, আর কারু সাড়াশব্দ নেই। তারপর আর একটু দেখে যখন মনে হল যে, বাগান একেবারে খালি হয়ে গেছে, তখন তারা দুজনে বারান্দায় এসে ঢোল বাজিয়ে গান জুড়ে দিল।

for more books visit www.rashal.com

এদিকে দারোগামশাই তাঁর লোকদের বলে দিয়েছেন, 'তোরা প্রত্যেক দরজায় বেশ ভাল ক'রে আগুন ধরাবি। খবরদার, আগুন ভাল ক'রে ধরলে চ'লে যাস নি যেন!' তিনি নিজে গিয়েছেন সিঁড়িতে আগুন ধরাতে। আগুন বেশ ভাল মতই ধরেছে, দারোগামশাই ভাবছেন, 'এই বেলা ছুটে পালাই'। এমন সময় বাঘার ঢোল বেজে উঠল, গুপিও গান ধ'রে দিল। তখন আর দারোগামশাই বা তাঁর লোকদের কারু সেখান থেকে গড়বার জো রইল না, সকলেই পুড়ে মরতে হল। ততক্ষণে গুপি আর বাঘাও আগন দেখতে পেয়ে তাদের জুতোর জোরে, তাদের ঢোল আর থলেটি নিয়ে সেখান থেকে চম্পট দিল।

সেদিনকার আগুনে দারোগামশাই ত পুড়ে মারা গিয়েছিলেন, তাঁর দলের অতি অল্প লোকই বেঁচেছিল। সেই লোকগুলো গিয়ে রাজামশাইকে এই ঘটনার খবর দিতে তাঁর মনে বড়ই ভয় হল। পরদিন আর দু-চার জন লোক রাজসভায় এস বলল যে, তারা সেই আগুনের তামাশা দেখতে সেখানে গিয়েছিল। তারা তখন ভারি আশ্চর্যরকমের গান-বাজনা শুনেছে, আর ভূত দুটোকে শূন্যে উড়ে পালাতে স্বচক্ষে দেখেছে। তখন যা রাজামশায়ের কাঁপুনি! সেদিন তাঁর সভা করা হল না। তুনি তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতরে এসে ভূতের ভয়ে দরজা এঁটে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলেন, এক মাসের ভিতরে আর বাইরে এলেন না।

এদিকে গুপি আর বাঘা সেই আগনের ভিতর থেকে পালিয়ে একেবারে তাদের বাড়ীর কাছের সেই বনে এসে উপস্থিত হয়েছে, যেখানে প্রথমে তাদের দেখা হয়েছিল। তাদের বড় ইচ্ছা যে এত ঘটনার পর একবার তাদের মা-বাপকে দেখে যায়। বনে এসেই বাঘা বলল, 'গুপিদা, এইখানে না তোমার আমায় দেখা হয়েছিল? গুপি বলল, 'হ্যাঁ!' বাঘা বলল, 'গুপিদা, 'তবে এমন জায়গায় এসে কি একটু গান-বাজনা না ক'
রে চলে যেতে আছে?' গুপ বলল, 'ঠিক বলেছ ভাই, তবে আর দেরি কেন? এই বেলা আরম্ভ ক'রে দাও।' এই বলে তারা প্রাণ খুলে গান-বাজনা করতে লাগল।

এর মধ্যে এক আশ্চর্য ঘটনা হয়েছে। এক দল ডাকাত হাল্লার রাজার ভাণ্ডার লুটে, তার ছোট ছেলে দুটিকে সুদ্ধ চুরি করে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল। রাজা অনেক সৈন্য নিয়ে তাদের পিছু পিছু প্রাণপণে ছুটেও ধরতে পারছিলেন না। গুপি আর বাঘা যখন গান ধরেছে, ঠিক সেই সময়ে সেই ডাকাতগুলো সেই বনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে গান একবার শুনলে ত আর তার শেষ অবধি না শনে চ'লে যাবার জো নেই। কাজেই ডাকাতদের তখনি সেখানে দাঁড়াতে হল। সারা রাতের ভিতরে আর সে গান-বাজনাও থামল না, ডাকাতদেরও সেখান থেকে যাওয়া ঘটল না। সকালে হাল্লার রাজা এসে অতি সহজেই তাদের ধ'রে ফেললেন। তারপর যখন তিনি জানলেন যে, গুপি আর বাঘার গানের গুণেই তিনি ডাকাত ধরতে পেরেছেন, তখন আর তাদের আদর দেখে কে? রাজকুমারেরাও বললেন, 'বাবা, এমন আশ্চর্য গান আর কখখনো শোন নি। এদের সঙ্গে নিয়ে চলো!' কাজই রাজা গুপি আর বাঘাকে বললেন, 'তোমারা আমার সঙ্গে চলো! তেমাদের পাঁচশো টাকা ক'রে মাইনে হল।'

এ কথায় গুপি জোড়হতে রাজমশাইকে নমস্কার ক'রে বলল, 'মহারাজ, দয়া ক'রে দুদিনের ছুটি দিতে আজ্ঞা হোক। আমরা আমাদের পিতা- মাতাকে দেখে তাঁদের অনুমতি নিয়ে আপনার রাজধানীতে গিয়ে উপস্থিত হব।' রাজা বললেন, 'আচ্ছা, এ দুদিন আমরা এই বনেই বিশ্রাম করছি। তোমারা তোমাদের মা-বাপকে দেখে দু'দিন পরে এসে এই খানেই আমাদের পাবে।'

গুপিকে তাড়িয়ে অবধি তার বাবা তার জন্য বড়ই দুঃখিত ছিল, কাজেই তাকে ফিরে আসতে দেখে তার বড় আনন্দ হল। কিন্তু বাঘা বেচারার ভাগ্যে সে সুখ মেলে নি। তার মা-বাপ এর বললে, 'ঐ রে! সেই বাঘা বেটা আবার আমাদের হাড় জ্বালিয়ে মারবে। মার বেটাকে!' বাঘা বিনয় ক'রে বলল, 'আমি কালি আমার মা-বাবাকে দেখতে এসেছি, দুদিন থেকেই চ'লে যাব, রাজাব-টাজাব না।' সে কথা কি তারা শোনে? তারা দাঁত খিচিয়ে তার মা-বাপের মৃত্যুর কথা বলে এই বড় লাঠি নিয়ে তাকে মারতে এল। সে প্রাণপণে ছুটে পালাতে পালাতে ইঁট মেরে তার পা ভেঙ্গে মাথা ফাটিয়ে রক্তরক্তি ক'রে দিল।

গুপি তাদের ঘরির দাওয়ায় ব'সে তার বাপের সঙ্গে কথা বলছিল। এমন সময় সে দেখন যে, বাঘা পাগলের মত হয়ে খোঁড়াতে ছুটে আসছে। তার কাপড় ছিঁড়ে ফালি ফালি আর রক্তে লাল হয়ে গেছে। অমনি সে তাড়াতাড়ি বাঘার কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে? তোমার এ দশা কেন?' গুপিকে দেখেই বাঘা একগাল হেসে ফেলেছে। তারপর সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'দাদা, বড্ড বেঁচে এসেছি! মূর্খগুলো আর একটু হলেই আমার ঢোলটি ভেঙে দিয়েছিল! গুপিদের বাড়ি এসে গুপির যত্নে আর তার মা-বাপের আদরে বাঘার দুদিন যতটা সম্ভব সুখেই কাটল। দুদিন পর গুপি তার মা-বাপের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় ব'লে গেল, 'তোমরা ভয়ের হয়ে থাকবে। আমি আবার ছুটি পেলেই এসে তোমাদের নিয়ে নিয়ে যাব।'

for more books visit www.rashal.com

তারপর কয়েক মাস চ'লে গিয়েছে। গুপি আর বাঘা এখন হাল্লার রাজার বাড়িতে পরম সুখে বাস করে। দেশ বিদেশে তাদের নাম রটে গিয়েছে- 'এমন ওস্তাদ আর কখনো হয় নি, হবেও না।' রাজামশাই তাদের ভারি ভালোবাসেন; তাদের গান না শুনে একদিনও থাকতে পারেন না। নিজের দুঃখ সুখের কথা সব গুপির কাছে বলেন। একদিন গুপি দেখল, রাজামশায়ের মুখখানি বড়ই মলিন। তিনি ক্রমাগতই যেন কি ভাবছেন, যেনতাঁর কোনো বিপদ হয়েছে।শেষে একবার তিনি গুপিকে বললেন, 'গুপি, মুশকিলে পড়েছি, কি হবে জানি না। শুণ্ডীর রাজা আমার রাজ্য কেড়ে নিতে আসছে।'

শুণ্ডীর রাজা হচ্ছেন সেই তিনি, যিনি গুপি আর বাঘাকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলেন তাঁর নাম শুনেই গুপির মনে একটা চমৎকার মতলব এল। সে তখন রাজামশাইকে বলল, 'মহারাজ! এর জন্য কোন চিন্তা করবেন না। আপনার এই চাকরকে হুকুম দিন, আমি এ থেকে হাসির কাণ্ড ক'রে দেব। রাজা হেসে বললেন, 'গুপি, তুমি গাইয়ে বাজিয়ে মানুষ, যুদ্ধের ধারও ধার না, তার কিছু বোঝও না। শুণ্ডীর রাজার বড় ভারি ফৌজ, আমি কি তার কিছু করতে পারি?' গুপি বলল, 'মহারাজ, হুকুম পেলে একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি। ক্ষতি ত কিছু হবে না।' রাজা বললেন, 'তোমার যা ইচ্ছা তাই তুমি করতে পার।' এ কথায় গুপি যার পর নাই খুশি হয়ে বাঘাকে ডেকে পরামর্শ করতে লাগল।

গুপি আর বাঘা সেদিন অনেকক্ষণ ধরে পরামর্শ করেছিল্ বাঘার তখন কতই উৎসাহ! সে বলল, 'দাদা, এবারে আমরা দুজনে মিলে একটা কিছু করবই করব। আমার শুধু এক কথায় একটু ভয় হচ্ছে। হঠাৎ যদি প্রাণ নিয়ে পালাবার দরকার হয়, তবে হয়ত আমি জুতোর কথা ভুলে গিয়ে সাধারণ লোকের মত কষে ছুট দিতে যাব, আর মার খেয়ে সারা হব। এমনি করে দেখ-না সেবারে আমাদের গাঁয়ে মূর্খগুলোর হাতে আমার কি দশা হ'ল।'

যা হোক, গুপি কথায় বাঘার সে ভয় কেটে গেল, আর পরদিন থেকেই তারা কাজে লাগল। দিনকতক ধরে রোজ রাত্রে তারা শুন্ডী চলে যায়, আর রাজবাড়ির আশেপাশে ঘুরে সেখানকার খবর নেয়। যুদ্ধের আয়োজন যা দেখতে পেল, সে বড়ই ভয়ঙ্কর। এ আয়োজন নিয়ে এরা হাল্লায় গিয়ে উপস্থিত হলে আর রক্ষা নেই। রাজার ঠাকরবাড়িতে রোজ মহাধুমধামে পুজো হচ্ছে। দশ দিন এমনিতর পুজো দিয়ে, ঠাকরকে খুশি ক'রে তারা হল্লায় রওনা হবে।

গুপি আর বাঘা এর সবই দেখল, তারপর একদিন তাদের ঘরে ব'সে,দরজা এঁটে,সেই ভুতের দেওয়া থলিটিকে বলল, 'নতুন ধরনের মিঠাই চাই, খুব সরেস।' সে কথায় থলির ভিতর থেকে মিঠাই যা বেরুল, সে আর বলবার নয়। তেমনি মিঠাই কেউ কায় নি, চোখেও দেখে নি। সেই মিঠাই নিয়ে বাঘা আর গুপি শুন্ডীর রাজার ঠাকুরবাড়ীর বিশাল মন্দিরের চূড়োয় গিয়ে বসল নীচে খুব পুজোর ধুম-ধূপধুনো শঙ্খঘন্টা কোলাহলের সীমা নেই, আঙিনায় লোকে লোকারণ্য। সেই সব লোকের মাথার উপরে ঝড়াৎ ক'রে মিঠাইগুলো ঢেলে দিয়ে বাঘা আর গুপি মন্দিরের ভিতর দিয়ে চুড়ো আঁকড়ে ধরে তামাশা দেখতে লাগল। অন্ধকারের মধ্যে সেই ধূপধূনা আর আলোর ধোঁয়ায় কেউ তাদের দেখতে পেল না।

মিঠাইগুলো আঙিনায় পড়তেই অমনি কোলাহল থেমে গেল। অনেকেই লাফিয়ে উঠল,কেউ কেই চেঁচিয়ে ছুটও দিল। তারপর দু-চার জন সাহসী লোক কয়েকটা মিঠাই তুলে, আলোর কাছে নিয়ে ভয়ে ভয়ে দেখতে লাগল। শেষে তাদের একজন চোখ বুজে তার একটু মুখে পুরে দিল।

দিয়েই আর কথাবার্তা নেই-সে দুহাতে আঙিনা থেকে মিঠাই তুলে খালি মুখে দিচ্ছে আর নাচছে আর আহাদে চেঁচাচ্ছে। তখন সেই আঙিনা-সুদ্ধ লোক মিঠাই খাবার জন্য পাগলের মত কাড়াকাড়ি আর কিচিরমিচির করতে লাগল।

এদিকে কয়েকজন ছুটে গিয়ে রাজামশাইকে বলছে, 'মহারাজ! ঠাকুর আজ পুজোয় তুষ্ট হয়ে স্বর্গ থেকে প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে যে কি অপূর্ব প্রসাদ, সে কথা আমরা বলতেই পারছি না।' সে কথা শুনবামাত্রই রাজামশাই প্রাণপণে কাছা গুঁজতে গুঁজতে ঊর্ধ্বশ্বাসে এস ঠাকুরবাড়িতে উপস্থিত হলেন।

কিন্তু হায়! ততক্ষণে সব প্রসাদ শেষ হয়ে গিয়েছিল্ সমস্ত উঠোন ঝাঁট দিয়েও রাজামশাইয়ের জন্য একটু প্রসাদের গুঁড়ো পাওয়া গেল না। তখনি তিনি ভারি চটে গিয়ে বললেন, 'তোমাদের কি অন্যায়। পুজো করি আমি,আর প্রসাদ খেয়ে শেষ কর তোমরা! আমার জন্যে একটু গুঁড়োও রাখ না! তোমাদের সকলকে ধ'রে শুলে চড়াব।' এ কথায় সকলে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জোড়াহাতে বলল, 'দোহাই মাহরাজ! আপনার প্রসাদ কি আমরা খেয়ে শেষ করতে পারি? বাপ্ রে! আমরা খেতে না খেতেই ঝাঁ করে কোনখান দিয়ে ফুরিয়ে গেল।! আজ

for more books visit www.rashal.com

আমাদের প্রসাদগুলো আপনি মাপ করুন; কালতকের যত প্রসাদ, সব মহারাজ একাই খাবেন।' রাজা তাতে বললেন, 'আচ্ছা তাই হবে। খবরদার ! মনে তাকে যেন।'

পরদিন রাজামশাই প্রসাদ খাবেন, তাই একপ্রহর বেলা থাকতেই তিনি ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় এসে আকাশের পানে তাকিয়ে বসে আছেন। আর সকলে ভয়ে ভয়ে একটু দূরে বসে তাঁকে ঘিরে তামাশা দেখছে। আজ পুজোর ঘটা অন্যদিনের চেয়ে শতগুণ্ সবাই ভাবছে, দেবতা তাতে খুশি হয়ে রাজামশাইকে আরো ভাল প্রসাদ দেবেন।

রাত-দুপুরের সময় গুপি আর বাঘা আরো আশ্চর্যরকমের মিঠাই নিয়ে এসে মন্দিরের চুড়োয় বসল। আজ তাদের পরনে খুব জমকালো পোশাক, মাথায় মুকুট, গলায় হার, হাতে বালা, কানে কুণ্ডল। তারা দেবতা সেজে এসেছে। ধোঁয়ার জন্য কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তবু রাজামশাই আকাশের পানে তাকিয়ে আছেন। এমন সময় গুপি আর বাঘা হাসতে হাসতে তাঁর উপরে সেই মিঠাইগুলো ফেলে দিল। তাতে রাজামশাই প্রথমে একটা চিৎকার দিয়ে তিন হাত লাফিয়ে উঠলেন, তারপর তাড়াতাড়ি সামলিয়ে নিয়ে,হাতে মিঠাই তুলে মুখে দিতে লাগলেন, আর ধেই ধেই ক'রে নাচনটা যে নাচলেন!

এমন সময় গুপি আর বাঘা হঠাৎ মন্দিরের চুড়ো থেকে নেমে এসে রাজার সামনে দাঁড়াল। তাদের দেখে সকলে 'ঠাকুর এসেছেন' বলে কে আগে গড় করবে ভেবে ঠিক পায় না। রাজামশাই ত লম্বা হয়ে মাটিতে পড়েই রয়েছেন, আর খালি মাথা ঠুকছেন। গুপি তাঁকে বলল, 'মহারাজ! তোমার নাচ দেখে আমরা বড়ই তুষ্ট হয়েছি। এসো তোমার সঙ্গে কোলাকুলি করি।' রাজা তা শুনে যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। দেবতার সঙ্গে কোলাকুলি, সে কি কম সৌভাগ্যের কথা?

কোলাকুলি আরম্ভ হল। সকলে 'জয় জয়' বলে চেঁচাতে লাগল। সেই অবসরে গুপি আর বাঘা রাজামশাইকে খুব ক'রে জড়িয়ে বলল, 'এখন তবে আমাদের ঘরে যাব!' বলতে বলতেই তারা তাঁকে সুদ্ধ একেবারে এসে তাদের নিজের ঘরে উপস্থিত। ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় সেই লোকগুলো অনেকক্ষন ধরে হাঁ করে আকাশের পানে চেয়ে রইল। তারপর তখন রাজামশাই আর ফিরলেন না, তখন তারা যে যার ঘরে এসে বলল, 'কি আশ্চর্যই দেখলাম! রাজামশাই সশরীরে স্বর্গে গেলেন! দেবতারা নিজে তাঁকে নিতে এসেছিলেন!'

এদিকে রাজামশাই গুপি আর বাঘার কোলে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, তাদের ঘরে এসেও অনেকক্ষণ তাঁর জ্ঞান হয় নি। ভোরের বেলায় তিনি চোখ মেলে দেখলেন যে, সেই দুটো ভূত তাঁর মাথার কাছে ব'সে আছে। অমনি তিনি তাদের পায়ে প'ড়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'দোহাই বাবা! আমাকে খেয়ো না! আমি দুশো মোষ মেরে তোমাদের পুজো করব।'

গুপি বলল, 'মহারাজ, আপনার কোনো ভয় নেই। আমরা ভূতও নই, আপনাকে খেতেও যাচ্ছি না।' রাজামশাইয়ের কিন্তু তাতে একটুও ভরসা হল না। তিনি আর কোনো কথা না ব'লে মাথা গুঁজে বসে কাঁপতে লাগলেন।

এদিকে বাঘা এসে হাল্লার রাজাকে বলল, 'কার রাত্রে আমরা শুণ্ডীর রাজাকে ধ'রে এনেছে। একন কি আজ্ঞা হয়?' হাল্লার রাজা বললেন, 'তাঁকে নিয়ে এসো!'

দুই রাজার যখন দেখ হল, তখন শুণ্ডীর রাজা বুঝতে পারলেন যে তাঁকে ধ'রে এনেছে । হাল্লা জয় করা ত তাঁর ভাগ্যে ঘটলই না, এখন প্রাণটিও যাবে। কিন্তু হাল্লার রাজা তাঁকে প্রাণে না মেরে শুধু তাঁর রাজ্যই কেড়ে নিলেন। তারপর তিনি গুপি আর বাঘাকে বললেন, 'তোমরাই আমাকে বাঁচিয়েছ, নইলে হয়ত আমার রাজ্যও যেত, প্রাণও যেত। শুন্ডীরাজ্যের অর্ধেক আর আমার দুটি কন্যা তোমাদের দুজনকে দান করলাম'। তখন খুবই একটা ধুমধাম হল। গুপি আর বাঘা হাল্লার জামাই হয়ে আর শুণ্ডীর অর্ধেক রাজ্য পেয়ে পরম আনন্দে সঙ্গীতের চর্চা করতে লাগল। গুপির মা- বাপের মান্য আর সুখ তখন দেখে কে?

লাল সূতো আর নীল সূতো

এক জোলা একদিন তাহার স্ত্রীকে বলিল,'আমি পায়েস কাব, পায়েস রেঁধে দাও।' জোলার স্ত্রী বলিল, 'ঘরে কাঠ নেই। কাঠ এনে দাও, পায়েস রেঁধে দিচ্ছি। জোলা কাঠ আনিতে গেল।

for more books visit www.rashal.com

পথেরা ধারে একটা বড় আম গাছ ছিল, তাহার একটা শুকনো ডালের আগায় বসিয়া জোলা তাহারই গোড়ার দিকটা কাটিতেছে। তাহা দেখিয়া পথের লোক একজন ডাকিয়া বলিল, 'ওহে, ও ডাল কেটো না, কাটলে পড়ে যাবে।' জোলা বিরক্ত হইয়া বলিল, 'তুমি শুনতে জানো নাকি? ও ডাল কাটলে পড়ে যাব, তা তুমি কি করে জানলে? আমি পায়েস খাব না বুঝি!' পথের লোক আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল্ আর, খানিক পরে জোলাও ডালসুদ্ধ পড়িয়া গেল।

গাছ হইতে পড়িয়াই জোলা ভাবিল, 'তাই ত! আমি যে প'ড়ে যাব, তা ও জানলে কি করে? ও নিশ্চয় একটা কেউ হবে।' এই ভাবিয়া জোলা ছুটিয়া গিয়া সেই পথিকের পা জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'প্রভু, আপনি কে? আমি কবে মরব, সেটি আমাকে বলে দিন।' পথিক ভারি মুশকিলেই পড়িল। জোলার খুব বিশ্বাস হইয়াছে যে, এ পথিক সামান্য পথিক নয়; সুতরাং তাহার প্রশ্নের উত্তর না পাইলে তাহাকে কিছুতেই ছাড়িতেছে না। শেষটা পথিক যখন দেখিল যে, একটা কিছু না বলিলে তাহার আর ঘরে যাওয়া হইতেছে না, তখন সে রাগিয়া বলিল, 'তোর পেটের ভিতর থেকে লাল সুতো আর নীল সুতো যখন বেরুবে, তখন তুই মরবি।' এই কথায় জোলা সন্তুষ্ট হইয়া বাড়ি ফিরিল।

এখন হইতে জোলা ঠিক হইয়া বসিয়া আছে যে, লাল সূতা আর নীল সূতা বাহির হইলেই তাহার মৃত্যু। সুতরাং সে রোজ পরীক্ষা করিয়া দেখে, তাহা বাহির হইল কি না। এইরূপ পরীক্ষা করিতে গিয়া একদিন সত্য সত্যই তাহার কাপড়ে একখণ্ড লাল সূতা আর একখন্ড নীল সূতা পাইল আর অমনি সে চিৎকার করিয়া তাহার স্ত্রীকে বলিল,'ওগো শিগগির এস, আমি মরে গিয়েছি- আমার লাল সুতো নীল সূতা বেরিয়েছে।' তাহার স্ত্রী আসিয়া দেখিল, সত্য সত্যই লাল সূতা আর নীল সূতা। তখন সে বেচারা আর কি করে, জোলাকে বিছানায় শোয়াইয়া কাপড় চাপা দিয়া সে কাঁদিতে বসিল। এর মধ্যে আর দু- চারজন জোলা বেড়াইতে আসিয়া দেখে যে, জোলার স্ত্রী কাঁদিতেছে। তারপর জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিল যে, লাল সূতা নীল সূতা পাওয়া গিয়াছে, তখন সকলে স্থির করিল যে, জোলা নিশ্চয়ই মরিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহারা সৎকারের চেষ্টা দেখিতে লাগিল।

কিন্তু ইহার মধ্যে ভারি মুশকিল দেখা দিল। পোড়ানোতে জোলা কিছুতেই রাজি নয়। পোড়ানোর কথা তুলিতেই সে বলে, 'ওমা! পুড়ে যাব যে!' মরিয়া গেলে তাহাকে পোড়ানো ছাড়া আর কি করা যায়?- গোর দেওয়া! কিন্তু জোলা তাহাতেও অসম্মত। বলল, ওমা! দম আটকে যাবে যে!' শেষে অনেক যুক্তির স্থির হইল যে, জোলাকে গোর দেওয়াই হইবে, কিন্তু মুখখানা জাগাইয়া রাখা যাইবে। জোলা তাহাতে রাজি হইল। কিন্তু সে বলিল যে, 'খিদে পেলে চারটি ভাত দিয়ো।' এইরূপ পরামর্শের পর জোলাকে গোর দেওয়া হইল- অর্থাৎ তাহার মুখ জাগিয়া রহিল, আর- সব মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিল।

এইরূপে সমস্ত দিন চলিয়া গেল। রাত্রিতে চারটি ভাত খাইয়া জোলা একটু নিদ্রার চেষ্টা দেখিল।

সেই রাত্রিতে সাত চোর রাজার বাড়িতে চুরি করিতে চলিয়াছে। চোরেরা ত আর বাবুদের মতন সদর রাস্তা দিয়া চলে না- তাহারা প্রায়ই ঝোপজঙ্গলের ভিতর দিয়া চলে, আর সে-সব জায়গা অনেক সময়টই নোংরা থাকে। চলিতে চলিতে একজন চোর কাদার মতন একটা কি জিনিস মাড়াইল, সে জিনিসটার বিশ্রী গন্ধ। সে পা মুছিবার জন্য একটা জায়গা খুঁজিতে লাগিল। উহার নিকটেই জোলাকে গোর দিয়াচে, সে চোর পা মুছিবি ত মোছ, সেই জোলার মুখে গিয়া মুছিতে লাগিল। ঘষার আর গন্ধের চোটে জোলার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে রাগিয়া বলিল, 'উঃ-হুঁ-হু-! তোমার কি চোখ নাই না কি?'

চোর আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুই কে রে?'

জোলা বলিল, 'আমি জোলা।'

'এখানে কি করছিস?'

'আমি মরে গিয়েছি। আমার লাল সুতো নীল সুতো বেরিয়েছে- তাই আমাকে গোর দিয়েছে!'

এই কথা মুনিয়া চোরেরা খুব হাসিতে লাগিল। তারপর তাহাদের একজন বলিল, 'একে আমাদের সঙ্গে নিয়ে চল।'

for more books visit www.rashal.com

চোরেরা জোলাকে বুঝাইয়া দিল যে, তাহার মৃত্যু হয় নাই, আর তাহাদের সঙ্গে গেলে পেট ভারিয়া খাইতে পারিবে। জোলা জিজ্ঞাসা করিল, 'কি খাওয়াবে? পায়েস?' চোরোর বলিল, 'হাঁ পায়েস - চল!' পায়েসের কথা শুনিয়া জোলা কোন আপত্তি করিল না। চোরেরা তাহাকে উঠাইয়া লইয়া চলিল।

রাজার বাড়িতে গিয়া চোরেরা রাজার ঘরে প্রকাণ্ড সিঁদ কাটিল। তারপর জোলাকে ঐ সিঁদের ভিতর ঢুকাইয়া দিয়া বলিল, 'রাজার মাথার মুকুটটা নিয়ে আয়।' রাজার খাটে মশারি খাটানো ছিল, তাহা দেখিয়া জোলা ভারি আশ্চর্য হইয়া গেল। সে মশারির চারিদিকে ঘুরিয়া কোথাও তাহার দরজা দেখিতে পাইল না। সুতরাং চোরেদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'হল না। ওর ভিতর আর একটা ঘর আছে, তার দরজা নেই।'

চোরোর বলিল, 'দূর বোকা! ওটা ঘর নয়, মশারি। ওটাকে তুলে দেখলি না কেন? জোলা আবার ঘরের ভিতরে গেল।'

এবার জোলা মশারি তুলিতে অনেক চেষ্টি করিল, কিন্তু সেটাকে নাড়িতেও পারিল না- কারণ সে খাটসুদ্ধ ধরিয়া টানাটানি করিয়াছিল। সে আবার ফিরিয়া আসিয়া আসিয়া বলিল, 'না ভাই, ওটা বড্ড ভারি।'

'আরে, এমন গাধাও আর দেখি নি! তুই বুঝি খাটসুদ্ধ তুলতে গিয়েছিলি? শুধু ওর কাপড়টা টানতে হয়।'

এবারে জোলা আর কোনা ভুল করিল না। মশারির কাপড় ধরিয়া টানিতেই সেটা উঠিয়া আসিল। ভিতরে খুব উঁচু গদির উপরে রাজা শুইয়া আছেন, তাঁহার গায় ঝালর- দেওয়া অতিশয় পুরু লেপ। দেখিয়া জোলার মনে ভারি দুঃখ হইল। সে ভাবিল, বুঝি রাজাকে গোর দিয়াছে। এরও লাল সুতো নীল সুতো বেরিয়েছিল নাকি?' জোলা যত ভাবে, ততই আশ্চর্য হয়, আর তত তাহার জানিতে ইচ্ছা করে, রাজা মহাশয়েরও লাল সূতা নলি সূতা বাহির হইয়াছিল কি না। শেষটা এমন হইল যে, এই খবরটা তাহার না জানিলেই নয়। সুতরাং সে ঠেলিয়া জাগাইল। আর, তিনি চোখ মেলিবামাত্রই, জিজ্ঞাসা করিল, 'লাল সূতো নীল সূতো বেরিয়েছিল?'

ইহার পর একটা মস্ত গোলমাল হইল। রাজবাড়ির সকলে জাগিয়া গেল, সাত চোর ধরা পড়িল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে জোলাও ধারা পড়িল।

পরদিন বিচার। জোলা আগাগোড়া সকল কথা খুলিয়া বলিল। লাল সুতো নীল সুতোর কথা, গোর দিবার কথা, চোরের পা মুছিবার কথা, পায়েসের কথা- কিছুই বাকি রাখিল না।

বিচারে সাত চোরের উচিত সাজা হইল। আর জোলাকে পেট ভরিয়া উত্তম উত্তম পায়েস খাওয়াইয়া বিদায় দেওয়া হইল।

দুষ্ট দানব

এক দানব আর এক চাষা, দুজনে পাশা খেলছিল। খোলায় চাষার হার হল।

পাশায় হেরে চাষা হায় হায় করতে লাগল। খেলবার আগে সে বাজি রেখেছিল যে, সে হারলে দানব তার ছেলেটিকে নিয়ে যাবে। এখন উপায় কি হবে? দানব কিছুতেই ছাড়বে না। সে বলছে, 'কালই এসে আমি ছেলে নিয়ে যাব। যদি তাকে রাখতে চাও, তবে এমন করে তাকে লুকিয়ে রেখে দাও, যাতে আমি খুঁজে বার করতে না পারি। খুঁজে পেলে কিন্তু আর তাকে ফেলে যাব না।'

হায়, কি বিপদ! ছেলেটিকে কোথায় লুকোবে? যেখানেই রাখুক, দানব নিশ্চয় তাকে খুঁজে বার করবে। চাষা ভেবে কিছু বুঝতে না পেরে শেষে দেবতার রাজাকে ডাকতে লাগল। দেবতার রাজা তাঁর দুঃখ দেখে দয়া করে বললেন, 'তোমার কোনোচিন্তা নেই। আমি তোমার ছেলেটিকে এমন করে লুকিয়ে দেব যে দানবের বাবাও তাকে খুঁজে বার করতে পারবে না।'

এই বলে তিনি ছেলেটিকে গমের ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে তাকে একটা ছোট্ট গমের ভিতরে লুকিয়ে রাখলেন। তার পরদিন দানব এসে চাষার ঘরে, বাদগানে , পুকুরে, বাক্সে, উনুনে, হাঁড়িতে, হুঁকোর ভিতরে- কতই খুঁজল, কোথাও ছেলেটিকে দেখতে পেল না। কিন্তু সে এমনি দুষ্ট দানব ছিল- সে তখনি বুঝে নিল যে, তবে নিশ্চয় গমের ক্ষেতে গমের ভিতরে লুকিয়ে রেখেছে! অমনি সে কাস্তে নিয়ে গিয়ে ঘ্যাঁশ ঘ্যাঁশ করে

for more books visit www.rasmal.com

গম কাটতে লাগল! সব গম কেটে, তারপর তার এক-একটি করে দানা হাতে নিয়ে উলটেপালটে দেখে, সে দুদণ্ডের মধ্যেই ধরে ফেলল যে, এই গমটার ভিতর চাষার ছেলে বসে আছে।

আর- একটু হলেই সে সেই গমটার ভিতর থেকে ছেলেটিকে বার করে নিয়ে যেত এর মধ্যে দেবতার রাজা এসে তার হাত থেকে সেটা কেড়ে নিয়ে ছেলেটিকে তাড়াতাড়ি চাষার হাতে দিয়ে বললে, 'আমর যা সাধ্য, আমি তা করেছি। এর বেশি আর পারব না।' দানব ছেলেটিকে নিতে না পেরে ভারি চটে বলল, 'বটে, আমাকে ফাঁকি দিলে? সে হবে না, আমি কাল আবার আসব।'

দেবতার রাজা যখন পারলেন না, তখন চাষা আলোর দেবতার কাছে গেল। আলোর দেবতা এসে তার ছেলেটিকে একটি রাজহাঁসের গলায় পালক বানিয়ে রেখে দিলেন। কিন্তু তাতে কি সে দানবকে ঠকাবার জো আছে? সে এসেই হাঁসের গলা ছিঁড়ে সে পালকটি সুদ্ধ তাকে মুখে দিতে গিয়েছে। ভাগ্যিস পালকটি তখন তার ঠোঁটে লেগে রইল, নইলে আর উপায়ই ছিল না। পালকাটকে দানবের ঠোঁটে লাগতে দেখেই আলোর দেবতা সেটিকে উড়িয়ে নিয়ে চাষার কাছে পৌঁছে দিলেন, আর বললেন, 'আমি আর কিছু করতে পারব না।' দানব সেদিনও ঠকে গেল, কিন্তু যাবার সময় বলে গেল, 'কাল আবার আসব।'

দেবতার রাজা হেরে গেলেন, আলোর দেবতা হেরে গেলেন। তখন আগুনের দেবতাকে ডেকে বলল, 'ঠাকুর! আপনি আমার ছেলেটিকে বাঁচান!' আগুনের দেবতা তখন ছেলেটিকে সমুদ্রে নিয়ে একটা মাছের পেটের মধ্যে তার একটি ডিমের ভিতরে লুকিয়ে রাখলেন।

দানব নিক্ত এর সবই টের পেয়েছে, আর তাই এবারে সে ছিপ নিয়ে তয়ের হয়ে এসেছে। সমুদ্রে কত কোটি কোটি মাছ, তার ভিতর থেকে সে সেই ডিমটাকে দেখতে দেখতে খুঁজে বার করল।

তখন আগুনের দেবতা সেই ডিমটি তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চুপিচুপি ছেলেটিকে বললেন, 'শিগগির ঘরে পালিয়ে যা, ভেতরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিস।' এ কথা তখন দানব শুনতে পায় নি। তারপর ছেলেটি পালিয়ে অনেক অনেক দূরে গেলে সে তাকে দেখতে পেল। অমনি ঘোঁত করে লাফিয়ে উঠে সে তার পিছু পিছু ছুটল। কিন্তু ছেলেটি ততক্ষণে ঘরে ঢুকে গিয়েছে। দানবটা তাকে ধরবার জন্য তাড়াতাড়ি গেল সেই ঘরে ঢুকতে। সে জানত না যে আগুনের দেবতা এর আগেই কখন সেই ঘরের দরজায় তিনহাত লম্বা এক লোহার খোঁচ বসিয়ে রেখেছেন। দানব রাগে ভূত হয়ে ঘরে ঢুকবার সময় সেই খোঁচ আগাগোড়া গেল তার মাথায় ঢুকে। তখন সে ভয়ানক চেঁচিয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে যেতেই আগুনের দেবতা ছুটে এসে তার একটা পা কেটে ফেললেন।

কিন্তু পা কাটলে কি তহবে? দুষ্ট দানব তাকে কি জাদুই করে রেখেছে- সেই কাটা পা তখনি এসে আবার জোড়া লেগে গেল! যা হোক, আগুনের দেবতা সেই দানবের থেকে বড় জাদুকর ছিলেন তিনি জানতেন যে কাটা জায়গায় লোহা আর পাথর ফেলে দিলে আর তা জোড়া লাগতে পারে না। কাজেই তিনি তাড়াতাড়ি দানবের আর একটা পা কেটেই লোহা আর পাথর দিয়ে কাটা জায়গা চাপা দিয়ে ফেললেন। তখন আর দানবের জাদু খাটল না, দেখতে দেখতে তার প্রাণ বেরিয়ে গেল।

তখন ত চাষার খুবই আনন্দ হল। সে আগুনের দেবতাকে কত প্রণাম যে কারল, তা গুণে শেষ করা যায় না। তারপর থেকে সে সকলকে বলত যে, এই দেবতাটির মত দেবতা নেই।

for more books visit www.rashal.com

গল্প নয় সত্য ঘটনা

জক্তওয়ালা অনেক জক্ত লইয়া শহরে একটি ঘর ভাড়া করিয়াছে। মনে করিয়াছে, আজ হাটের দিন বিস্তর লোক আসিবে, আর তামাশা দেখিয়া পয়সা দিবে। হাটে লোকের কম নাই, কিন্তু জক্তওয়ালার ঘরের আধখানাও ভরিল না। জক্তগুলারও যেন ফুর্তি নাই। লোক কম দেখিয়া তাহারাও কেমন হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। ভাল তামাশা হইতেছে না দেখিয়া যে দু-চার জন দর্শক উপস্থিত, তাহারাও হাসি- ঠাট্টা করিতেছে।

এমন সময়ে বাঘটার যেন কি হইল। সে এতক্ষণ খাঁচার এক কোণে শুইয়া ঝিমাইমেছিল। কথা নাই, বার্তা নাই, হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া, খাঁচার শিক ধারিয়া দাঁড়াইয়া ভয়ানক গর্জন! সেই গর্জন শুনিয়া দর্শকেরা হাসি ঠাট্টা ফেলিয়া, দুই লাফে দূরে সরিয়া গেল।

ব্যাপারখানা কি? এত রাগের ত কোনো কারণই দেখা যায় না- তবে ঐ যে গাঁট্টাগোট্টা, লাল-গোঁপওয়ালা জাহাজের মাল্লাটা, নীল কোট পরিয়া খেঁতলো টুপি মাথায় দিয়া, এইমাত্র তামাশা দেখিবার জন্য ঘরের ভিতরে আসিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া যদি বাঘ মহাশয়ের ক্রোধ হইয়া থাকে।

মাল্লা বাঘের খাঁচার দিকে চাহিল, বাঘটাকেও খানিকক্ষণ ধরিয়া মনোযোগ করিয়া দেখিল, তারপর অমনি একেবারে বাঘের কাছে গিয়া উপস্থিত! বাঘ তাহাকে কাছে পাইয়া আরো গর্জন করিয়া উঠিল। দর্শকেরা ভারি আশ্চর্য হইয়া গেল, আর তাহাদের বড় ভয়ও হইল। মাল্লা কিন্তু ততক্ষণে খাঁচার ভিতর হাত ঢুকাইয়া দিয়া, দিব্যি বাঘের মাথা চাপড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে- সেটাকে যেন সে বিড়াল ছনা পাইয়াছে। মাল্লা বলিল- কি রে বিল্লি, কেমন আছিস ভাই? লোকগুলি ভয়ে শিহরিয়া উঠিল্ যে- ভয়ংকর দাঁত, এক কামড়েই ত মাল্লার হাতখানাকে একেবারে ছিঁড়িয়া ফেলিবে। বাঘ কিন্তু তেমন কিছুই করিল না। সে তাহার প্রকাণ্ড মাথাটা আনিয়া, আদর করিয়া জ্যাকের (মাল্লার নাম) হাত ঘষিতে লাগিল, আর আদর পাইলে বিড়ালের গলায় যেমন গুড়গুড় শব্দ হয়, তেমনি শব্দ করিতে লাগিল।

মুহূর্তের মধ্যে বাহিরের লোকে ইহার খবর পাইয়া দৌড়িয়া ঘরে আসিতে লাগিল, ঘরে আর লোক ধরে না। কত লোক দরজার এক পয়সার জায়গায় সিকি দুআনি ফেলিয়া দিয়া আর বাকি পয়সার জন্য দাঁড়ায় নাই, তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিতে পারিলেই ঢের মনে করিয়াছে। জন্তুওয়ালার এখন আর দুঃখ করিবার কোনো কারণ নাই। তাহার বাক্স বোঝাই হইয়া গিয়াছে।

মাল্লা ততক্ষণে জন্তুদের একজন প্রহরীর হাত ধরিয়া বলিল, 'বিল্লির খাঁচাটা একবার খোলো না ভাই। ও আমার পুরনো বন্ধু। একবার ভেতরে গিয়ে ওর সঙ্গে পুরনো কালের দুটো গল্প করে নিই।'

প্রহরি বেচারা একটু মুশকিলে পড়িল, আর তা হওয়ারই কথাল বাঘকে বিশ্বাস কি? চোখের সামনে একটা লোককে চিবাইয়া খাইবে, এরূপ দেখিতে তাহার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। আর খাঁচা খুলিলে জ্যাক ঘরে যাইবেন, অথচ বাঘ বাহিরে আসিবেন না, এরূপ করাও ত সহজ ব্যাপার নয়। বাঘ যদি একবার বাহিরে আসিয়া হাই তোলেন, তবে তামাশাটা কি রকমের হইবে! প্রহরী আমতা আমাতা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি সত্যি বলছ নাকি?' জ্যাক একটু চটিয়া বলিল, 'সত্যি বলছি না ত কি? এ কোথাকার বোকা! দেখতে পাচ্ছ না, ও আমাকে চিনতে পেরেছে?'

বাঘ সেই সময় আর- এক হাঁক দিয়েছে, যেন বলিতেছে- 'হ্যাঁ হে হ্যাঁ।'

প্রহরী অনেক ইতস্তত করিয়া একহাতে দরজা খুলিল, আর- এক হাতে একখানা লোহার রুল বাগাইয়া ধরিল। জন্তুগুলি কথা না শুনিলে ঐ রুল দিয়া সে তাহাদের শাসন করে।

যেই দরজা খুলিল, অমনি দর্শকেরা তাড়াতাড়ি সরিয়া দাঁড়াইল- পাছে বাঘমহাশয়ের হঠাৎ জলযোগের খেয়াল হয়, আর বাহিরে আসিয়া দু- একটিকে ধরিয়া মুখে দেয়! কিন্তু বিল্লি তাহার বন্ধুকে লইয়া ব্যস্ত ছিল, অন্য লোকের কোনো খবর নেয় নাই।

বাঘ অনেকবার মাল্লার চারিদিকে ঘুরিয়া অত্যন্ত স্নেহের সহিত তাহার গায়ে মাথা ঘষিতে লাগিল। তারপর দুই পায়ে দাঁড়াইয়া, হাত দুখানি জ্যাকের কাঁধে তুলিয়া দিল, জ্যাকও তাহার টুপিটা লইয়া বাঘের মাথায় পরাইয়া দিল।

টুপি পরিয়া বাঘকে নেহাত মন্দ দেখিতে হইল না- দর্শাকেরা খুবই হাসিয়াছিল। কিন্তু তারপর আরো মজা হইয়াছিল।

টুপিটি ফিরাইয়া লইয়া মাল্লা বলিল, 'বিল্লি, যা শিখিয়েছিলাম, মনে আছে ত? দেখি- লাফা।' মাল্লা হাত খুব বাড়াইয়া ধলিল, আর বাঘ তাহার ঐ প্রকাণ্ড শরীরটা লইয়া পরিষ্কার তাহার উপর দিয়া লাফাইয়া গেল।

'আচ্ছা, ফিরে এসো।' বাঘ অমনি আবার লাফাইয়া ফিরিয়া আসিল। ভারি বাধ্য ছাত্র! প্রহরী ভারি আশ্চর্য হইয়া গেল। সে কত চেষ্টা করিয়াও সেই বাঘকে দিয়া এত কাজ করাইতে পারে নাই। তাই সে জিজ্ঞাসা করিল, 'ভাই,এত কথা ওকে কি করে শেখালে?'

জ্যাক হাসিয়া বলিল, 'জাহাজে থাকতে ওকে খাওয়ানোর ভারটা আমার হাতেই ছিল। সেটা দেখছি আজও সে ভোলে নি, কেমন রে বিল্লি?' বাঘ একটু ঘোঁত করিল, যেন বলিল 'আরে,না।'

for more books visit www.rashal.com

মাল্লা বলিল, 'আচ্ছা বিল্লি, বোসো ত'। অমনি বাঘ মাটিতে বিড়ালের মতন করিয়া বসিয়া পড়িল। মাল্লা তাহার গায়ে ঠেসান দিয়া বসিয়া এক হাতে তাহার থাবা চুলকাইয়া দিতে লাগিল। তারপর গান ধরিল।

বাঘ গানের সঙ্গে সঙ্গে ধুপধাপ করিয়া খাঁচার মেঝে চাপড়াইতে লাগিল। খাঁচাখানা কাঁপিতে লাগিল। মাল্লা যখন খুব জোরে গাহিতে লাগিল, তখন বাঘ 'এয়াও' করিয়া তাহার সঙ্গে তান ধরিল। সেই তানের চোটে ঘরের জানলাগুলি খট খট করিয়া উঠিল।

আরো তামাশা হইত,কিন্তু জ্যাক এই সময়ে জানালার ভিতর দিয়া গির্জার ঘড়ি দেখিতে পাইল। তাহাকে রেলে অনেক দূর যাইতে হইবে, আর দেরি করিলে চলিতেছে না। সুতরাং সে বিল্লির কাছে বিদায় লইল। বিল্লি কিন্তু তাহাকে অত তাড়াতাড়ি ছাড়িতে রাজি নহে। জ্যাকের সঙ্গে সঙ্গে সেও খাঁচার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। প্রহরী দরজা খুলিলে সেও জ্যাকের সঙ্গে যাইবে! প্রহরী দরজা খুলিতেছিল, বাঘের কাণ্ড দেখিয়া আর খুলিল না। জ্যাক তিনবার চুপচাপ সরিয়া পড়িতে চেষ্টা করিল, বাঘ তাহার কোটের কোণ কামড়াইয়া ধরিয়া তিনবার ফিরাইল। জ্যাক মুশকিলে পড়িয়া বলিল, 'এ ত বড় মুশকিল রে বাবু। আমি ত থাকতে আসি নি, আমি শুধু দেখতে এসেছিলাম।'

কিন্তু প্রহরীর মুখ ততক্ষণে গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। মাল্লা যতই যাইতে চাহিতেছে, বাঘ ততই বিরক্ত হইতেছে। শেষে চটিয়া গিয়া এক থাপ্পড় বসাইয়া দিলেই ত মাল্লার দফা নিকাশ হইয়া যায়! এই সময়ে এক বুদ্ধি জুটিল। খাঁচাটাতে দুই কামরা। বাহিরটাতে বাঘ সকল লোকের সামনে তামাশা দেখায়, ভিতরেরটাতে বসিয়া সে আহার করে। মাঝখানে দরজা আছে, বাহির হইতেই তাহা খোলা ও বন্ধ করা যায়। এই ভিতরের কামরায় বড় এক টুকরো মাংস ঢুকাইয়া দেওয়া হইল, আর বাঘ অমনি বন্ধুকে ভুলিয়া খাইবার ঘরে ঢুকিল। চতুর প্রহরী তৎক্ষণাৎ মাঝখানের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। জ্যাকও সুযোগ বুঝিয়া তাহার পথ ধরিল।

জোলা আর সাত ভুত

এক জোলা ছিল সে পিঠে খেতে বড় ভালবাসত।

একদিন সে তার মাকে বলল, 'মা, আমার বড্ড পিঠে খেতে ইচ্ছে করছে,আমাকে পিঠে করে দাও।'

সেইদিন তার মা তাকে লাল-লাল, গোল-গোল, চ্যাপটা-চ্যাপটা সাতখানি চমৎকার পিঠে করে দিল। জোলা সেই পিঠে পেয়ে ভারি খুশি হয়ে নাচতে লাগল আর বলতে লাগল,

'একটা খাব, দুটো খাব,
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব!'

জোলার মা বলল, 'খালি নাচবিই যদি, তবে খাবি কখন?'

জোলা বলল, 'খাব কি এখানে? সবাই যেখানে দেখতে পাবে, সেখানে গিয়ে খাব।' ব'লে জোলা পিঠেগুলি নিয়ে নাচতে নাচতে বাড়ি থেকে গেল, বলতে লাগল,

'একটা খাব, দুটো খাব,
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব!'

নাচতে নাচতে জোলা একেবারে সেই বটগাছতলায় চলে এল, যেখানে হাট হয়। সেই গাছের তলায় এসে সে খালি নাচছে আর বলছে,

'একটা খাব, দুটো খাব,
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব!'

for more books visit www.rashar.com

এখন হয়েছে কি-সেই গাছে সাতটা ভূত থাকত। জোলা 'সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব' বলছে, আর তা শুনে তাদের ত বড্ড ভয় লেগেছে। তারা সাতজনে গুটিগুটি হয়ে কাঁপছে, আর বলছে,'ওরে সর্বনাশ হয়েছে! ঐ দেখ, কেথেকে এক বিটকেল ব্যাটা এসেছে, আর বলছে আমাদের সাতজনকেই চিবিয়ে খাবে! এখন কি করি বল্ ত! অনেক ভেবে তারা একটা হাঁড়ি নিয়ে জোলার কাছে এল। এসে জোড়হাত করে তাকে বলল, 'দোহাই কর্তা! আমাদের চিবিয়ে খাবেন না। আপনাকে এই হাঁড়িটি দিচ্ছি, এইটি নিয়ে আমাদের ছেড়ে দিন।'

সাতটা মিশমিশে কালো তালগাছপানা ভূত, তাদের কুলোর মত কান, মুলোর মত দাঁত, চুলোর মত চোখ-তারা জোলার সামনে এসে কাঁইমাই করে কথা বলছে দেখেই ত সে এমনি চমকে গেল যে, সেখান থেকে ছুটে পালাবার কথা তার মনেই এল না। সে বলল, 'হাঁড়ি নিয়ে আমি কি করব?'

ভূতেরা বলল, 'আজ্ঞে, আপনার যখন যা খেতে ইচ্ছে হবে, তাই এই হাঁড়ির ভিতর পাবেন।'

জোলা বলল, 'বটে! আচ্ছা পায়েস খাব।'

বলতে বলতেই সেই হাঁড়ির ভিতর থেকে চমৎকার পায়েসের গন্ধ বেরুতে লাগল। তেমন পায়েস জোল কখনো খায় নি, তার মাও খায় নি, তার বাপও খায় নি। কাজেই জোলা যার-পর-নাই খুশি হয়ে হাঁড়ি নিয়ে সেখান থেকে চলে এল, আর ভূতেরা ভাবল, 'বাবা! বড্ড বেঁচে গিয়েছি।'

তখন বেলা অনেক হয়েছে, আর জোলার বাড়ি সেখান থেকে ঢের দূরে। তাই জোলা ভাবল, 'এখন এই রোদে কি করে বাড়ি যাব? বন্ধুর বাড়ি কাছে আছে, এবেলা সেইখানে যাই। তারপর বিকেলে বাড়ি যাব এখন।'

বলে সে তার বন্ধুর বাড়ি এসেছে। সে হতভাগা কিন্তু ছিল দুষ্টু। সে জোলার হাঁড়িটি দেখে জিজ্ঞাসা করল, হাঁড়ি কোথেকে আনলি রে।'

জোলা বলল, 'বন্ধু, এ যে-সে হাঁড়ি নয়, এর ভারি গুণ।'

বন্ধু বলল 'বটে? আচ্ছা দেখি ত কেমন গুণ।'

জোলা বলল, 'তুমি যা খেতে চাও, তাই আমি এর ভিতর থেকে বার করতে পারি।'

বন্ধু বলল, 'আমি রাবড়ি, সন্দেশ, রসগোল্লা, সরভাজা, মালপুয়া, পান্তুয়া, কাঁচাগোল্লা, ক্ষীরমোহন, গজা, মতিচুর জিলিপি, অমৃতি, চমচম এইসব খাব।'

জোলার বন্ধু যা বলছে, জোলা হাঁড়ি ভিতর হাত দিয়ে তাই বার করে আনছে। এ-সব দেখে তার বন্ধু ভাল যে, এ জিনিসটি চুরি না করলে হচ্ছে না।

তখন জোলাকে কতই আদর করতে লাগল! পাখা এনে তাকে হাওয়া করল, গামছা দিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দিল, আর বলল, 'আহা ভাই, তোমার কি কষ্টই হয়েছে! গা দিয়ে ঘাম বয়ে পড়েছে! একটু ঘুমোবে ভাই? বিছানা করে দেব?'

সত্যি সত্যি জোলার তখন ঘুব পেয়েছিল। কাজেই সে বলল, 'আচ্ছা বিছানা করে দাও।' তখন তার বন্ধু বিছানা করে তাকে ঘুম পাড়িয়ে, তার হাঁড়িটি বদলে তার জায়গায় ঠিক তেমনি ধরনের আর একটা হাঁড়ি রেখে দিল। জোলা তার কিছুই জানে না, সে বিকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ি চলে এসেছে আর তার মাকে বলছে, 'দেখো মা, কি চমৎকার একটা হাঁড়ি এনেছি। তুমি কি খাবে, মা? সন্দেশ খাবে? পিঠে খাবে? দেখো আমি এর ভিতর থেকে সে-সব বার করে দিচ্ছি।'

কিন্তু এ ত আর সে হাঁড়ি নয়, এর ভিতর থেকে সে-সব জিনিস বেরুবে কেন? মাঝখান থেকে জোলা বোকা ব'নে গেল, তার মা তাকে বকতে লাগল।

for more books visit www.rashal.com

তখন ত জোলার বড্ড রাগ হয়েছে, আর সে ভাবছে, 'সেই ভূত ব্যাটাদেরই এ কাজ।' তার বন্ধু যে তাকে ঠকিয়েছে, এ কথা তার মনেই হল না।

কাজেই পরদিন সে আবার সেই বটগাছতলায় গিয়ে বলতে লাগল,

'একটা খাব, দুটো খাব,
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব!'

তা শুনে আবার ভূতগুলো কাঁপতে কাঁপতে একটা ছাগল নিয়ে এসে তাকে হাত জোড় করে বলল, 'মশাই গো! আপনার পায়ে পড়ি, এই ছাগলটা নিয়ে যান। আমাদের ধরে খাবেন না।'

জোলা বলল, 'ছাগলের কি গুণ?'

ভূতরা বলল, 'ওকে সুড়সুড়ি দিয়ে ও হাসে, আর ও মুখ দিয়ে খালি মোহর পড়ে।'

অমনি জোলা ছাগলের গায়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল। আর ছাগলটাও 'হিহি হিহি' করে হাসতে লাগল, আর মুখ দিয়ে ঝর ঝর করে খালি মোহর পড়তে লাগল। তা দেখে জোলার মুখে ত আর হাসি ধরে না। সে ছাগাল নিয়ে ভাবল যে, এ জিনিস বন্ধুকে না দেখালেই নায়।

সেদিন তার বন্ধু তাকে আরো ভাল বিছানা করে দিয়ে দুহাতে দই পাখা দিয়ে হাওয়া করল। জোলার ঘুমও হল তেমনি। সেদিন আর সন্ধ্যার আগে তার ঘুম ভাঙল না। তার বন্ধু ত এর মধ্যে কখন তার ছাগল চুরি করে তার জায়গয় আর-একটা ছাগল রেখে দিয়েছে।

সন্ধ্যার পর জোলা তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে তার বন্ধুর সেই ছাগলটা নিয়ে বাড়ি এল। এসে দেখল, যে তার মা তার দেরি দেখে ভারি চটে আছে। তা দেখে সে বলল, 'রাগ আর করতে হবে না, মা। আমার ছাগলের গুণ দেখলে খুমি হয়ে নাচবে!' বলেই সে ছাগলের বগলে আঙুল দিয়ে বলল, 'কাতু কুতু কুতু কুতু কুতু!!!'

ছাগল কিন্তু তাতে হাসলো না, তার মুখ দিয়ে মোহরও বেরুল না। জোলা আবার তাকে সুড়সুড়ি দিলে বলল, 'কাতু কুতু কুতু কুতু কুতু কুতু কুতু কুতু!!'

তখন সেই ছাগল রেগে গিয়ে শিং বাগিয়ে তার নাকে অমনি বিষম গুঁতো মারল যে, সে চিত হয়ে পড়ে চেঁচাতে লাগল। আর তার নাক দিয়ে রক্তও পড়ল প্রায় আধ সের তিন পোয়া। তার উপর আবার তার মা তাকে এমনি বকুনি দিল যে, তেমন বকুনি সে আর খায় নি।

তাতে জোলার রাগ যে হল, সে আর কি বলব! সে আবার সেই বটগাছতলায় গিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল,

'একটা খাব, দুটো খাব,
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব!'

'বেটারা আমাকে দুবার ফাঁকি দিয়েছিস, ছাগল দিয়ে আমার নাক খেঁতলা করে দিয়েছিস-আজ আর তোদের ছাড়ছি নে!'

ভূতেরা তাতে ভারি আশ্চর্য হয়ে বলল, সে কি মশাই, আমার কি করে আপনাকে ফাঁকি দিলুম, আর ছাগল দিয়েই বা কিরে আপনার নাক খেঁতলা করলুম?'

জোলা তার নাক দেখিয়ে বলল, 'এই দেখ না, গুঁতো মেরে সে আমার কি দশা করেছ। তোদের সব কটাকে চিবিয়ে খাব!'

ভূতেরা বলল, 'সে কখনো আমাদের ছাগল নয়। আপনি কি এখান থেকে সোজাসুজি বাড়ি গিয়েছিলেন?'

for more books visit www.rashal.com

জোলা বলল, 'না, আগে বন্ধুর ওখানে গিয়েছিলুম।সেখানে খানিক ঘুমিয়ে তারপর বাড়ি গিয়েছিলুম।'

ভূতেরা বলল, 'তবেই ত হচ্ছেয়ে! আপনি যখন ঘুমোচ্ছিলেন, সেই সময় আপনার বন্ধু আপনার ছাগল চুরি করেছে।' একথা শুনেই জোলা সব বুঝতে পারল। সে বলল, 'ঠিক ঠিক। সে বেটাই আমার হাঁড়ি চুরি করেছে। এখন কি হবে?'

ভূতেরা তাকে একগাছি লাঠি দিয়ে বলল, 'এই লাঠি আপনার হাঁড়িও এনে দেবে, ছাগলও এনে দেবে। ওকে শুধু একটিবার আপনার বন্ধুর কাছে নিয়ে বলবেন, 'লাঠি লাগ। ত!' তা হলে দেখবেন, কি মজা হবে! লাখ লোক ছুটে এলেও এ লাঠির সঙ্গে পারবে না, লাঠি তাদের সকলকে পিটে ঠিক করে দেবে।'

জোলা তখন সেই লাঠিটি বগলে করে তার বন্ধুর গিয়ে বলল, 'বন্ধু, একটা মজা দেখবে?'

বন্ধু ত ভেবেছে, না জানি কি মজা হবে। তারপর যখন জোলা বলল, 'লাঠি, লাগ্ ত!' তখন সে এমনি মজা দেখল, যেমন তার জন্মে আর কখনো দেখে নি। লাঠি তাকে পিটে পিটে তার মাথা থেকে পা অবধি চামড়া তুলে ফেলল। সে ছুটে পালাল, লাঠি তার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে তাকে পিটতে পিটতে ফিরিয়ে নিয়ে এল। তখন সে কাঁদতে কাঁদতে হাত জোড় করে বলল, 'তার পায়ে পড়ি ভাই, তোর হাড়ি নে, তোর ছাগল নে আমাকে ছেড়ে দে।'

জোলা বলল, 'আগে ছাগল আর হাঁড়ি আন্, তবে তোকে ছাড়ব।'

কাজেই বন্ধুমশাই আর করেন? সেই পিটুনি খেতে খেতেই হাঁড়ি আর ছাগল এনে হাজির করলেন। জোলা হাঁড়ি হাতে নিয়ে বলল, 'সন্দেশ আসুক ত"!'অমনি হাঁড়ি সন্দেশে ভরে গেল। ছাগলকে সুড়সুড়ি দিতে না দিতেই সে হো হো করে হেসে ফেলল, আর তার মুখ দিয়ে চারশোটা মোহর বেরিয়ে পড়ল। তখন সে তার লাঠি, হাঁড়ি আর ছাগল নিয়ে বাড়ি চলে গেল।

এখন আর জোলা গরিব নেই, সে বড়মানষ হয়ে গেছে। তার বাড়ি, তার গাড়ি হাতি-ঘোড়া-খাওয়া-পরা, চাল-চলন, লোকজন সব রাজার মতন। দেশের রাজা তাকে যার পর নাই খাতির করেন, তাকে জিজ্ঞাসা না করে কোন ভারি কাজে হাত দেন না।

এর মধ্যে একদিন হয়েছে কি, আর কোন দেশের এক রাজা হাজার লোকজন নিয়ে এসে সেই দেশ লুটতে লাগল। রাজার সিপাইদের মেরে খোঁড়া করে দিয়েছে, এখন রাজার বাড়ি লুটে কখন তাঁকে ধরে নিয়ে যাবে, তার ঠিক নেই।

রাজামশাই তাড়াতাড়ি জোলাকে ডাকিয়ে বললেন, ভাই, এখন কি করি বল্ ত? বেঁধেই ও নেবে দেখছি।'

জোলা ললর, 'আপনার কোন ভয় নেই। আপনি চুপ করে ঘরে বসে থাকুন, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।'

বলেই সে তার লাঠিটি বগলে করে রাজার সিংহদরজার বাইরে গিয়ে চুপ ক'রে বসে রইল। বিদেশী রাজা লুটতে লুটতে সেই দিকেই আসছে, তার সিপাই আর হাতি ঘোড়ার গোলমালে কানে তালা লাগছে, ধুলোয় আকাশ ছেয়ে গিয়েছে। জোলা খালি চেয়ে দেখছে, কিছু বলে না।

বিদেশী রাজা পাহাড়ের মতন এক হাতি চড়ে সকলের আগে আগে আসছে, আর ভাবছে, সব লুটে নেবে। আর, জোলা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে আর ভাবছে, আর একটু কাছে এলেই হয়।

তারপর তারা যেই কাছে এসেছে, অমনি জোলা তার লাঠিকে বলল, 'লাঠি, লাগ্ ত।' আর যাবে কোথায়? তখনি এক লাঠি লাখ লাখ হয়ে রাজা আর তার হাতি- ঘোড়া সকলের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল্ আর পিটুনি যে কেমন দিল, সে যারা সে পিটুনি খেয়েছিল তারাই বলতে পারে।

পিটুনি খেয়ে রাজা চেঁচাতে চেঁচাতে বলল, 'আর না বাবা, আমাদের ঘাট হয়েছে, এখন ছেড়ে দাও, আমরা দেশে চলে যাই।'

জোলা কিছু বলে না, খালি চুপ করে চেয়ে দেখছে আর একটু একটু হাসছে।

for more books visit www.rashal.com

শেষে রাজা বলল, 'তোমাদের যা লুটেছি, সব ফিরিয়ে দিচ্ছি, আমার রাজ্য দিচ্ছি, দোহই বাবা, ছেড়ে দাও।'

তখন জোলা গিয়ে তার রাজাকে বলল, 'রাজামশাই, সব ফিরিয়ে দেবে বলছে, আর তাদের রাজ্যও আপনাকে দেবে বলছে, আর বলছে, দোহাই বাবা, ছেড়ে দাও। এখন কি হুকুম হয়?'

রাজামহাশয়ের কথায় জোলা তার লাঠি থামিয়ে দিলে। তারপর বিদেশী রাজা কাঁদতে কাঁদতে এসে রাজামশাইয়ের পায়ে পড়ে মাপ চাইল।

রাজামশাই জোলাকে দেখিয়ে বললেন,' আর এই লোকটিকে যদি তোমার অর্ধেক রাজ্য দাও, আর তার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দাও, তা হলে তোমার মাপ করব।'

সে ত তার সব রাজ্যই দিতে চেয়েছিল। কাজেই জোলাকে তার অর্ধেক রাজ্য আর মেয়ে দিতে তখনি রাজি হল।

তারপর জোলা সেই অর্ধেক রাজ্যের রাজা হল,আর রাজার মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হল। আর ভোজের কি যেমন তেমন ঘটা হল! সে ভোজ খেয়ে যদি তারা শেষ করতে না পেরে থাকে, তবে হয়ত এখনো খাচ্ছে। সেখানে একবার যেতে পারলে হত।

বুদ্ধিমান চাকর

এক কাজ সাহেবের এক চাকর ছিল, তার নাম বুদ্ধু। চাকরটা একে বিদেশী , তাতে বুদ্ধি- সুদ্ধির ধার ধারে না- কাজেই কাজি সাহেবের মহা মুস্কিল। চাকরটা কায়দা কানুন কিছুই জানে না- বাড়িতে লোক আসলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। একদিন রাজি সাহেব তাকে দুই ধমক দিয়েবললেন, 'ফের যদি এরকম বেয়াদবী করিস- কাউকে সেলাম না করিস, তবে তোকে আমি দেখাব। সকলকে খাতির করবি আর 'সেলাম' বলবি।'

সেই থেকে রাস্তায় বেরিয়ে যাকে দেখে, সকলকেই বুদ্ধু 'সেলাম' করে। ছেলে বুড়ো মানুষ গরু কাউকে বাদ দেয় না। এক গাধাওয়ালা তার গাধা বিয়ে চলেছে- চাকরটা তাকে সেলাম করল আর গাধাগুলোকেও খুব খাতির ক'রে বলল "সেলাম"। তা শুনে গাধাওয়ালা খুব হাসতে লাগল, আর বলল, 'দূর আহাম্মক ওদের বুঝি সেলাম বলতে হয়? ওদের "হেই হেই" ক'রে চালাতে হয়।' বুদ্ধু বেচারা কিছু দূর গিয়ে দেখল, একজন শিকারী ফাঁদ পেতে বসে আছে, আর অনেকগুলো পাখি সেই ফাঁদের কাছে ঘুরছে। তাই দেখে সে "হেই হেই" করে এমনি চেঁচায়ে উঠল যে পাখি- টাখি সব উড়ে পালাল। শিকারী ত চটে লাল!

আর- একদিন এক বড় লোকের বাড়িতে কাজি সাহেবের নেমন্তন্ন। বুদ্ধুও সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছে। তারা নবাব বংশের লোক- আশ্চর্য তাদের আদব- কায়দা। খেতে খেতে নিমন্ত্রণকর্তার দাড়িতে একটা ভাত পড়ল- অমনি একজন চাকর যেন গান করছে এমনি ভাবে গুন গুন ক'রে বলতে লাগল-

ফুলের তলে বুলবুল ছানা
তারে উড়িয়ে দেনা- উড়িয়ে দেনা-

অমনি তার মনিব ইশার বুঝতে পেরে দাড়ি ঝেড়ে ভাত ফেলে দিল। কাজি সাহেব বাড়ি এসে বুদ্ধুকে বললেন, 'দেখলি ত কেমন কায়দা! আমার দাড়িতে যদি খাবার সময় ভাত লাগে, তুইও ঠিক তেমনি ক'রে বলবি।' তারপর একদিন কাজি সাহেবের বাড়িতে খুব ভোজ হচ্ছে, কাজি সাহেব চাকরের কেরামতি দেখাবার জন্য ইচ্ছা ক'রে তাঁর দাড়িতে একটা ভাত ফেলে দিলেন আর বুদ্ধুকে চোখ টিপে ইশারা করলেন। বুদ্ধু অমনি চেঁচিয়ে বলল, 'সেই যে সেদিন অমুকদের বাড়িতে না কিসের কথা হয়েছিল? আপনার দাড়িতে তাই হয়েছে- তানানা নানা।' শুনে সব লোক হো হো করে হেসে উঠল।

একদিন মনিব বল্লেন,'দেখ তুই বড় বিশ্রী ভাত রাঁধিস। তুই এখানো ফেন গালাতেই শিখিস নি। আজ যখন ভাত বানাবি, ভাত সিদ্ধ হলেই আমাকে ডাকিস আমি দেখিয়ে দেব। আমাকে না দিখেয়ে কিছু করিস্ নি।'

for more books visit www.pashal.com

সেদিন ভাত সিদ্ধ হতেই ত চাকর মনিবকে ডাকতে গিয়েছে। দরজার বাইরে থেকে উঁকি মেরে একটা আঙুল দিয়ে ইশারা করে সে মনিবকে ডাকতে লাগল। কাজ সাহেব তখন দরজার দিকে পিছন ফিরে কি যেন লিখছিলেন, তিনি এ- সব কিছুই জানেন না। চাকরটা ঘন্টাখানেক এইরকম 'ডেকে' শেষটায় হয়রান হয়ে পড়ল। তখন সে রেগে চিৎকার করে বলল, 'আর কতক্ষন ডাকব? এদিকে ভাতটাত সব ত পুড়ে ছাই হয়ে গেল।' তখন কাজি সাহেব ফিরে দেখেন, চাকর তাঁকে একটা আঙুল দিয়ে ইশারা করছে- ওদিকে সত্যি সত্যিই ভাত পড়ে ছাই।

একদিন রাত্রে কাজি সাহেবের বাড়ি চোর ঢুকেছে। বুদ্ধু খচমচ শব্দ শুনে জিজ্ঞাসা করল, 'কে রে?' চোরটা গম্ভীর বাবে বলল, 'কেউ নই।' তা শুনে বুদ্ধু আবার নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাতে লাগল। সকালে উঠে কাজি সাহেব দেখেন , তাঁর সব চুরি হয়ে গিয়েছে। বুদ্ধুকে জিজ্ঞাসা ক'রে যখন রাত্রের সব শুনলেন, তিনি খুব রেগে গালাগালি করতে লাগলেন। কিন্তু বুদ্ধু তাতে মুখ ভারি বেজার করে বলল, "তা কি করব- সে আমায় বারবার করে বললে, 'কেউ নই, কেউ নই'। লোকটা ত দেখছি শুধু চোর নয় - ব্যাটা বেজায় মিথ্যাবাদী।"

একদিন কাজি সাহেব শহরের বাইরে কোথায় যাবেন। যাবার সময় বুদ্ধুকে বরে গেলেন, 'দেখিস , দরজাটার উপর ভাল করে চোখ রাখিস, দরজা ছেড়ে কোথাও যাস নে, তা হলে চোরে আমার সব নিয়ে যাবে।' কাজি সাহেব চলে গেলেন, চাকর বেচারা এক লাঠি নিয়ে দরজায় পাহারা দিতে লাগল্ একদিন গেল, দুদিন গেল। তারপর দিন বুদ্ধু শুনল, এক জায়গায় ভারি তামাশা দেখান হচ্ছে। তাই ত, বেচারা কি করে? অনেক ভেবে সে করল কি, বাড়ির দরজা খানা খুলে সেটাকে ঘাড়ে নিয়ে তামাশা দেখতে গেল। এদিকে বাড়িতে চো ঢুকে যা কাণ্ড করে গেল, সে আর কি বলব! কাজি সাহেব বাড়িতে এসে দেখেন- সর্বনাশ, বাড়ির সিন্দক আলমারি সব খালি। ওদিকে বুদ্ধ ব'সে তামাশা দেখছে আর খুব সাবধানে দরজা পাহারা দিচ্ছে।

ফিঙে আর কুঁকড়ো

একটা দানব ছিল, তার নাম ছিল ফিঙে। সে দেড়াশো হাত লম্বা শালগাছের ছড়ি হাতে নিয়ে বেড়াত। আর একটা দানব ছিল, তার নাম কুঁকড়ো। সে ঘুঁষো মেরে লোহার মুগুর খেঁতলা করে দিত।

আর যত দানব ছিল, তাদের সকালকেই কুঁকড়ো ঠেঙিয়ে ঠিক করে দিয়েছে, এখন সে ফিঙের সন্ধানে দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। এ কথা শুনে অবধি ফিঙের আর ঘুম হয় না, কাজেই সে কুঁকড়োকে এড়াবার জন্য খালি দেশ- বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। ফিঙে সমুদ্রের ধারে গেলে, তা শুনে কুঁকড়ো সেই দিক পানে রওনা হল। সে খবর পেয়েই ফিঙে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে তার নিজের ঘরে চলে এল।

ঘরখানি ছিল একটা উঁচু পর্বতের উপর। সেখান থেকে দশ দিনের পথ অবধি দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই ফিঙে ভাবল যে, ওখানে গেলে কুঁকড়ো নিতান্ত আচমকা এসে তাকে মারতে পারবে না। ফিঙেকে অমন ব্যস্ত হয়ে ফিরে আসতে দেখে তার স্ত্রী ঊনা বলল, 'কি হয়েছে?' ফিঙে আঙুল দিয়ে সমুদ্রের দিকে দেখিয়ে বলল, 'ঐ কুঁকড়ো আসছে। বেটা ঘুঁষো মেরে লোহার মুগুর খেঁতলা করে দেয়। এবারে দেখছি ভারি বেগতিক।'

ঊনা সেদিকে দেখল, সত্যি সত্যিই কুঁকড়ো আসছে, কিন্তু এখনো সে ঢের দূরে, তিন- চার দিনের কমে এসে পৌছবে না। তখন সে ফিঙেকে বলল, 'তোমার কোন ভয় নেই। তুমি পায়ের উপর পা তুলে বসে থাকো, আমি কুঁকড়োকে ঠিক করে দিচ্ছি।' কিন্তু ফিঙের মনের ভয় তাতে গেল না। সে মাথা হেঁট করে বসে কত কথা ভাবতে লাগল।

ঊনা কিন্তু ততক্ষণে চুপ করে ছিল না। সে গ্রামের লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে যার ঘরে যত ভাঙা দা, কুড়ুল, কাস্তে, খন্তা , কোদাল, হুড়কো, ছিটকিনি আর পেরেক ছিল, সব চেয়ে ঝুড়ি ভরে নিয়ে এল। তারপর সেই গুলো ভিতরে পুরে পুরে সে দুদিন ধরে খালি পাটিসাপটাই তয়ের করল। ফিঙে অবাক হয়ে হয়ে দেখে, আর বলে,'ও কি করছ? ঊনা বলে, 'যাই করি না কেন- তুমি চুপ করে থাকো।'

পিঠে হয়ে গেলে ঊনা তিন গামলা ছানাও তয়ের করল। তারপর ফিঙেকে অনেক পরামর্শ দিয়ে, অনেক সন্ধান শিখিয়ে রেখে,সে সব ঠিকঠাক করে রাখল। এখন কুঁকড়ো এলেই হয়।

for more books visit www.rashal.com

পরদিন দুপুরবেলা কুঁকড়ো এসে উপস্থিত হয়েছে। এসেই ভয়ংকর গর্জনে আকাশপাতাল কাঁপিয়ে জিজ্ঞাসা করল,'ফিঙে কোথায়?' ঊনা বলল, 'সে ত বাড়ি নেই। কুঁকড়ো বলে নাকি একটা ছোকরা তাকে খুঁজতে সমুদ্রের ধারে গিয়ে ভারি বড়াই করছিল, তাই শুনে ফিঙে বিষম রেগে লাঠি হাতে তাকে মারতে বেরিয়েছে। যদি তাকে দেখতে পায়, তবে আর বেচারাকে আস্ত রাখবে না।'

তা শনে কুঁকড়ো ভারি আশ্চর্য হয়ে বলল, 'আমিই ত কুঁকড়ো , তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছি।' এ কথায় ঊনা হো হো করে হেসেই কুটিপাটি। তারপর অনেকক্ষণ নাক সিঁটকিয়ে কুঁকড়োর পানে তাকিয়ে থেকে সে বলল, 'এই টিকটিকির মত জোয়ানটি হয়ে তুমি ফিঙের সঙ্গে যুদ্ধ করবে? অমন কাজও করতে নাই বাছা। কেন ফিঙের হাতে প্রাণ দেবে? আমার কথা শুনে চলো, আমি তোমাকে বাঁচিয়ে দিচ্ছি। ততক্ষণ একটা কাজ কর দেখি। বড্ড হাওয়া আসছে, ফিঙে বাড়ি নেই, কে ঘরখানিকে ঘুরিয়ে দেবে? দেখো ত তুমি পার কি না।'

কুঁকড়ো ভাবল, 'বাবা! হাওয়া থামাতে হলে ফিঙে এই ঘরটা ঘুরিয়ে দেয় নাকি? এখন আমি যদি "না" বলি, তবে ত দেখছি আমার বড্ড নিন্দে হবে।' তখন সে আগে খুব করে তার ডান হাতের মাঝের আঙুলটা মটকে নিল। আঙুলটাতেই তার যত জোর ছিল, ওটি না হলে সে কিছুই করতে পারত না। আঙুর মটকানো হয়ে গেলে সে দুহাতে ঘরখানিকে জড়িয়ে ধরে তাতে এমনি পাক দিল সে দেখতে দেখতে পাহাড়ের চূড়া সুদ্ধ ঘরখানি ঘুরে গেল।

এতক্ষণ ফিঙে কি করছে? সে ঊনার পরামর্শে তার নিজের খোকা সেজে, কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে, আর কুঁকড়োর কাণ্ড দেখে সেই কাঁথার ভিতরে ভয়ে ঘেমে আর কেঁপে অস্থির হচ্ছে।

এদিকে ঊনা আবার কুঁকড়োকে বলল,'বেশ বাপু! লক্ষ্মী ছেলে তুমি। আহা! ঘরে এক ফোঁটা জল নেই, তোমাকে কি দিয়ে একটু মেঠাই খেতে দিই। পাহাড়টার নীচে জল থাকে, ফিঙে পাহাড় সরিয়ে তাই তুলে আনে। আজ ত সে বাড়ি নেই, এখন উপায় কি হবে? দেখো ত বাপু, তুমি পাহাড়টা ঠেলে একটু জল আনতে পার কি না!'

কুঁকড়ো আবার খুব করে তার আঙুল মটকে নিয়ে, সেই পাহাড়ের নীচে গিয়ে এমনি গুতো মারল যে তাতে দশহাত গভীর এক প্রকাণ্ড দীঘি হয়ে গেল, আর তাতে জলও হল তেমনি। তা দেখে ঊনা আর একটু হলেই 'মাগো!' বারে চেঁচিয়ে ফেলছিল,কিন্তু সে ভারি বুদ্ধিমতী মেয়ে তাই তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলল, 'চলো,এখন তোমাকে কিছু পিঠে খেতে দিই গে।'

এই বরে ঊনা কুঁকড়োকে ঘরে এনে দিয়েছে সেই পিঠে খেতে। সে বেটাও এমনি লোভী- একেবারে তার দশটা তুলে নিয়ে মুখে দিয়েছে। দিয়েই সে 'উঃ- হুঃ- হুঃ-' বলে এমনি ভয়ংকর চেঁচিয়ে উঠল যে, আর একটু হলেই তাতে ঘরের ছাত উড়ে যেত। বেজায় ব্যস্ত হয়ে সেই পিঠে চিবোতে গিয়ে তার চারটে দাঁত ভেঙে রক্তারক্তি হয়ে গিয়েছে, কাজেই না চেঁচাবে কেন?

ঊনা তখন বলল, 'আরে অত চেঁচিও না, খোকার ঘুম ভেঙে যাবে আমি ভাবছিলাম তুমি জোয়ান লোক, ঐ পিঠে খেতে তোমার ভাল লাগবে। ফিঙে আর খোকা ও পিঠে খুব খায়।'

বলতে বলতে সেই খোকাটা কাঁথার ভিতর থেকে ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে বলল 'অঁ- য়্যা-আ-আ বদ্দ খিদে পেয়েখে! পিতে খাব।' খোকার গলার সে আওযাজ শুনেই ত কুঁকড়োর পিলে চমকে উঠেছে। ঊনা অবশ্য খোকার জন্য ভালো পিঠে করে রেখেছিল। তাই থেকে কয়েকটা খেতে-দিল। কুঁকড়ো ত আর তা জানে না। সে দেখল, যাতে তার নিজের দাঁত ভেঙে গেঙে গেছে, 'খোকা' তাই কপাকপ খাচ্ছে। কাজেই সে ভাবল, 'বাবা গো, খোকাই যদি অমনি পিঠে খেতে পারে, তবে বাব না জানি কি করতে পারে! ভাগ্যিস সে বেটা বাড়ি নেই।'

এমন সময়'খোকা ' আবার বলল, 'পাখল দে। দল বাল কব্ব! ঊনা তাকে একতাল ছানা, আর কুঁকড়োকে একটা সাদা পাখর দিয়ে বলল, 'খোকার ঐ এক খেলা- পাখর টিপে জল বার করে। তুমিও একখানা পাখর টিপে দেখো ত।' কুঁকড়ো সেই পাখর প্রাণপণে টিপেও তা থেকে জল বার করতে পারল না। খোকার ছানা থেকে অবশ্য জল বার হতে লাগল। তা দেখে কুঁকড়ো ঠকঠক কারে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'বাবা গো! আমি এই বেলা পালাই। এই খোকার বাবা এলে আমাকে আস্ত রাখবে না। আমার খালি দেখতে ইচ্ছে করছে যে এই খোকার দাঁতগুলো কেমন, যা দিয়ে সে ঐ পিঠেগুলো খায়।'

for more books visit www.rashal.com

এই বলে সে তাড়াতাড়ি গিয়ে যেই 'খোকা'র মুখে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছে, অমনি খোকাও কটাস করে তার সব- কটি আঙুল একেবারে গোড়াসুদ্ধ কামড়িয়ে নিয়েছে, সেই আঙুলেই নাকি ছিল কুঁকড়োর জোর, কাজেই সে আঙুল কাটা যেতে হায় হায় করে মাটিতে পড়ে গেল। 'খোকা'ও তখন লাফিয়ে উঠে তার সেই দেড়শো হাত লম্বা শালের ছড়িগাছি দিয়ে তার হাড় ভাঙতে আর কিছুমাত্র দেরি করল না।

পণ্ডিতের কথা

সেই যে হবুচন্দ্র গবুচন্দ্র মন্ত্রী ছিল, সেই হবুচন্দ্র রাজার একটা ভারি জবর পণ্ডিতও ছিল। তার এতই বুদ্ধি ছিল যে, তার পেটে অত বুদ্ধি ধরত না। তাই তাকে দিন রাত নাকে কানে তুলোর টিপ্‌লী গুঁজে বসে থাকতে হত, নইলে বুদ্ধি বেরিয়ে যেত। তুলোর টিপ্‌লী গুঁজত বলে নাম হয়েছিল 'টিপ্‌লী' পণ্ডিত।

একদিন হয়েছি কি, হবুচন্দ্রের দেশের জেলেরা একটা এঁদো পুকুরে জাল ফেলতে গিয়েছে। সেই পুকুর কোত্থেকে একটা শূয়র এসে ঝাঁঝি পাটার ভিতরে গা ঢাকা দিয়েছিল। জেলেরা জাল ফেলতেই সে গিয়েছে তার মধ্যে আটকে, তারপর জাল টেনে তুলে সেই শূয়র দেখতে পেয়েই ত জেলেরা ভারি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে। তাদের দেশে আর কেউ কখনো এমন জানোয়ার দেখে নি। তারা কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারল না, এটা কি জানোয়ার। তারা জাল দিয়ে কত বড় বড় শাল, বোয়াল, কচ্ছপ ধরেছে, কিন্তু এমন জানোয়ারের কথা ত কখনো শোনে নি। যা হোক তারা ঠিক করল যে রাজা হবুচন্দের সভায় নিয়ে এটাকে দেখাতে হবে। এই বলে সেই শূয়রটাকে খুব করে জাল দিয়ে জড়িয়ে তারা রাজার সভায় নিয়ে এল। রাজা তার ছটফটি দেখে দেখে আর চ্যাঁচানি শুনে বললেন, 'বাপ্ রে। এটা-আবার কি জন্তু?' সভার লোকেরা কেউ সে কথার উত্তর দিতে পারল না। যে-সব পণ্ডিত সেখানে ছিল, তারা দু দল হয়ে গেল। কয়েকজন বললে, 'গজয়', অর্থাৎ হাতি ছোট হয়ে গিয়ে এমন হয়েছে। কেউ বললে, 'মূষা বৃদ্ধি', অর্থাৎ ইঁদুর বড় হয়ে এমনি হয়েছে। এখন এ কথার বিচার টিপাই ছাড়া আর কে করবে? কাজেই রাজা তাকে ডেকে পাঠালেন। টিপাই এসে অনেকক্ষণ ধরে সেই শূয়রটাকে দেখ বলল, 'আরে তোমরা কেউ কিছু বোঝ না। এটাকে জলে ছেড়ে দাও। যদি ডুবে যায়, তবে এটা মাছ। যদি উড়ে পালায় তবে পানকৌড়ি। আর যদি সাঁতরে ডাঙ্গায় ওঠে, তা হলে কচ্ছপ, না হয় কুমির।' তখন সভার লোকেরা ভারি খুশি হয়ে বলল, 'ভাগ্যিস টিপাই মশাই ছিলেন, নইলে এমন কথা আর কে বলতে পারত।'

আমরা ছেলেবেলায় এই টিপাইয়ের গল্প শুনতাম।এইরূপ এক-একটা পণ্ডিত বা পাড়াগেঁয়ে বুদ্ধিমানে গল্প অনেক দেশেই আছে, তার দু-একটি নমুনা শোন।

টিপাইয়ের যে ছেলে, সেও বড় হয়ে তার বাপের মতন বড় পণ্ডিত হয়েছিল। তার গ্রামের লোকেরা একটা কিছু জানতে হলেই তার কাছে আসত। এর মধ্যে একদিন রাত্রে তাদের গ্রামের ভিতর দিয়ে একটা হাতি গিয়েছে। ভাবনা হল, না জানি এ-সব কিসের দাগ, আর না জানি তাতে কি হবে। তারা এর কিছুই বুঝতে না পেরে শেষে টিপাইয়ের ছেলেকে নিয়ে এল। সে এসে অনেক ভেবে বলল, 'ওহ্! বুঝেছি রাত্রে চোর এসে উঘ্‌লি নিয়ে গেছে। সে বেটা বারবার বসেছিল, তাইতে উঘ্‌লির তলায় দাগ পড়েছে।'

কাশীর ওদিকে এমনি একটা পণ্ডিতের গল্প আছে, সেই পণ্ডিতের নাম ছিল 'লাল বুঝগ্‌র।'

সে এমনি হাতির পায়ের দাগ দেখে বলেছিল-

'লাল বুঝগ্‌গর সব সম্‌ঝো আউর না সমঝো কোই,
চার পয়ের মে চক্‌কর বাঁধকে হরণা কূদে হোই।'

অর্থাৎ লাল বুঝগ্‌গর সব বুঝতে পারে, আর কেউ বুঝতে পারে না; চার পায়ে জাঁতা বেধে হরিণ ছুটে গিয়েছে।

তুরস্ক দেশেও এমনি একটি বেজায় বুদ্ধিমান লোক ছিল। একবার একটা উট দেখে একজন তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'মশায়, এটা কি জন্তু?' বুদ্ধিমান বললে, 'তাও জান না? খরগোশ হাজার বছরের বুড়ো হয়েছে, তাইতে তার এমনি চেহারা হয়ে গিয়েছে।' কথাটা কিন্তু নিতান্ত মন্দ বলে নি, খরগোশ যদি হাজার বছর বেঁচে থাকতে পারত, আর সেই হিসাবে তার নাক তুবড়ে গাল বসে মুখ লম্বা হয়ে আসত, তবে তার অনেকটা উটের মত চেহারা হত বইকি!

for more books visit www.rashan.com

পাঞ্জাবে এক বুদ্ধিমান বুড়োর কথা আছে, সে বেশ মজার। গ্রামের মধ্যেই সেই লোকটি সকলের চেয়ে বুড়ো আর বুদ্ধিমান, আর সব বড্ড বোকা। একদিন রাত্রে সেই গ্রামের ভিতর দিয়ে একটা উট গিয়েছিল। সকালে উঠে তার পায়ের দাগ দেখে কেউ বুঝতে পারছে না যে, কিসের দাগ। শেষে তারা সেই বুড়োর কাছে গিয়ে বলল, 'দেখ ত এসে বুড়ে দাদা, এ-সব কিসের দাগ?' বুড়ো দাদা সঙ্গে সঙ্গে এসে এই উটের পায়ের দাগগুলো দেখে খানিক হাউ হাউ কাঁদল, তারপর হিহি হিহি করে হেসে ফেলল। তাতে সকলে ভারি আশ্চর্য হয়ে বললে, 'তুমি কাঁদলে কেন দাদা?' বুড়ো বললে, 'কাঁদব না? হায় হায়। আমি মরে গেলে তোরা কার ঠেঞে এ-সব কথা জিজ্ঞেস করবি?' তাতে সকলে ভারি দুঃখিত হয়ে বলরে, 'আহা, টিক বলেছ দাদা। তুমি না থাকলে আর কাকে জিজ্ঞাসা করব? তুমি আবার হাসলে কেন?' বুড়ো বলল, 'হাসব না? হাঃ হাঃ হা-হা-আ-আ, আরে আমিও যে বুঝতে পারলুম না, এ ছাই কিসের দাগ। হাঃ হাঃ হা-হা-আ-আ-আ।'

আর দু-ভাইয়ের কথা বলে শেষ করি। এক গ্রামে অনেক চাষা ভুষো থাকে, তাদের সকলের কিছু কিছু টাকা কড়ি আছে, কিন্তু তাদের কেউ কখনো লেখাপড়া শেখে নি। সেজন্য তারা বড়ই দুঃখিত। একদিন তারা সবাই মিলে যুক্তি করল, 'চল আমরা দুটি ছেলেকে শহরে পাঠিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে আনি। আমাদের গ্রামে একটাও পণ্ডিত নেই, কেমন কথা?' এই বলে তারা তাদের গ্রামের মোড়লের দুটি ছেলেকে শহরে পাঠিয়ে দিল। তাদের বলে দিল, 'তোরা বিদ্যে শিখে পণ্ডিত হয়ে আসবি।'

তারা দু ভাই শহরে চলেছে, পথে পাশে যা কিছু দেখছে, কোনটারই খবর নিতে ছাড়ছে না। এক জায়গায় গাছতলায় একটা হাতি বাঁধা ছিল, তাকে দেখে তারা ভারি আশ্চর্য হয়ে পথের লোককে জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কি ভাই?' তারা বলল, 'এটা হাতি।' তা শুনে দু ভাই ভারি খুশি হয়ে বলল, 'বাঃ এরি মধ্যে ত এক বিদ্যা শিখে ফেলুলম-হাতি, হাতি হাতি।'

তারপর শহরের কাছে এসে মন্দির দেখতে পেয়ে তারা একজনকে জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কি ভাই সে বলল, 'এটা মন্দির।' তাতে দু ভাই বলল, 'মন্দির মন্দির, মন্দির, বাঃ, আরেক বিদ্যে শেখা হল।'

বলতে বলতে তারা বাজারের ভিতর দিয়ে চলেছে। বাজারে মাছ, তরকারি, ডাল, চাল সবই আছে, আর সবই তারা চেনে, খালি আলু আর কখনো দেখে নি। সেই জিনিসটার দিকে তারা অনেকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল, তারপর আলুওয়ালাকে জিজ্ঞাস করল, 'এগুলো কি ভাই?' সে তাতে রেগে বলল, 'কোথাকার বোকা? এ যে আলু তাও জান না?' তারা দু ভাই সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে খালি বলতে লাগল, 'আলু, আলু, আলু।' তখন তাদের মনে হল 'ইস, আমরা কত বড় পণ্ডিত হয়ে গেছি, একটা বিদ্যে শিখলেই তাকে পণ্ডিত বলে। আর আমরা দেখতে দেখতে তিনটে বিদ্যে শিখে ফেললুম। আর কি, এখন দেশে ফিরে যাই।'

কাজেই তারা গ্রামে ফিরে এল। তারপর থেকে তারা পালকি ছাড়া চলে না, গ্রামের লোক তাদের দেখলেই দণ্ডবৎ করে আর বড় বড় চোখ করে বলে 'বাপ রে, তিন মুখো পণ্ডিত হয়ে এসেছে।' এমনি করে কয়েক বছর চলে গেল। তারপর একদিন হয়েছে কি, সেই গ্রামে কোত্থেকে এসেছে এক হাতি। গ্রামের লোক তাকে দেখেই ত আগে ছুটে পালাল। তারপর অনেক দূর থেকে উঁকি ঝুঁকি মেরে তাকে দেখতে লাগল, কিন্তু কেউ বলতে পারল না, এটা কি। শেষে একজন বলল, 'শিগ্‌গির পণ্ডিতমশাইদের ডাক।' তখনি পালকি ছুটল পণ্ডিতদের আনতে। তারা এসে চশমা এঁটে অনেকক্ষণ ধরে হাতিটাকে দেখল, বড় ভাই বলল, 'এটা মন্দির।' ত শুনে ছোট ভাই বলল, 'দাদার যে কথা! এত টাকা দিয়ে বিদ্যে শিখে এসে শেষে কিনা বলছে, এটা মন্দির। আরে না না, এ মন্দির। আরে না না, এ মন্দির নয়, এটা আলু। আলু।'

for more books visit www.rashal.com

গল্প-সল্প

১

যদু যেমন ষণ্ডা ছিল, সে খেতেও পারত তেমনি। যখন সে খুব ছোট সে খুব ছিল, একদিন সে গেল এক বড়লোকের বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে। ভারি ভারি খাইয়ে সব সেখানে খেতে বসেছে, লুচি কোরমার ধুম লেগে গেছে। খাইয়েরা খুব খেতে পারাটাকে বড়ই বাহাদুরি মনে করে। তাই খাওয়া শেষে হবার সময় তারা বললে, 'আচ্ছা, আজ কে সকলের চেয়ে বেশি খেয়েছে?' এ কথায় কেউ বলছে, 'আমি!' আর কেই বলছে, 'না আমি! ত শুনে যারা পরিবেশেন করছিল তাদের একজন বলল, 'আজ্ঞে না; সকলের চেয়ে বেশি খেয়েছে এ ছেলেটি (মানে, যদু)।' সে 'এতগুলো' লুচি আর 'এত টুকরো' কোরমা খেয়েছে।

সকলে তাতে ভারি আশ্চর্য হয়ে যদুকে জিজ্ঞেসা করল, 'হ্যাঁ রে, সত্যি নাকি তুই এত খেয়েছিস?' যদু বলল, 'খেয়েছি বৈকি। আরো খেতে পারি!' তা শুনে সবাই বলল, 'বটে? আচ্ছা আন্ দেখি লুচি কোরমা, দেখি ও আর কত খেতে পারে।' শুনেছি তখন নাকি যদু আরো এক দিস্তা (চব্বিশখানা) লুচি আর আঠার টকুরো কোরমা খেয়েছিল। সত্যি মিথ্যে ভগবান জানেন, আমার তখন জন্ম হয় নি। এত খেয়েও যে যদুর পেট ভার হয়েছিল তা মনে করো না। সে তখনি সুপারির ডালের ঘোড়া হাঁকিয়ে বাড়ি এল, এসে কালোজাম গাছে উঠে আরো অনেকগুলো কালোজাম খেল।

২

এ হল বহুকালের কথা। তখন 'খাইয়ে' বললে ভারি একটা গৌরবের কথা হত। সে সময় এক ব্রাহ্মণ এই বাহাদুরির লোভে মারাই গিয়াছিলেন। কোন বড়লোকের বাড়িতে তাঁকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করে, তাঁর যা ইচ্ছা, যত খুশি খেতে দেওয়া হত। একদিন সেখানে খেতে বসে বললেন, 'আজ আমি শুধু ছানা আর চিনি খাব।' তাই তাকে এনে দেওয়া হল। তিনি তখন সাতসের ছানা চেঁছেপুছে শেষ করে, বিস্তর বাহদুরি পেয়ে, বাড়ি এসে সেই রাত্রেই পেট ফেঁপে মরা গেলেন।

আর-একটি ভটচাজ্জি মশায়েরও বিষয়ে খুব নাম ছিল। সকলে যখন তাঁর খাওয়া দেখে আশ্চর্য হত, তখন তিনি নিজের কপালে টোকা দিয়ে বলতেন, 'দেখছ কি? এই টুকু নিরেট, আর সব পেট।'

৩

একটি ছেলের মনটি বড় ভাল, কিন্তু স্বভাবটি একটু পাগলাটে গোছের। সে একদিন রাত্রে এক জায়গায় গিয়েছিল-পূজা দেখতে। ঢুকবার সময় তার বুট জোড়াটি বাইরে রেখে গিয়েছিল, ফিরে এসে দেখে, কে তা নিয়ে গেছে। ছেলেটি ত তাতে হেসেই অস্থির। সে বলল, "বেটা ভারি ঠকেছে, পুরনো জুতো চুরি করেছে, দু মাসও পায়ে দিতে পারবে না।" যা হোক এখন বাড়ি ফিরে ত যেতে হবে, কাজেই শুধু পায়ে হেঁটে, ট্রাম ধরবার জন্য হেদোর ধারে এসে উপস্থিত হল। সেখান থেকে তার বাড়ি পঁচিশ মিনিটের পথ-পটলডাঙ্গায়। সে হেদোয় এসেই ট্রাম পেয়েছিল, কিন্তু তখন সে ভাবল, এখান থেকে উঠে কেন নাহক ঠকি। সেই ছ'পয়সাই ত দিতে হবে,-আমি শ্যামবাজারে গিয়ে ট্রাম ধরে পয়সা আদায় করে নেব। বলে সে ত সেই শুধু পায়ে হেঁটে হেঁটে গিয়ে শ্যামবাজারে আড্ডায় উপস্থিত হয়েছে। সেখানে দিয়ে সে শুনল যে সেদিন আর ট্রাম পাওয়া যাবে না। হেদোর ধারে যেখানা সে পেয়েছিল, সেই ছিল শেষ গাড়ি! সেদিন সে বাড়ি ফিরে এলে পর তার হাসির চোটে বাড়িসুদ্ধ লোকের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।

৪

বাংলা অক্ষরে, যেমন অন্য-সব ভাষায় সকল কথা লেখা যায়-যেমন 'আই গো আপ', কিংবা কোন নাম যেমন 'লর্ড কারমাইকেল', 'জেমস ওয়াট', সেরকম কিন্তু সব ভাষায় চলে না। চীনা ভাষায় এক একটি অক্ষরের এক একটি কথা। একজন বাঙালি বাবু একজন চীনা ভদ্রলোককে বললেন, 'আপনি আপনাদের ভাষার অক্ষরে আমার নাম লিখুন ত। আমার নাম 'ধ্রুব'। চীনা ভদ্রলোকটি অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে কতকগুলি হিজিবিজি কি যেন লিখলেন। সেই লেখা অন্য একজন চীনা ভদ্রলোককে পড়তে দেওয়া হল। সে বলল, 'এতে লেখা রয়েছে- দু-লুফা।' একজন জাপানী ভদ্রলোক ট্রাফালগারের সম্বন্ধে জাপানীভাষায় কি যেন লিখছিলেন। তাঁর লেখার মধ্যে যেখানে ট্রাফালগার কথাটা আছে, সেটা তিনি ইংরেজীতেই লিখছিলেন। একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি ও কথাটা ইংরেজীতে লিখলেন যে?' জাপানী ভদ্রলোক বললেন, 'আমাদের ভাষার অক্ষর দিয়ে ট্রাফালগার লেখা যায় না, সবচেয়ে কাছাকাছি যা লেখা যায়, তার উচ্চারণ হচ্ছে- ত্রা-ফারু-গারু'।

৫

এক সাহেবের বড় বাংলা শেখবার শখ হল। তিনি এক পণ্ডিত রেখে খুব উৎসাহের সঙ্গে পড়তে আরম্ভ করলেন। গোড়ায় কয়েকদিন বেশ উৎসাহের সঙ্গে পড়া চলল; কিন্তু যখন যুক্ত অক্ষর পড়া আরম্ভ হল, তখনি ত সাহেবের যত গোল বাধল। তিনি যুক্ত অক্ষর দেখে ত চটেই অস্থির, 'কি! একটা অক্ষরের ঘাড়ে আর একটা অক্ষর। এমন আজগুবি ভাষাও ত দেখি নি। এমন ভাষাও আবার ভদ্রলোকে পড়ে! মানুষের ঘাড়ে মানুষ, আর অক্ষরের ঘাড়ে অক্ষর, এ কেবল তোমাদের দেশেই সম্ভব।

for more books visit www.rashal.com

৬

এক চাষার একটু বুদ্ধি কম ছিল। চাষা মাঠে যাবে কাজ-করতে, সারাদিন ত সেখানে থাকতে হবে, তাই তার স্ত্রী বিকালে জলখাবারের জন্য তার কাপড়ে দশখানা চাপাটি বেঁধে দিল। চাষা ভারি পেটুক ছিল। সে মাঠে যেতে না যেতেই ভাবল, 'উঃ! আমার দেখছি, এক্ষুনি বড্ড খিদে পেয়েছে, চাপাটি খাব নাকি! না, তা হলে বিকালে খাব কি?'

খানিক বাদে সে ভাবল, 'উঃ। বড্ড খিদে পেয়েছে, একখানা চাপাটি খাই, বাকি বিকালে খাব।' ভাবল 'আর একখানা খাই।' যত খায়, ততই তার খিদে যেন বেড়ে যায়। একখানা দুখানা করে সে আটখানা খেয়ে ফেলল, তবুও তার পেট ভরল না। শেষে বাকি দুখানও বার করে খেতে হল, তার তাতে তার পেটও ভরে গেল।

তখন চাষা ভাবল, 'আটটা খেলাম, তাতে কিছু হল না, আর এ দুটো খেতে না খেতেই পেট ভরে গেল। আহা! এ দুখানা কেন আগে খেলুম না, ত হলে ত গোড়াতেই পেট ভরত, আর আমার কোঁড়ে আটখানা চাপাটি থেকে যেত। তাইত, আমি কি বোকা!'

৭

এক ভদ্রলোকের বাড়িতে ভোজ হচ্ছে। একদল গুলিখোর তাই শুনে সেখানে নিমন্ত্রণ খেতে চলল। যেতে যেতে তাদের একজন বলল, 'আরে, তোরা যে যাবি, ফটক শুনেছি বড্ড নিচু-ঢুকবি কি করে?'

তা শুনে আরেকজন বলল, 'কেন? এমনি করে ঢুকব!' বলেই সে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে আরম্ভ করল। তা দেখে আর সবকটাও তেমনি করে হামাগুড়ি দিতে লাগল।

এইভাবে ত তারা গিয়ে ভোজের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছে, আর অমনি যমদূতের মতন চারটে দারোয়ান এসে তাদের ঘাড়ে চেপে ধরেছে। তখন সেই প্রথম গুলিখোরটা ভারি গম্ভীর হয়ে মোটা গলায় বলল, 'এখন দেখ্ দেখিনি? আমি বলেই ছিলাম, যে, ফটক নিচু, আটকাবে!'

৮

একটি মাসে দশটি টাকার কমে একটি স্কুলের ছেলের খাওয়া চলে না। আমাদের ছেলেবেলায় আমার চাকরকে দু'পয়সা করে দিয়েছি। তাতেই সে আমাদের দুবেলা খেতে দিয়েছে। আমি কিন্তু হিসাব-কিতাবের কথা বলতে যাচ্ছি না, আমি সেই চাকরটির কথা বলছি। তার নাম-আমরা তার সাক্ষাতে বলতাম 'কালী', অসাক্ষাতে বলতাম 'কেলে'। দুপয়সায় দুবেলা মাছ, তরকারি, ডাল, ভাত পেট ভরে খেতে দিতে হবে। কেলে তা ত দিতই, আবার তার উপরে ঢের লাভ করে নিতেও ছাড়ত না। তার লাভের চোটে আমাদের পেট চোঁ চোঁ করত।

বাজারে যতরকমেরই মাছ উঠুক, কেলে আনে শুধু বাটা। ছ-আঙুল লম্বা একটি মাছ, তাকেই দুভাগ করে একজনকে দেয় ল্যাজা, আর-একজনকে দেয় মুড়ো। যে ল্যাজা পায়, তার তবু দুগ্রাস খাওয়া চলে। কিন্তু যে মুড়া পায়, সে বেচারার খালি চোষাই সব।

মাছ পাতে পড়তেই ছেলেরা একজন আর একজনকে ডেকে খবর নেয়, কার ভাগে কি জুটেছে, কিন্তু সে কথা কেউ বাংলাতে বলতে ভরসা পায়না। কেলের মেজাজটা বেজায় বেয়াড়া আর মুখটা অতি অসভ্য। ছেলেরা তাই ইংরেজীতে বলে 'কি হে, হেড না টেইল?' একদিন একজনের পাতে পড়েছে 'ল্যাজা, সে ভুলে বলে ফেলেছে 'হেড'। অমনি কেলে বিষম দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'কি? তোমাকে দিলাম টেইল, আর তুমি যে বললে হেড?'

সেদিন খাওয়া দাওয়ার পর ছেলেরা ঘরে এসে বলতে লাগল, 'নাঃ, বেটাকে জব্দ করতে না পারলে আর চলছে না। ইংরেজিতে কথা বলব, তাও দুদিন শুনেই বুঝে নেবে, একি সহ্য হয়?' তখন এই যুক্তি হল যে, তরকারি যতই কম হোক, সবাই মিলে কষে ভাত খেয়ে কেলেকে নাকাল করবে।

for more books visit www.rashal.com

বারজনের রান্না হয়, সেদিন রাত্রে পাঁচজনেই তার সব চেঁছেপুছে খেয়ে বসে আছে, আবার বলছে 'আরও দাও'! হাড়ি পানে চেয়ে কেলের মুখ শুকিয়ে গেছে, কিন্তু আর উপায় কি? পেট ভরে খেতে দিতেই হবে। সে বেলার কাজ শেষে দই চিড়ে এনে চালাতে হয়েছিল। কাজেই লাভ যা হয়েছিল, তা উলটা বাগে।

তার পরদিন কেলে আগে ভাগেই সাবধান হয়ে ঢের বেশি ভাত রেঁধেছিল। কিন্তু সবাই বললে, 'আজ আমাদের খিদে নেই।' কাজেই কেলের অনেক ভাত লোকসান হল। এমনি ভাবে দিন তিনেক যেতেই কেলে বেশ বুঝতে পারল যে ছেলেদের খুশি না রাখতে পারলে লাভের অংশ খুবই কম। তারপর থেকেই দেখা গেল কেলের মেজাজটিও একটু নরম, কথাবার্তাও কতকটা ভাল।

তারপর?

এক যে রাজা; তার ভারি গল্প শোনার শখ। কিন্তু তা থাকলে কি হয়, রাজামশাইকে কেউ গল্প শুনিয়ে খুশি করতে পারে না।

রাজামশাই বলরেন, 'যে আমাকে গল্প গুনিয়ে খুশি করতে পারবে, তাকে আমার অর্ধেক রাজ্য দিব, না পারলে কান কেটে নিব'। তা শুনে দেশ বিদেশের কত ভারি ভারি নামজাদা গল্পওয়ালা কোমর বেঁধে গোঁফে তা দিয়ে গল্পের ঝুড়ি নিয়ে আসে কিন্তু কেই রাজামশাইকে খুশি করতে পারে না। যাবার সময় সকলেই কাটা কান নিয়ে দেশে যায়।

গল্প বলতে গেলেই রাজামশাই খালি বলেন, 'তারপর? 'তারপর' তারপর' করে গল্পওয়ালার দফা শেষ করে তবে তিনি ছাড়েন। 'রাক্ষস মরে গেল'-'তারপর?' 'রাজপুত্র বেঁচে গেলেন'-'তারপর? 'বৌ নিয়ে দেশে এলেন'-তাপর?'-'ভারি আনন্দ হল'-'তারপর?' 'আমার কথা ফুরল।' 'তারপর? 'নটে গাছটি মুড়ুল'-'তারপর?' এমনি করে আর কত বলবে? কাজেই শেষে একবার তাকে বলতে হয় 'আর আমি জানি না' 'আর আমি জানি না' বা 'আর বলতে পারছি না।' তা হলেই রাজা বলেন 'তবে গল্প বলতে এসেছিলে কেন? কাট তবে বেটার কান।'

এই ত ব্যাপার। রাজামশাইয়ের তারপরের শেষও কেউ করে উঠতে পারে না, অর্ধেক রাজ্য পায় না, লাভে মধ্যে কানটি যায়।

সেই দেশে থাকে এক নাপিত। সে বড্ড কুঁড়ে, কিন্তু ভারি সেয়ানা। সে ভাবল, অর্ধেক রাজ্য যদি পাই, তবে নেহাৎ মন্দ হবে না। একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি? না হয় কান কাটা যাবে।

এই বলেই সে জামা জোড়া পরে বলল, 'মহারাজের জয় হোক। হুকুম হয় ত কিছু গল্প শোনাই।' রাজা বলেলন, 'ভাল, ভাল। কিন্তু আমার সর্ত জান ত, খুশি করতে পারলে অর্ধেক রাজ্য দিব, না পারলে কানটি কেটে নিব।'

নাপিত বলল, 'আমার গল্পের আগাগোড়া শুনতে হবে, মাঝখানে থামতে বলতে পারবেন না।' রাজা বললেন 'তাই সই, আমি ও ত তাই চাই।'

তখন নাপিত চাকর মহলে দিয়ে আচ্ছা করে ছিলিম আট দশ তামাক টেনে এসে খুব গম্ভীর হয়ে বলতে লাগল-'মহারাজ, এখান থেকে অনেক দূরে এক আজব দেশ আছে।' অমনি মহারাজ বললেন, 'তারপর?'

সেইখানে অনেকদিন আগে ভারি নামজাদা একা রাজা ছিলেন।-তারপর?

তার রাজ্যের একধার থেকে আরেক ধার যেতে ছ'মাস লাগত।-তারপর?

আর সে রাজ্যের মাটি যে কি সরেস ছিল, কি বলব?-তারপর?

তাতে একসের ধান বুনলে, দশমন ধান পাওয়া যেত।-তারপর?

for more books visit www.rashal.com

তাই দেখে রাজামশাই তাঁর রাজ্যের সকল জমিতে ধানের চাষ করালেন।-তারপর?

আর তাতে ধান যা হল। সে ধান রাখবার জন্য যে গোলা তয়ের হয়েছিল, তার একধারে দাঁড়ালে আর এক ধার দেখা যেত না।-তারপর?

লাখে লাখে মোষের গাড়ি লেগেছিল সে ধান গোলায় আনতে। এত বড় গোলা একেবারে বোঝাই হয়ে গিয়েছিল, আর-একটু হলেই ফেটে যেত।-তারপর?

তারপর সেই ধানের খবর পেয়ে পঙ্গপাল যা এল! পঙ্গাপালে দশদিক ছেয়ে গেল। আকাশ অকার, হওয়া চলবার জো নাই, শ্বাস টানলে ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল নাকে ঢোকে।-তারপর? তারপর?

বেটারা এসেছে ধান খেতে। কিন্তু রাজামশায়ের গোলা কি যেমন তেমন করে গড়া? পঙ্গপালের সাধ্যি কি, তাতে ঢুকবে? দশদিন বেটারা বন্ বন্ করে গোলার চারধারে ঘুরে বেড়াল, বেড়ার কোনখানে একটা বিঁধ বার করতে পারল না। -তারপর? তারপর?

তারপর এগার দিনের দিন কয়েকটা ডানপিটে ছোকরা পঙ্গপাল খুঁজে খুঁজে কোত্থকে গিয়ে একটা বিঁধ বার করেছে, অনেক ঠেলাঠেলি করলে তা দিয়ে ভিতরে ঢোকা যায়।-তারপর? তারপর?

তখন তাদের পালের গোদাটা এসে সেইবিঁধের মুখে বসে বলল, ঠ্যাল্ ত রে বাপু-সকলে তোরা সবাই মিলে, দেখি, ভিতরে ঢুকতে পারি কি না।।-তারপর?

তারপর,ওঃ সে কি বিষম ঠেলাঠেলি! গোদা বেটা চ্যাপ্টা হয়ে গেল, তবু বলল 'ঠ্যাল, ঠ্যাল্।'-তারপর?

শেষে অনেক কষ্টে, অর্ধেক ছাল বাইরে রেখে তবে গিয়ে ভিতরে ঢুকল-তারপর?

ঢুকে একটি ধান মুখে করে নিয়ে, বিঁধের কাছে এসে বলল, এবারে আমাকে টেন বার কর।-তারপর?

ওহ! সে কি টানাটানি! আর-একটু হলেই বেটা ছিঁড়ে যেত যা। যা হোক অনেক কষ্টে সে ধানটি নিয়ে বাইরে এল।-তারপর?

তারপর আর-একটা বেটা গিয়ে বসেছে সে বিঁধের মুখে, আর তেমনি ঠেলাঠেলির পর ভিতরে ঢুকছে, আর একটি ধান নিয়ে তেমনি টানাটানির পর বাইরে এসেছে।-তারপর?

তারপর আরেক বেটা।-তারপর? আরেক বেটা।-তারপর? আরেক বেটা। তারপর? আরেক বেটা।-

রাজামশাই যতই বললেন, 'তারপর? নাপিত ততই খালি বলে, আরেক বেটা।

দণ্ডের পর দণ্ড এইভাবে গেল, রাজামশাই ব্যস্থ হয়ে উঠছেন। কিন্তু না শুনে উপায় নাই। বলেছেন আগা-গোড়া শুনবেন, থামিয়ে দিতে পারবেন না। সন্ধ্যার সময় রাজামশাই আর থাকতে না পেরে বললেন, 'আরে, আর কত বলবে? এখানো কি শেষ হল না?'

নাপিত জোড়হাতে বলল, 'সে কি মহারাজ? সবে ত আরম্ভ। গুটি কয়েক পঙ্গপাল সবে গুটি কয়েক ধান নিয়েছে। এখনো গোলা ধানে বোঝাই, আকাশ পঙ্গপালে অন্ধকার।'

কাজেই আর কি করা যায়? আরও দুদিন বসে পঙ্গপালের কথা শুনলেন। তারপর আর কিছুইতেই থাকতে না পেরে, কেঁদে বললেন, 'আমার ঢের হয়েছে বাবা, অর্ধেক রাজ্য নেও, নিয়ে আমাকে ছেড়ে দাও, আমি একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।'

তখন নাপিতের খুব মজাই হল।

for more books visit www.rashal.com

ভুতো আর ঘোঁতো

ভুতো ছিল বেঁটে আর ঘোঁতো ছিল ঢ্যাঙা। ভুতো ছিল সেয়ানা, আর ঘোঁতো ছিল বোকা। দুজনে মিলে গেল কুলগাছ থেকে কুল পড়াতে। ঘোঁতো কিনা ঢ্যাং, সে দুহাতে থালি কুলই পাড়ছে। ভুতো কিনা বেঁটে, তাই সে কুল নাগাল পায় না, সে শুধু ঘোঁতোর পাড়া কুল খাচ্ছে।

কুল পাড়া হয়ে গেলে ঘোঁতো বলল, 'কুল কইরে?' ভুতো বলল, 'নেই। খেয়ে ফেলেছি।' ঘোঁতো বলল, 'বটে রে? তবে দাঁড়া লাঠি আনছি।'

বলেই অমনি ঘোঁতো গেল গাছ কাটতে। গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে। লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে। সে কেন কুল খেয়ে ফেলল-একটাও রাখল না?

গাছ বলল, 'এই যে ঘোঁতো। কেমন আছ? কোথা যাচ্ছ?' ঘোঁতো বলল, 'গাছ কাটতে; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে; সে কেন কুল খেয়ে পেলল, একটাও রাখল না?' গাছ বলল, 'আমাকে কাটবে? কি দিয়ে কাটবে? কুড়ুল কই?

ঘোঁতো গেল কুড়ুল আনতে। কুড়ুল বলল, 'এই যে ঘোঁতো? কেমন আছ? কোথায় যাচ্ছ?' ঘোঁতো বলল, 'কুড়ুল আনতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে; লাঠি দিয়ে ভূতোকে মারতে; সে কেন কুল খেয়ে ফেল, একটাও রাখল না?' কুড়ুল বলল, 'আমাকে নেবে? শানাবে কিসে? পাথর কই?'

ঘোঁতো গেল পাথর আনতে। পাথর বলল, 'এই যে ঘোঁতো! কেমন আছ? কোথায় যাচ্ছ?' ঘোঁতো বলল, 'পাথার আনতে; আথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে, লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে; সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না?' পাথর বলল, 'আমাকে নেবে? ভেজাবে কি দিয়ে? জল কই?'

ঘোঁতো গেল জল আনতে। জল বলল, 'এই যে ঘোঁতো। কেমন আছ? কোথা যাচ্ছ?' ঘোঁতো বলল, 'জল আনতে; জল দিয়ে পাথর ভেজাতে; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে; লাঠি ভুতোকে মারতে, সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না?' জল বলল, 'আমাকে নেবে? হরিণ আসবে, আমাতে নামবে, গা ভিজবে, তবে ত হবে।'

ঘোঁতো গেল হরিণের কাছে হরিণ বলল, 'এই যে ঘোঁতো, কেমন আছ? কোথায় যাচ্ছ?' ঘোঁতো বলল, 'হরিণ দিয়ে জল তোলাতে; জল দিয়ে পাথর ভেজাতে; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে; সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না?' হরিণ বলল, 'আমাকে নেবে? কুকুর কই? আমাকে ধরবে কে?'

ঘোঁতো গেল তাদের কুকুর ভোলাকে ডাকতে। ভোলা বলল, 'এই যে ঘোঁতো! কেমন আছ?' ঘোঁতো বলল, 'ভোলাকে ডাকতে; ভোলাকে দিয়ে হরিণ ধরাতে; হরিণ দিয়ে জল তোলাতে; জল দিয়ে পাথর ভেজাতে; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে ; সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না?' ভোলা বলল, 'আমাকে নেবে? তবে মাখন আনো, নখে মাখি।'

ঘোঁতো গেল মাখন আনতে। মাখন বলল, 'এই যে ঘোঁতো! কেমন আছ? কোথায় যাচ্ছ?' ঘোঁতো বলল, 'মাখন আনতে, ভোলাকে দিতে, নখে মেখে হরিণ ধরতে; হরিণ দিয়ে জল তোলাতে; জল দিয়ে পাথর ভেজাতে; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে; সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না?' মাখন বলল, 'আমাকে নেবে? তবে বেড়াল আনো, চেটে তুলুক।'

ঘোঁতো গেল তাদের মেনির কাছে। মেনি বলল, 'এই যে ঘোঁতো! কেমন আছ! কোথায় যাচ্ছ? ঘোঁতো বলল, 'মেনিকে খুঁজতে, মাখন চেটে ভোলাকে দিতে, নখে মেখে হরিণ ধরতে, হরিণ দিয়ে জল তোলাতে; জল দিয়ে পাথর ভেজাকে; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে; গাছ দিযে লাঠি বানাতে; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে; সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না? মেনি বলল, আমকে নেবে? দুধ দাও তবে, খাই আগে।'

for more books visit www.rashar.com

ঘোঁতো গেল গাইয়ের কাছে। গাই বলল, 'এই যে ঘোতো! কেমন আছ? কোথায় যাচ্ছে?' ঘোঁতো বলল, 'গাইয়ের কাছে দুধ আনতে; মেনির তা খেয়ে মাখন চেটে ভোলাকে দিতে, নখে মেখে হরিণ ধরতে; হরিণ দিয়ে জল তোলাতে; জল দিয়ে পাখর ভেজাতে; পাখর দিয়ে কুড়ুল শানাতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে; সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না?' 'দুধ নেবে? খড় আনো তবে, খাই আগে!'

ঘোঁতো গেল চাষার কাছে। চাষা বলল, 'এই যে ঘোঁতো! কেমন আছ? কোথায় যাচ্ছ! ঘোঁতো বলল, চাষার কাছে খড় আনতে; গাইকে দুধ পেতে, মেনি খেয়ে মাখন চেটে ভোলাকে দিতে, নখে মেখে হরিণ ধরতে; হরিণ দিয়ে জল তোলাতে; জল দিয়ে পাখর ভেজাতে; পাখর দিয়ে কুড়ুল শানাতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে। সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না?' চাষা বলল, 'খড় নেবে? আটা আনো, পিঠে খাব।'

ঘোঁতে গেল মুদীর কাছে। মুদী বলল, 'এই যে ঘোঁতো! কেমন আছ? কোথায় যাচ্ছ?' ঘোঁতো বলল, 'মুদীর কাছে আটা আনতে, চাষাকে দিয়ে খড় নিতে; খড় নিয়ে গাইকে দিয়ে দুধ পেতে, মেনি তা খেয়ে মাখন চেটে ভোলাকে দিতে; নখে মেখে হরিণ ধরতে; হরিণ দিয়ে জল তোলাতে, জল দিয়ে পাখর ভেজাতে; পাখর দিয়ে কুড়ুল শানাতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে। সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না?' মুদী বলল, 'নদী থেকে এই চালনি ভরে জল আনো, নইলে আটা পাবে না।'

চালনি নিয়ে খুশি হয়ে ঘোঁতো গেল নদী থেকে জল আনতে। জল ত তাতে থাকে না, তুলতে গেলেই পড়ে যায়। যত তোলে ততই পড়ে। বেলা হল, বেলা গেল, সন্ধ্যা এল। ঘোঁতো তবু খালি চালনি ডোবাচ্ছ আর তুলছে, আর খালি ঝরঝর করে পড়ে যাচ্ছে। ঘোঁতো বলল, কি মুশকিল! এখনকি হবে?

সেখানে কতকগুলো হাঁস ছিল, তাঁরা প্যাঁক প্যাঁক করে ডাকছিল। তা শুনে ঘোঁতো বলল, 'আরো তাই ত, ঠিকই ত বলেছে। চালনিতে পাঁক মাখিয়ে নিতে হবে, তাহলেই ফুটো বন্ধ হয়ে যাবে আর জল ধরবে।' নদীর ধারে পাঁক ছিল, ঘোঁতো তাই নিয়ে চালনিতে মাখাল। ফুটো বন্ধ হয়ে গেল, আর জল পড়তে পেল না। ঘোঁতো তখন হাসতে হাসতে জল নিয়ে মুদীর কাছে ফিরে এল। মুদী তাতে খুশী হয়ে ঘোঁতোকে ঢের আটা দিল। আটা নিয়ে ঘোঁতো গেল চাষার কাছে। চাষা তাতে খুশি হয়ে ঘোঁতোকে খড় দিল। খড় নিয়ে ঘোঁতো দিল গাইকে; গাই তা খেয়ে খুশি হয়ে ঢের দুধ দিল। দুধ নিয়ে ঘোঁতো দিল মেনিকে; মেনি তা খেয়ে খুশি হয়ে মাখন চেটে ভোলাকে দিল। ভোলা সে মাখন নখে মেখে হরিণ ধরে আনল। হরিণ গিয়ে জলে নেমে গা ভিজিয়ে এল। ঘোঁতো তার গা থেকে জল নিয়ে পাখরে দিল, সেই পাখরে কুড়ুল শান দিল, সেই কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটল, সেই গাছ দিয়ে লাঠি বানাল, সেই লাঠি নিয়ে দাঁত কড়মড়িয়ে ছুটে গেল কুলগাছতলায় ভুতোকে মারতে। ভুতো কি ততক্ষণ গাছতলায় বসে? সে তার কত আগেই ছুটে পালিয়েছে।

গিল্‌ফয় সাহেবের অদ্ভুত সমুদ্র-যাত্রা

তোমরা 'ইউনাইটেড় স্টেট্‌স' কোথায় জান? পৃথিবীর মানচিত্রের বাঁ ধারে গোলাকাটির নাম নূতন মহাদ্বীপ। নূতন মহাদ্বীপের বড় দেশটা আমেরিকা। আমেরিকার মাঝখানটা খুব সরু, দেখিতে দুটি দেশের মত দেখায়। এই দুইটির উপরেরটির নাম উত্তর আমেরিকা আর নীচেরটির নাম দক্ষিণ আমেরিকা। উত্তর আমেরিকার যত দেশ, ইউনাইটেড় স্টেট্‌স তাহার মধ্যে সকলের বড়।

ইউনাইটেড় স্টেট্‌সে গিলফয় সাহেবের বাড়ি। গিলফয় সাহেব বড় মজার লোক। বয়স তেত্রিশ বৎসর হবে। সাহেব এই বয়েসটা প্রায় জাহাজে থাকিয়াই কাটাইয়াছেন। জাহাজে চড়িয়া কত দেশে গিয়েছেন, কত তামাশা দেখিয়াছেন, কিন্তু একা ছোট নৌকায় প্রশান্ত মহাসাগর পার হন নাই, এই দুঃখে সাহেবের আর মন ঠাণ্ডা হয় না। ছুতোরকে বলিলেন, 'আমাকে একখানা নৌকা গড়িয়া দাও।' ছুতোর তাহাই করিল। নৌকা দৈর্ঘ্যে বার হাত, আর উচুতে দুই হাত হইল। পঞ্চাশ মন জিনিস ধরে। নাম রাখিলেন 'প্যাসিফিক্'। সাহেব বলিলেন, 'জল-বিহার করিয়া করিয়া অষ্ট্রেলিয়া যাইব।' অস্ট্রেলিয়া আমেরিকা হইতে প্রায় ছ'হাজার মাইল দূরে।

পাঁচ মাসের আন্দাজ খাদ্যসমগ্রী নৌকায় উঠান হইল। ১৮৮২ সালের ১৯ এ আগস্ট গিল্‌ফয় সাহেব যাত্রা করিলেন। প্রথম সপ্তাহ বেশ সুখে সুখে গেলেন-তবে নৌকা বড় নিচু বলিয়া জল ছিটিয়া খাবার জিনিসগুলি ভিজাইয়া দিতে লাগিল-এই একটু অসুবিধা। এরপর প্রয় একমাস পর্যন্ত কোনদিন বাতাস পান, কোনদিন বা বাতাস থাকেই না। খাবার জিনিসও বেশি নাই। সাহেব দেখিলেন অত বেশি খাইলে চলিবে না। এক জায়গায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে এই সময়ে সাহেবের ক্ষুধা হ্রাস হইয়া উঠিল। বেশি খাইতে পারেন না- সুবিধার বিষয়ই

for more books visit www.rashel.com

হইল। ভোর হইবার পূর্বে তিন-চার ঘন্টা নিদ্রা যাওয়া অভ্যাস ছিল, কিন্তু নৌকায় নিচে কিসে ঠকঠক করিয়া তাহার বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। সাহেব দেখিলেন, হাঙ্গরের তাড়ায় ছোট ছোট মাছ আসিয়া নৌকায় ঠেকে- তাহাতেই এই শব্দ হয়। তিনি হাঙ্গর তাড়াইবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। তোমরা অনেকে বোটের মাঝিদের হাতে একরকমের লগি দেখিয়াছে, তাহার মাথায় লোহার একটা বঁড়শির মত লাগান থাকে। সাহেবের এর একটা ছিল। তিনি তাহার অগ্রভাগটা সোজা করিয়া লইলেন। এই অস্ত্র হাতে করিয়া তিনি হাল ধরিতে বসিতেন আর হাঙ্গর কাছে আসিলেই সুট করিয়া ঘা মরিতেন। হাঙ্গারগুলি ভয় পাইল, তিনি যতক্ষণ বাহিরে বসিয়া থাকিতেন ততক্ষণ আর কাছে আসিতে সাহস পাইত না। ঘুমাইবার সময় একটা পিরাণ তাঁহার বসিবার জায়গায় লটকাইয়া রাখিতেন। তাহাতে হাঙ্গরগুলি মনে করিত মানুষটাই বুঝি রহিয়াছে। সুতরাং ঠক-ঠকি থামিল।

১০ই নভেম্বর একখানা জাহাজ দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহার কাছে গিয়া কিছু খাবার চাহিয়া লইলেন। তাহার পর কয়েকদিন এত বাতাস পাইয়াছিলেন যে একদিন প্রায় একশত ছয় মাইল গিয়াছিলেন। ১৪ই ডিসেম্বর, ঝড় তুফানের দিন; একটা বড় ঢেউ আসিয়া তাঁহার নৌকাখানি উল্টাইয়া ফেলিল। সাহেব সাঁতরিয়া নৌকার পাশ দিয়া গেলেন এবং নোঙরের দড়ি ধরিয়া প্রাণপণে টানাটানি করিতে করিতে এক ঘন্টায় নৌকাটিকে সোজা করিলেন। জল সেঁচিতে গিয়া তিনি বেশি হুড়োহুড়ি করিতে লাগিলেন। নৌকাখানি আবার উল্টাইয়া গেল। দ্বিতীয় বার নৌকা সোজা করিতে তত কষ্ট বোধ হইল না; এবার খুব সাবধান ইহয়া জল সেঁচিলেন। এই গোলমালে সাহেবের ঘড়ি এবং কম্পাস হারাইয়া গেল। কিছু কাল পরে একটা কিরিচ মাছ আসিয়া নৌকায় ছিদ্র করিয়া দিয়া গেল। সাহেব তখন টের পাইলেন না। কিন্তু শেষে যখন দেখিলেন নৌকায় জল উঠিয়া জিনিসপত্র ভাসিতেছে, তখন চেতনা হইল। তাড়াতাড়ি ছিদ্র বন্ধ করিলেন।

নূতন বৎসর আসিল। ৭ই জানুয়ারি একটি পাখি উড়িয়া নৌকায় আসিল, সাহেব তাহা ধরিয়া খাইলেন। ১১ জানুয়ারি আর একটি পাখি ধরিলেন। কখন কখন দই একটি "উড়ক্কু" মাছ নৌকায় আসিয়া পড়িত, তাহাও বিনা আপত্তিতে ভক্ষণ করিতেন। ১৭ তারিখ তাহার হালটি ভাঙিয়া গেল; তিনি আর একটি করিয়া লইলেন। ইহার পর আর-একদি একটি পাখি ধরিয়াছিলেন। কিন্তু ২১ এ হইতে ক্ষুধায় তাহাকে রোগা করিতে লাগিল। নৌকার গায়ে যে-সমস্তক শামুক ছিল, তাহার বড়গুলি চুষিয়া খাইলেন। আর-একদিন গুলি করিয়া একটি পাখি মারিয়াছিলেন; কিন্তু জল হইতে উঠাইতে পারিলেন না। ৩০এ একটি পাখি ধরিয়া দেশলাই-এর আগুনে পোড়াইয়া খাইলেন। তারপর এত দুর্বল ইহয়া পড়িলেন যে নৌকা কোন দিকে যাইতেছে তাহার প্রতি মনোযোগ রহিল। একদিন হেঁট মস্তকে বসিয়া নিজের অবস্থার কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ মাথা তুলিয়া দেখিলেন-একটা জাহাজ। তিনি আনন্দে জাহাজের দিকে যাইতে লাগিলেন। জাহাজের লোকেরাও দেখিতে পাইয়া জাহাজ ফিরাইল। জাহাজে উঠিয়াই কিছু খাবার চাহিলেন। খাবার শীঘ্রই আনা হইল। খাইয়া ঠাণ্ডা হইলে পর সমস্ত লোক তাঁহার ইতিহাস শুনিতে আসিল। তিনি নোট বহিতে সব লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই বহি হইতে ইংরেজি পত্রিকায় এই গল্পটি ছাপা হইয়াছে।

খুঁত ধরা ছেলে

বিলাতে চারিটি ভাই একদিন এক জায়গায় বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছিলেন। তাহাদের আলাপের বিষয়, কে কি করিবে। সকলেরই মনে ইচ্ছা, একটা কিছু হওয়া চাই। সকলের 'একটা কিছু'ত আর একরকম হয় না। তাই চার ভাই চাররকম কথা বলিল।

একজন বলিল-'আমি ইঁটের কারবার করিব। তাহাতে টাকা হইবে, আর ইঁট দিয়া আমার একখানা বাড়ি করিব।'

আর-একজন বলিল-'দূর হ, তোর নেহাত ছোট নজর। আমি তোর চাইতে বেশি একটা কিছু হ'ব-আমি ইঞ্জিনিয়ার হ'ব। কত লোক আমার কাছে ঘরবাড়ির নক্সা করিয়ে নিতে আসিবে, কত লোকের বাড়ি-ঘর বাঁধিয়া দিব। আমি একটা "দশজনের একজন" হইব। বলিস্ কি; আমার নামে একটা স্ট্রীট যদি না হয়, তখন দেখিস্।'

তৃতীয় ভ্রাতা-'বিল্ডার, কন্ট্রাক্টর, ইঞ্জিনিয়ার সব বাজে লোক, তোরা হ'বি চিনির বলদ। আমি কি করিব জানিস্। আমি অন্যের কাজ নিয়ে ছুটোছুটি করিতে যাইব কেন। সব কাজে আমার নিজের বুদ্ধি খাটিবে। সব নূতন ফ্যাসানে বাড়ি-ঘর করিব। আমার সব এমন হইবে, যাহা কেহ কখন দেখে নাই।'

শেষ ব্যক্তি উঠিয়া বলল-'তোরা যাহাই করিস্ ভাই এমন কিছু করিতে পারিবি না, যাহার উপর আমার বক্তৃতা না চলিবে। উত্তম হইল; দেখ্ দেখি। তোরা যাহা করিবি, আমি তাহার দোষ ধরিব। আমার কাজের আর অভাব কি?

চারি ভায়ের পরামর্শ ঠিক হইল। একজন ইঁটের কাজ করিয়া কিছু টাকা করিল। ইঁট দিয়া তাহার একটি বাড়ি হইল। তাছাড়া এক দুঃখিনী বুড়িকে ঐ ইঁট দিয়া আর একটি ঘর করিয়া দিল। কন্ট্রাক্টর ইত্যাদি মহাশয়ও কথামত কাজ করিলেন। মিউনিসিপ্যালটিকে

for more books visit www.rashal.com

খোঁচাইয়া নিজের নামে একটি স্ট্রীট পর্যন্ত কেমন করিয়া লইয়াছেন। তিনিও একটা কিছু হইয়াছেন। তৃতীয় বেচারা নূতন ধরনে বাড়ি করিতে দিয়া চাপা পড়িয়া মরিল। খুঁতধরা মহাশয়ের ত কথাই নাই। তাহার কাজ ফুরায়ই না। মরিবার সময় পর্যন্ত সে সন্তোষজনক রূপে, প্রশংসার সহিত কর্তব্য-কাজ করিয়া গেল।

একদিন স্বর্গের দরজায় দারোয়ান-দেবতা বসিয়া রহিয়াছেন। সে প্রকাণ্ড দরজা। বিশ্বকর্মার হাতের তৈরি। বুঝিতেই ত পার, স্বয়ং বিশ্বকর্মা ঠাকুর যাহা করিয়াছেন সে কেমন সুন্দর। এত সুন্দর যে আর কি বলিব! দরজায় প্রকাণ্ড দুখানা কাচ লাগান। তাহার ভিতর দিয়া দরোয়ান-ঠাকুর কে আসিল দেখিতে পান। কিন্তু সম্প্রতি তিনি তাহা করিতেছিলে না। অনেক কাল হইল স্বর্গে লোক আসে না,। তাই আজ-কালের ব্যস্ততা কিছু কম।দেবতা দরজা খুলিবার হীরার হ্যান্ডেলে হাত ঝুলাইয়া সোনার টুলে বসিয়া ঝিমাইতেছেন। এমন সময় কড়াৎ কড়াৎ করিয়া দরজার ঘা মারিবার শব্দ হইল। বাহির হইতে একজন লোক বলিতেছেন-

'অনুগ্রহ করুন মহাশয়, আমি ভিতরে আসিতে প্রার্থনা করিতে পারি? দরজাগুলি ত মন্দ নয়। কিন্তু স্বর্গের দ্বার বন্ধ থাকিবে কেন? দরজাগুলি আরো বড় হওয়া উচিত।'

'তুই কেরে, পৃথিবীর লোক, ক্যাচ্ ক্যাচ্ করিয়া কথা কহিতেছিস্?'

'অত মোটা সুরে বলিতেছেন কেন?- আমি স্বর্গে যাইতে চাই।'

'বটে? তুই করিয়াছিস কে?'

'আমি খুঁত-ধরা কাজ করিয়াছি। আমার তিন ভাই যে কাজ করিয়াছে, তাহার সমস্ত দোষ আমার নোট বহিতে লিখিয়া আনিয়াছি। যে ইঁট পোড়াইয়াছিল, সে আর দুই মণ কয়লা কম খরচ করিলে সুরকিওয়ালা সহজেই খোয়া করিতে পারিতে। যার নামে স্ট্রীট হইয়াছে, সে এত রোগা যে অত বড় স্ট্রীট তাহার দরকার নাই। যে চাপা পড়িয়া মরিয়াছে- '

'আরে থাম্ থাম। ও-সব কি কাজ? তুই নিজের হাতে কি করিয়াছিস্?

'এই-সব নোট লিখিয়াছি।'

'দূর হ ব্যাটা, তুই কি আর কোন কাজই করিস্ নাই? কেবল দোষ ধরা কাজই করিয়াছিস্?'

'আর স্মৃতি পুস্তিকায় তাহা লিখিয়াছি।'

'যা, যা! তোর এখানে আসিবার হুকুম নাই।'

'আউ পচারিব কাহ্নু, জগনাথঙ্কু,-' বলিয়া দারোয়ান দেবতা গান ধরিলেন। আমাদের সমালোচক দেখিলেন যে এত পথ খরচ, রেলভাড়া, গাড়িভাড়া করিয়া আসিয়াও কোন ফল পাইলেন না। বিরক্ত হইয়া মনে করিলেন যে, কাগজে লেখা উচিত 'স্বর্গে ভালো অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত নাই।' গাড়ি পাইতে অনেক দেরি, সুতরাং ইত্যবসরে দরজার দোষগুলি টুকিয়া রাখিতে লাগিলেন। দরজার কথা শেষ হইলে, সাহেব দ্বারী-ঠাকুরের গানের এক মজার বর্ণনা লিখিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন যে, যে বুড়িকে তাহার ভাই ঘর করিয়া দিয়াছিল, সে আসিতেছে। তিনি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-

'ও বুড়ি! তুই কেমন করিয়া আসিলি?'

'তাই ত বাপু, আমি ত কিছু জানি না। আমি দুঃখিনী বুড়ি, এমন ত কিছু করি নাই, যাহাতে এখানে আসিতে পারি।'

'তুই কি কোন কাজ করিস্ নাই? আমি ত সমালোচনা করিয়াছি।'

for more books visit www.rashal.com

‘আমার আর ত কিছুই মনে হয় না। তবে একদিন আমার বাড়ির কাছে পুকুরে জমা বরফের উপরে পাড়ার সকলে খেলা করিতে গিয়াছিল। যাইবার সময় আমাকে সকলেই দেখিয়া মিষ্টি কথা কহিয়া গেল। আমি ভয়ানক কাতর ছিলাম। কিছুকাল পরে দেখি, আকাশে একরকম মেঘ দেখা দিয়াছে। ওরূপ মেঘ আমার জন্মে আমি আর একবার দেখিছিয়ালাম। তখন দুই মিনিটে মধ্যে সমুদয় বরফ ফাটিয়া গিয়াছিল। আমার মনে বড় ভয় হইল। এখনই এতগুলি লোক ডুবিয়া মরিবে ভাবিয়া আমার চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। আমি কি করি? রোগে মরি, উঠিবার শক্তি নাই, ডাকিলেও কেউ আমার কথা শুনিবে না। তখন আমি আস্তে আস্তে অনেক কষ্টে বাহিরে আসিয়া আপনার (নিজের) ঘরে আগুণ লাগাইয়া দিলাম। সকল লোক বুড়ি পুড়িয়া মরিল মনে করিয়া দৌড়িয়া আসিল। আমি তারপর কি হইল বিশেষ জানি না। কেবলমাত্র একবার জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘কার কিছু হয় নি ত?’একজন লোক বলিল, ‘না, আমরাও আসিয়াছি আর বরফও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।’ তারপর আর কিছু জানি না। কে যেন আমাকে এখানে আনিয়াছে।’

বুড়ির কথা শুনিয়া দরোয়ান-দেবতা স্বর্গে খবর দিলেন। আর দলে দলে দেবতারা আসিয়া ‘এসো এসো’ বলিয়া আদর করিয়া বুড়িকে স্বর্গের ভিতরে লইয়া চলিলেন। কিন্তু বুড়ি সমালোচকের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল। বলিল-‘ওর ভাই আমাকে বাড়ি করিয়া দিয়াছিল, আমার থাকিবার জায়গা ছিল না। ও মুখ কাল করিয়া ফিরিয়া যাইবে, আর আমি কোন প্রাণে তোমাদের সঙ্গে যাইব? আমার মনে বড় লাগে। আমাকে তোমরা স্বর্গে নিও না। এ বেচারা তাহা হইলে বড় কষ্ট পাইবে।’

তখন দেবতারা সমালোচককে-‘অলস! অপদার্থ! যা! বুড়ির জন্য তোকে স্বর্গে নিয়া যাওয়া হইল। তুই জীবনটা কেবল সমালোচনা করিয়াই কাটাইলি, ভাল কাজ কিছুই করিলি না। তোর মতন লোক আর এর পূর্বে স্বর্গে যায় নাই।

দেবতারা তারপর বুড়ির সঙ্গে সমালোচককেও টানিয়া স্বর্গে নিয়া চলিলেন। সমালোচক হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। একবার মাত্র বলিল,‘টানিয়া লওয়া বুঝি তোমাদের অভ্যাস নাই? ভাল করিয়া টানা হইতেছে না। এমনি বুঝি টানে।’

ঢেঁকি যেখানে থাক্, তার ধান ভানা কাজ ঘোচে না। আমাদের সমালোচক ভায়া স্বর্গে গিয়াও খুঁত ধরিতে ব্যস্ত, আর কিইবা করে, একটা কাজ ত চাই? কতকগুলি ছেলে আছে, তাহারা কেবলই খুঁত ধরে; পরের দোষ দেখিয়া তাহার নিন্দা করার চেয়ে নিজের শোধরাইয়া পরের গুণ দেখা ভাল।

নূতন গল্প

এক রাজা, তার তিন ছেলে। বড় ছেলে গাঁজা খায়, মেজ ছেলে লাঠি হাতে ঘুরিয়া বেড়ায়, ছোট ছেলে বাপের কাছে বসিয়া রাজ্যের কাজকর্ম দেখে। বড় দুটো ছোটটিকে দেখিতে পারে না।

‘সোনার গাছ রূপোর পাতা, শ্বেত কাকের বাসা তাতে!’ রাজার বড় ইচ্ছা এই গাছ ছেলেরা আনিয়া দেয়। তিন ছেলে কত জায়গায় ঘুরিল। বড় দুটির কি হইল জানা গেল না, ছোটটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক রাজার বাড়িতে যাইয়া উপস্থিত। সেখানে জন-প্রাণী কিছুই নাই, সব খালি। এক ঘরে একটি মেয়ে ঘুমাইয়া আছে; তার মাথার কাছ রূপোর কাঠি, পায়ের কাছে সোনার কাঠি। সে পায়ের কাঠিটি মাথায় আনিল আর মাথার কাঠিটি পায়ের দিকে লইল, অমনি মেয়েটি জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে বলিতে লাগিল, ‘হায়! মানুষের ছেলে তুই এখানে কেন এলি? তোকে এখনি খেয়ে ফেলবে। এ বাড়িতে রাক্ষস থাকে। আমার বাবাকে খেয়েছে, মাকে খেয়েছে, বাড়ির সকলকে খেয়েছে, সেদিন দুটি রাজার ছেলে ‘সোনার গাছ রূপোর পাতা, শ্বেত কাকের বাসা তাতে’ এই গাছ নিতে এসেছিল, তাদেরও খেয়েছে। আমাকে যে কোন খায় নি জানি নে।’ সে বুঝিতে পারিল যে মেয়ে তাহার দুই দাদার কথাই কহিতেছে। তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া কত কথাই জানিয়া লইল। রাক্ষসগুলি সহজে মরিবে না, তবে যদি কেহ ঐ পুকুরের তলায় যে স্ফটিকের স্তম্ভ আছে, সেটাকে এক নিশ্বসে ডুব দিয়া তুলিতে পারে, তারপর তাহাকে ভাঙ্গিয়া তাহার ভিতরে যে ভ্রমরটি আছে, তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পারে, তবে ঐগুলি মরিবে। রাক্ষসেরা যত লোককে খাইয়াছে, তাহাদের হাড়গুলি সবই রাখিয়া দিয়াছে। যদি কেহ রাক্ষসগুলি মারিয়া তারপর ঐ হাড়গুলিতে এই সোনার কাঠি এবং রূপোর কাঠি ধোওয়া জল ছড়াইয়া দিতে পারে, তবে ঐ-সকর লোক বাঁচিয়া উঠিবে। রাজার ছেলে এই কথা শুনিয়া একদিন রাক্ষসদের অনুপস্থিতিতে এই-সকল কার্য সাধন করিল। রাক্শসও মারিল, ভাইদেরও বাঁচাইল।

আরো এক গল্প শুনিয়াছি। রাজার মেয়ে মরিয়া গেল, মুনি-ঠাকুর আসিয়া রজার নিকট বলিলেন, ‘রাজা, তোমার মেয়েকে আমি বাঁচাইয়া দিতেছি। আমাকে একটা বড় কড়া দাও, একটা টেবিল দাও, একটা ছুড়ি দাও, আর জল ও আগুন দাও।’ রাজা সকলই দিলেন। মুনি-

for more books visit www.rashal.com

ঠাকুর সেই মড়াটাকে কড়াতে সিদ্ধ করিয়া তার মাংসগুলি ফেলিয়া দিলেন। পড়ে হাড়গুলি পরিষ্কার করিয়া টেবিলে রাখিয়া তাহাতে মন্ত্রপূর্বক জল ছড়াইয়া দিলেন, আর অমনি যে মেয়ে ছিল সেই মেয়ে হইয়া উঠিল।

এ-সব ত গেল গল্প। সত্যি মড়া বাঁচাইতে দেখিয়াছ? দেখি নাই, কিন্তু শুনিয়াছি। চোরাসান্নিপাত রোগে যাহারা মরে, তাহাদের অনেককে দেশীয় শাস্ত্রীয় কবিরাজেরা বাঁচাইয়াছেন, এরূপ গল্প অনেকের মুখে আমি শুনিয়াছি।

একখানি ইংরেজি কাগজে নিম্নলিখিত গল্পটি পড়িয়াছি–

'বিলাতের একজন ডাক্তার একটি ছোট কুকুরের গরার শিরা কাটিয়া দিলেন। কুকুরটি দেখিতে দেখিতে রক্ত পড়িয়া মরিয়া গেল। মরিয়া গেলে পর তিন ঘন্টা কাল একটি ঘরে কুকুরটিকে রাখিয়া দেওয়া হইল। কুকুরটি শক্ত হইয়া গেল। তারপর তাহাকে গরম জলে ফেলিয়া ক্রমাগত মাজিয়া দেওয়া হইল। হাত-পাগুলি অনেকক্ষণ নাড়িয়া চাড়িয়া দিলে পর শরীরটা যেন বেশ নরম হইল। তারপর সাহেব একটা রবারের নল দিয়া তাহার পেটে তিন ছটাক রক্ত পুরিয়া দিলেন। একটা নল দিয়া কৃত্রিম নিশ্বাস করান হইতে লাগিল এবং একটা বড় কুকুরের রক্ত ঐ ছোট কুকুরটির গায়ে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইল। এই-সকল কার্য একবারে হইতে লাগিল। অর্থাৎ একজন সাহেব নিশ্বাস প্রশ্বাস করাইতে লাগিলেন, একজন রক্ত দিতে লাগিলেন আর-একজন তাহার শরীরটা মাজিতে লাগিলেন। ক্রমে কুকুরটি চক্ষু সতেজ হইল, আর কয়েক মুহূর্ত পরে শরীরটা একটু একটু কাঁপিতে লাগিল। তারপর কুকুরটি হাঁপাইতে লাগিল, চক্ষু উজ্জ্বল হইল, শেষে ফিট হইলে যেমন হয়, সেইরূপ করিতে লাগিল। তারপর ক্রমেই শান্ত হইয়া আসিতে লাগির, একটু একটু কোঁকাইতেও লাগিল। প্রথম রক্ত দেওয়ার কুড়ি মিনিটের মধ্যে কুকুরটি উঠিয়া বসিল। শীঘ্রই দাঁড়াইয়া তারপর হাঁটিতে লাগিল। দুই দিনের মধ্যে সে রাস্তায় দৌড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।'

'সাহেবদের গরু বাছুর মারিতে আপত্তি নাই, সুতরাং ডাক্তার মহাশয় একটি বাছুরকেও ঐরূপ করিয়া দেখিলেন। সেও বাঁচিল। আর একটি ছোট কুকুরকে জলে ডুবাইয়া মারিয়া আবার ঐ প্রণালীতে বাঁচাইয়া দিলেন।'

আমরা ছোট-খাট রকমে একপ্রকার মরা জানোয়ার বাঁচাইয়াছি। সে হয়ত পাঠকগণের মধ্যে সকলেই এক-এক বার করিয়া থাকিবেন। মাছিগুলিকে দু-একটা চড় চাপড় মারিলেই তাহারা মরিয়া যাইতে রাজি হয়। একটি মাছিকে ঐরূপ করিয়া তাহাকে সহজেই পুনরায় বাঁচান যাইতে পারে। মাছিটিকে এক হাতে রাখিয়া আর-এক হাত দিয়া তাহার উপর একটি ঘর নির্মাণ করিয়া দাও। ঘরের একটি ছোট দরজা রাখিয়া তাহার মধ্যে দিয়ে খুব ফুঁ দিতে থাক। দেখিবে, শীঘ্রই মাছিটি বাঁচিয়া উঠিবে।

আমাদের দেশের কথা শুনিয়াছি, সর্পঘাতে মরা লোকগুলিকে তিন দিন পরে ওঝা আসিয়া মন্ত্র পড়িয়া বাঁচাইয়া দিতে পারে। সত্য মিথ্যা শপথ করিতে পারি না।

ভূতের গল্প

আমি ভূতের গল্প বড় ভালবাসি। তোমরা পাঁচ জনে মিলিয়া গল্প কর, সেখানে পাঁচ ঘন্টা বসিয়া থাকিতে পারি। ইহাতে যে কি মজা! একটা শুনিলে আর-একটা শুনিতে ইচ্ছা করে, দুটা শুনিলে একটা কথা কহিতে ইচ্ছা করে। গল্প শেষ হইয়া গেলে একাকী ঘরের বাহিরে যাইতে ইচ্ছে হয় না। তোমাদের মধ্যে আমার মতন কেহ আছ কি না জানি না, বোধ হয় আছে। তাই আজ তোমাদের কাছে একটা গল্প বলি। গল্পটা একখানি ইংরেজি-কাগজে পড়িয়াছি। তোমাদের সুবিধার জন্য ইংরেজি নামগুলি বদল করিয়া দিতে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু গল্পটি পড়িলেই বুঝিতে পারিবে যে শুধু নাম বদলাইলে কাজ চলিবে না। সুতরাং ঠিক যেরূপ পড়িয়াছি, প্রায় সেইরূপ অনুবাদ করিয়া দেওয়াই ভাল বোধ হইতেছে।

'স্কটল্যাণ্ডের ম্যাপটার দিকে একবার চাহিয়া দেখিলে বাঁ ধারে ছোট ছোট দ্বীপ দেখিতে পাইবে। তাহার উপরেরটির নাম নর্থ উইস্ট্, নীচেরটির নাম সাউথ্ উইস্ট্। এর মাঝামাঝি ছোট-ছোট আর কতকগুলি দ্বীপ দেখা যায়। এ সেকালের কথা, তখত স্টীম্ এঞ্জিনও ছিল না, টেলিগ্রাফ্ও ছিল না। আমার ঠাকুরদাদা তখন এর একটি দ্বীপে স্কুলে মাস্টারি করিতেন।'

'সেখানে লোক বড় বেশি ছিল না। তাদের কাজের মধ্যে কেবল মাত্র মেষ চরান, আর কষ্টে সৃষ্টে কোন মতে দিন চলার মত কিছু শস্য উৎপাদন করা। সেখানকার মাটি বড় খারাপ; তারি একটু একটু সকলে ভাগ করিয়া নেয় আর জমিদারকে খাজনা দেয়। ... এরা বেশ সাহসী লোক ছিল। আর ঐরকম কষ্টে থাকিয়া এবং সামান্য খাইয়াও বেশ একপ্রকার সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইত।'

for more books visit www.nashai.com

‘এই দ্বীপে এল্যান্ ক্যামেরন নামে একজন লোক ছিলেন, তাঁহার বাড়ি গাঁ থেকে প্রায় এক মাইল দূরে। এল্যানের সঙ্গে মাস্টারমহাশয়ের বড় ভাব, তাঁর কাছে তিনি কত রকমের মজার গল্প বলিতেন। হঠাৎ একদিন ক্যামেরন বড় পীড়িত হইলেন, আর কিছুদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার কেউ আপনার লোক ছিল না, সুতরাং তাঁহার বিষয়-সমস্ত বিক্রি হইয়া গেল। তাঁর বাড়িটা কেহই কিনিতে চাহিল না বলিয়া তাহা অমনি খালি পড়িয়া রহিল।’

‘এর কয়েক মাস পরে একদিন জ্যোৎস্না রাত্রিতে ডনাল্ড্ ম্যাকলীন বলিয়া একটি রাখাল ঐ বাড়ির পাশ দিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ জানালার দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল, আর সে ঘরের ভিতরে এল্যান্ ক্যামেরনের ছায়া দেখিতে পাইল। দেখিয়াই ত তার চক্ষু স্থির! সেখানেই সে হাঁ করিয়ার দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চুলগুলি খ্যাংরা কাঠির মত সোজা হইয়া উঠিল, ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল, গলা শুকাইয়া গেল।’

‘শীঘ্রই তাহার চৈতন্য হইল। ঐরকম ভয়ানক পদার্থের সঙ্গে কাহারই বা জানাশুনা করিবার ইচ্ছা থাকে? সে ত মার দৌড়! একেবারে মাস্টার-মশাইয়ের বাড়িতে। তাঁহার কাছে সব কথা সে বলিল। মাস্টারমহাশয় এ-সব মানেন না। তিনি তাহাকে প্রথম ঠাট্টা করিলেন, তারপরে বলিলেন, তাহার মাথায় কিঞ্চিৎ গোল ঘটিয়াছি; আরো অনেক কথা বলিলেন-বলিয়া যাথাসাধ্য বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন যে, ঐরূপ কিছুতে বিশ্বাস থাকা নিতান্ত বোকার কার্য।’

‘ডনাল্ড্ কিন্তু ইহাতে বুঝিল না, সে অপেক্ষাকৃত সহজ বুদ্ধি বিশিষ্ট অন্যান্য লোকের কাছে তাহার গল্প বলিল। শীঘ্রই ঐ দ্বীপের সকলেই গল্প জানিতে পারিল। ঐ-সব বিষয় মীমাংসা করিতে বৃদ্ধরাই মজবুত। তাঁহারা ভবিষ্যতের সম্বন্ধে ইহাতে কত কুলক্ষণই দেখিতে পাইলেন।’

‘ঐ দ্বীপের মধ্যে কেবলমাত্র মাস্টারমহাশয়ের কাছে খবরের কাগজ আসিত। মাসের মধ্যে একবার করিয়া কাগজ আসিত আর সেদিন সকলে মাস্টারমহাশয়ের বাড়িতে গিয়া নূতন খবর শুনিয়া আসিত। সেদিন তাহাদের পক্ষে একটা খুব আনন্দের দিন। রান্নাঘরে বড় আগুন করিয়া দশ-বার জন তাহার চারিদিকে সন্ধ্যার সময় বসিয়া কাগজের বিজ্ঞাপন হইতে আরম্ভ করিয়া অমুক কর্তৃক অমুক যন্ত্রে মুদ্রিত হইল ইত্যাদি পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের তদারক ও তর্কবিতর্ক করিত। শেষে কথাগুলি সকলেরই একপ্রকার মুখস্থ হইয়াছিল, এবং পড়া শেষ হইলে ঐ কথাটা প্রায় সকলে একসঙ্গে একবার বলিত।’

‘এই-সকল সভায় রাখাল, কৃষক, গির্জার ছোট পাদরি প্রভৃতি অনেকেই আসিতেন। গ্রামের মুচি ররীও আসিত। ররী ভয়ানক নাছোড়বান্দা লোক। একটি কথা উঠিলে তাহাকে একবার আচ্ছা করিয়া না ঘাঁটিলে সহজে ছাড়িবে না।’

‘ডনাল্ড ম্যাকলীনের ঐ ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে একদিন সকলে এইরূপ সভা করিয়া বসিয়াছে, মাস্টারমহাশয় চেঁচাইয়া তর্জমা করিতেছেন, এমন সময় একজন আসিয়া বলিল যে, এল্যান্ ক্যামেরনের ছায়া আবার দেখা গিয়াছে। এবারে একজন স্ত্রীলোক দেখিয়াছে। এ রাখাল যে স্থানে যেভাবে উহাকে দেখিয়াছিল, এও ঠিক সেইরকম দেখিয়াছে।’

‘এরপর আর পড়া চলে কি করিয়া। মাস্টারমহাশয় চটিয়া গেলেন এবং ঠাট্টা করিতে লাগিলেন। ররী তৎক্ষাণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিল। ররী কোন কথাই ঠিক মানে না। এবারেও মাস্টারমহাশয়ের কথাগুলি মানিতে পারিল না। প্রচণ্ড তর্ক উপস্থিত। ভূতের কথা লইয়া সাধারণভাবে এবং ক্যামেরনের ভূতের বিষয় বিশেষভাবে বিচার চলিতে লাগিল। আর সকলে বেশ মজা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু রীরর মেজাজ গরম হইয়া উঠিল। সে বলিল-’

‘দেখ মস্টারের পো, যতই কেন বল না, আমি এক জোড়া নতুন বুট হারব, তোমার সাধ্যি নেই আজ দুপুর রেতে ওখান থেকে গিয়ে দেখে এস।’

‘সকলে করতালি দিয়া উঠিল। মাস্টারমহাশয় হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিলেন, কিন্তু ররী ছাড়িবে কেন? সে সকলের উপর বিচারের ভার দিল। তাহারা এই মত দিল যে, মাস্টারমহাশয় যখন গল্পগুলি মানিতেছেন না, সে স্থলে তাঁহার যে নিদেন পক্ষে তিনি যে এ মানেন না তা প্রমাণ করিয়া দেন।’

‘মাস্টারমহাশয় দেখিলে, অস্বীকার করিলে যশের হানি হয়। তিনি বলিলেন, “যাব বই কি? কিন্তু আমি ফিরে এলেও এর চাইতে আর তোমাদের জ্ঞান বাড়বে না।”

for more books visit www.rashal.com

রবী-'আচ্ছা দেখা যাউক।'

মাস্টারমহাশয়-'ভাল, ওখানে গিয়ে আমি কি করব?'

রবী-'ওখানে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তিনবার বলবে-এল্যান্ ক্যামেরন আছে গো!' কান জবাব না পাও ফিরে এস, আমি আর ভূত মানবো না।

মাস্টারমহাশয় হাসিয়া বলিলেন, 'এটা ঠিক জেনো যে, এল্যান, সেখানে থাকলে আমার কথার উত্তর দিবেই। আমাদের বড় ভাব ছিল।'

একজন বলিল, 'তাকে যদি দেখতে পাও, তা হলে মুচির কাছে যে ও টাকা পেতে, সে কথাটা তুল না।' এ কথায় সকলে হাসিয়া ফেলিল, রবী একটু অপ্রস্তুত হইল।

'এইরূপে হাসি-তামাশা চলিতে বলিল-'বারটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি। তুমি এখন গেলে ভাল হয়; তাহলেই ঠিক ভূতের সময়টাতে পৌঁছতে পারবে।'

'বেশ করিয়া কাপড়-চোপড় জড়াইযা মাস্টারমহাশয় যষ্টি হস্তে সেই বাড়ির দিকে চলিলেন। মাস্টারের যাইবার সময়ে সকলেই দু-একটি খোঁচা দিয়া দিল এবং স্থির করিল, ফলটা কি হয় দেখিয়া যাইবে।'

'রাত্রি অন্ধকার। এতক্ষণ বেশ জ্যোৎস্না ছিল, কিন্তু এক্ষণে কাল কাল মেঘে আসিয়া চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। মাস্টার চলিয়া গেলে সকলে আরম্ভ করিল যে, সমস্ত রাস্তাটা সাহস করিয়া যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব কি না। ছোট পাদরি বলিল যে তিনি হয়ত অর্ধেক পথ গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া যাহা ইচ্ছা বলিবেন, তখন আর কাহারো কিছু বলিবার থাকিবে না। ইহা শুনিয়া মুচির মনে ভয় হইল, জুতা জোড়াটা নেহাত ফাঁকি দিয়া নেয়, এটা তাহার ভাল লাগিল না। তখন একজন প্রস্তাব করিল যে, রবী যাইয়া দেখিয়া আসুক।'

'প্রথমে রবী ইহাতে আপত্তি করিল। কিন্তু উহার বক্তৃতায় পরে রাজি হইল। সকলে তাহাকে সাবধান করিয়া দিল যেন মাস্টার তাহাকে দেখিতে না পায়, তারপর সে বাহির হইল। খুব চলিতে পারিত এই গুণে শীঘ্রই সে মাস্টারকে দেখিতে পাইল। রবী একটু দূরে দূরে থাকিতে লাগিল। রাস্তাটা একটা জলা জায়গার মধ্যে দিয়া। একটি গাছপালা নাই যে মাস্টার ফিরিয়া চাহিলে তাহার আড়ালে থাকিয়া বাঁচিবে।'

'পরে মাস্টারমহাশয় যখন ঐ বাড়িতে পৌঁছিলেন, তখন রবী একটু বুদ্ধি খাটাইয়া খানিকটা ঘুরিয়া বাড়ির সম্মুখে আসিল। সেখানে একটু নিচু বেড়া ছিল, তাহার আড়ালে শুইয়া পড়িল।'

'সে অবস্থায় দূতের কার্য করিতে যাইয়া তাহার অন্তরটা গুর গুর করিতে লাগিল। মাস্টারমহাশয় ছিলেন বলিয়া, নইলে সে এতক্ষণ চেঁচাইয়া ফেলিত। কষ্টে সৃষ্টে কোন মতে প্রাণটা হাতে করিয়া দেখিতেছে কি হয়। মনে করিয়াছে, মাস্টারমহাশয় যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহা দেখা হইয়া গেলেই সে বাহির হইবে।'

'গ্রামের গির্জার ঘড়িতে বারটা বাজিল। সে বেড়ার ছিদ্র চাহিয়া দেখিল যে মাস্টারমহাশয় নির্ভয়ে দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।'

'মাস্টারমহাশয় গলা পরিষ্কার করিলেন এবং একটু শুষ্ক স্বরে বলিলেন-'এল্যান্ ক্যামেরন আছে গো!'-কোন উত্তর নাই।

'দু-এক পা পশ্চাৎ সরিয়া একটু আস্তে আবার বলিলেন, 'এল্যান্ ক্যামেরন আছ গো!'-কোন উত্তর নাই।

'তারপর বাড়িতে আসিবার রাস্তাটি মাথা পর্যন্ত হাঁটিয়া গিয়া থতমত স্বরে অর্থচিৎকার অর্থ আহ্বানের মত করিয়া তৃতীয়বার বলিলেন, 'এল-ক্যামেরন-আছ-।' তারপর আর উত্তরের অপেক্ষা নাই।-সটান চম্পট।

for more books visit www.rashal.com

‘কি সর্বনাশ! কোথায় মাস্টারের সঙ্গে বাড়ি যাইবে, মাস্টার যে এ কি করিয়া ফেলিলেন মুচি বেচারীর আর আতঙ্কের সীমা নাই। তবে বুঝি ভূত এল! আর থাকিতে পারিল না। এই সময়ে তার মনে যে ভয় হইয়াছিল, তারই উপযুক্ত ভয়ানক গোঁ গোঁ শব্দ করিতে করিতে সে মাস্টারমহাময়ের পেছনে ছুটিতে লাগিল।

সেই ভয়ানক চিৎকার শব্দ মাস্টারমহাশয় শুনিতে পাইলেন। পশ্চাতে একপ্রকার শব্দও শুনিতে পাইলেন। আর কি? ঐ এল্যান্ ক্যামেরন! ভয়ে আরো দশগুণ দৌড়িতে লাগিলেন। ররী বেচারা দেখিল বড় বিপদ! ফেলিয়াই বুঝি গেল। কি করে, তারও প্রাণপণ চেষ্টা। মাস্টারমহাশয় দেখিলেন, পাছেরটা আসিয়া ধরিয়াই ফেলিল। তাঁহার যে আর রক্ষা নাই, তখন তিনি সাহস ভর করিলেন এর খুব শক্ত করিয়া লাঠি ধরিয়া সেই কল্পিত ভূতের মস্তকে ‘সপাট’-সাংঘাতিক এক ঘা! তারপর সেটাও যেন কোথায় অন্ধকারে অদৃশ্য হইল।’

‘ভূতটা যাওয়াতে এখন একটু সাহস আসিল, কিন্তু তথাপি যতক্ষণ গ্রামের আলোক না দেখা গেল, ততক্ষণ থামিলেন না। গ্রামে প্রবেশ করিবার পূর্বে সাবধানে ঘাম মুছিয়া ঠাণ্ডা হইয়া লইলেন। মনটা যখন নির্ভয় হইল, তখন ঘরে গেলেন-যেন বিশেষ একটা কিছু হয় নাই। অনেক কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তিন সকলগুলিরই উত্তরে বলিলেন’-

‘ঐ আমি যা বলেছিলাম, ভূতটুত কিছুই ত দেখতে পেলাম না!’

‘এরপর মুচির জন্য সকলে অপেক্ষা করিতে লাগিল। মাস্টারকে তাহারা বলিল যে, সে স্থানান্তরে গিয়াছে, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে।’

‘আধ ঘণ্টা হইয়া গেল, তবু মুচি আসে না। সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। চিন্তা বাড়িতে লাগিল, ক্রমে একটা বাজিল। তারপর আর থাকিতে পারিল না, মুচির অনুপস্থিতির কারণ তাহারা মাস্টারমহাশয়কে বলিয়া ফেলিল। মাস্টারমহাশয় শুনিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। লাফাইয়া উঠিয়া লণ্ঠন হাতে করিয়া দৌড়িয়া বাহির হইলেন এবং সকলকে পশ্চাৎ আসিতে বলিয়া দৌড়িয়া চলিলেন।’

সকলেরই বিশ্বাস হইর, মাস্টারমহাময়ের বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। হৈ চৈ কাণ্ড! সকলেই জিজ্ঞাসা করে, ব্যাপারটি কি? তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির আসিয়া তাহারা মাস্টারকে দাঁড়াইতে বলিতে লাগিল। তাঁহাদের শব্দ শুনিয়া কুকুরগুলি ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল। কুকুরে গোলমালে গাঁয়ের লোক জাগির। সকলেই জিজ্ঞাসা করে, ব্যাপারখানা কি?’

‘এই সময়ে মাস্টারমহাশয় জলার মধ্য দিয়ে দৌড়িতেছেন। মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে- কেবল পুলিস-ম্যাজিস্ট্রট-জুরী-ইত্যাদি ভয়ানক বিষয় মনে হইতেছে। তাঁহার লণ্ঠনের আলো দেখিয়া অন্যেরা তাঁহার পশ্চাৎ আসিতেছে।’

‘সকলে তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহাকে ধরিল এবং ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। মাস্টারমহাশয়ের উত্তর দিবার পূর্বেই সেই মাঠের মধ্য হইতে গালি এবং কোঁকানি মিশ্রিত একপ্রকার শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। কতদূর গিয়া দেখা গেল, একটা লোক জলার ধারে বসিয়া আছে। লণ্ঠনের সাহায্যে নির্ধারিত হইল যে এ আর কেহ নহে, আমাদের সেই মুচি। সেইখানে বেচারা দুই হাতে মাথা চাপিয়া বসিয়া আছে আর তাহাদের মাস্টারমারের উদ্দেশে গালাগালি দিতেছে। তাহার নিকট হইতে সকলে সমস্ত শুনিল।’

‘শেষে অনুসন্ধানে জানা গেল যে ঐ বাড়ির জানালার ঠিক সম্মুখে একটা ছোট গাছ ছিল। তাহারই ছায়া চন্দ্রের আলোকে দেয়ালে পড়িত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে সেই ছায়ার আকৃতি দেখিতে ঠিক ক্যামেরনের মুখের মত। সেদিন চন্দ্র ছিল না, মাস্টারমহাশয় সেই ছায়া দেখিতে পান নাই।’

সাগর কেন লোনা?

এক যে ছিল রাজা, তার নাম ফ্রদি। তার ছিল একটা যাঁতা, তাকে বলত গ্রত্তি। সে যাঁতা যেমন তেমন যাঁতা ছিল না, তাকে ঘুরিয়ে যে জিনিস ইচ্ছা, তাই তার ভিতর বার করা যেত।

for more books visit www.rashal.com

কিন্তু ঘোরাবে কে? সে যাঁতা ছিল পাহাড়ের মত বড়। রাজার চাকরেরা সেটা নাড়তেই পারল না। রাজার দেশে যত জোয়ান ছিল, সকলে হার মেনে গেল, সে যাঁতা কিছুতেই ঘুরবার নয়।

রাজার মনে বড় দুঃখ। ভেবেছিলেন, যাঁতা ঘুরিয়ে কত হীরা-মাণিক বার করে নেবেন। কিন্তু, হায়! যাঁতা আর ঘুরল না!

এমনি করে দিন যায়। তারপর একবার বিদেশে গিয়ে তিনি দুটি দানবের মেয়েকে দেখতে পেলেন। তারা দুটি বোন। একজনের নাম মেনিয়া, আর একজনের নাম ফেনিয়া। তারা চলতে গেলে মাটি কাঁপে, বসতে গেলে গর্ত হয়ে যায়। তাদের দেখে রাজা ভাবলেন-'এইবার আমার যাঁতা ঠেলাবার লোক জুটেছে।'

তখন রাজা খুশি হয়ে মেনিয়া-ফেনিয়া কিনে নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। এসেই তাদের দুজনকে যাঁতার কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন- 'ঠেল, ঠেল, ঠেল। সোনা বেরোক, রূপো বেরোক, ঠেল, ঠেল!'

মেনিয়া আর ফেনিয়া যাঁতা ঠেলতে লাগল আর গাইতে লাগলঃ-

'আয় সোনা-হুঁই রে হাঁ!
আয় রূপো-হুঁই রে হাঁ!
ফ্রদির ঘরে-হুঁই রে হাঁ!
সিন্দুক ভরে হুঁই রে হাঁ!'

দেখতে দেখতে সোনা-রূপোয় রাজার বাড়ি ভরে গেল, তবু খালি বলেন-'ঠেল, ঠেল, ঠেল!'

দিনের পর দিন যাঁতা ঠেলতে ঠেলতে মেনিয়া-ফেনিয়া কাহিল হয়ে পড়ল, তাদের পিঠে ধরে গেল, অবশ হয়ে এল, তবু রাজা খালি বলছেন-'ঠেল, ঠেল, ঠেল!' তখন কাজ ত করিয়ে নেবেই। কিন্তু মনে মনে তাদের বড্ড রাগ হল।

একদিন রাজা খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে আছেন, মেনিয়া-ফেনিয়া যাঁতা ঠেলছে। ঠেলতে ঠেলতে তারা বলল-'দাড়াও, এই বেলা একটু মজা দেখাচ্ছি!' বলে তারা গাইতে লাগল-

'আয় ডাকাত-হুঁইরে হাঁ!
হাজার হাজার-হুঁইরে হাঁ!
মার মার-হুঁইরে হাঁ!
লাগা আগুন-হুঁইরে হাঁ!'

অমনি হাজারে হাজারে ডাকাত এসে দেশ ছেয়ে ফেলল। তারা জাহাজে চড়ে সাগর পার হয়ে দেশ বিদেশে ডাকাতি করে বেড়ায়, তাদের বলে বোম্বেটে , তাদের সঙ্গে কেউ পারে না।

রাজা ঘুমুতেই লাগলেন। ডাকাতেরা তাঁদের সকলকে মেরে, যত টাকা কুড়ি লুটে নিয়ে গেল, মেনিয়া-ফেনিয়া শুদ্ধ সেই যাঁতাটাও নিয়ে জাহাজে তুলল।

তারপর ডাকাতদের সর্দার বলল-'বাঃ বেশ হয়েছে। যাঁতাটার ভিতর থেকে যা চাই তাই বেরোবে! টাকা কড়ি ত আমারে ঢের আছে-নাই খালি নুন। এবারে আমাদের নুনের দুঃখ দূর হবে। ঠেল, ঠেল, ঠেল,-নুন বেরোক, নুন, নুন!'

মেনিয়া-ফেনিয়া যাঁতা ঠেলতে লাগল, আর কেবল নুন বেরোতে লাগল। নুন, নুন আর নুন! শেষে জাহাজ একেবারে ডুবেই গেল। সব ডাকাত তার সঙ্গে ডুবে মরল।

সেই ভয়ঙ্ক যাঁতা ডুববার সময়ে কি যে কাণ্ড হয়েছিল, কি বলব! সাগরের জল গর্হ হয়ে, হড়-হড় শব্দে জল তার চারদিকে ঘুরপাক খেতে লাগল,-যে ঘুরুনি আজো থামে নি!

for more books visit www.rashal.com

আর সেই লবণের কি হল? আর হবে? সেই নুন সমুদ্রের জল ভেসে গেল। দুই দানবীতে মিলে কম নুন তোর বার করে নি, সাগরের সব জল তাতে লোনা হয়ে গেছে।

আমার কথায় বিশ্বাস না-হয়, মুখে দিয়ে দেখে আসতে পার।

ভীতু কামা (জুলু দেশের গল্প)

এক যে ছিল ছোট ছেলে, তার নাম ছিল কামা। সে এতটুকু মানুষ ছিল, তার পেটটি ছিল বড়, হাত-পা ছিরল কাঠি কাঠি। সে অন্য ছেলেদের সঙ্গে জোরে পারত না, খেলতে গেলে খালি তাদের হাতে মার খেত। বেচারা চুপ করে সে সব সয়ে থাকত, তার গায়ে জোর ছিল না, কাজেই কি নিয়ে ঝগড়া করবে? তার ইচ্ছা হত যে সে খুব ভারি ভারি কাজ করে, খালি গায় জোর ছিল না বলে সেসব কিছু করতে পারত না।

গ্রামের লোকেরা তাকে বলত ভীতু কামা। তারা চাইত যে, গ্রামের ছেলে পিলে খুব ষণ্ডা আর সাহসী হয়। তাদের সর্দার যখন দেখল যে কামা তার কিছুই হচ্ছে না, তখন সে তাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিল।

কামা ভাবল-ওমা! কি হবে? আমি কোথায় যাব? গ্রাম থেকে ত আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এখন পরীর পাহাড়ে গিয়ে দেখি, পরীরা আমাকে কি করে!

সে দেশে একটা গোলপানা পাহাড় ছিল, তাতে পরীরা থাকত! সেখানকার লোকেরা তাদের ভয়ে কেউ সেখানে যেত না। কামা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সেই পরীর পাহাড়ে গিয়ে উপস্থিত হল, আর অমনি খুদে খুদে কালো সব পরী এসে তাকে ঘিরে ফেলল। তারা জুলু দেশের পরী কিনা, তাই কালো, তাদের ফড়িং-এর মতন ডানা আর হাতে ঢাল আর বর্শা। কামাকে তাদের পাহাড়ে আসতে দেখে তারা এমনি চটেছে যে কি আর বলব। তাদের রাজা এসে তাকে বলল-'তুই যে আমাদের পাহাড়ে এলি? দাঁড়া, এখনি তোকে মেরে ফেলছি।'

কামা কাঁপতে কাঁপতে হাতজোড় করে বলল-'দোহাই রাজামশাই, আমাকে মারবেন না। আমি ভীতু কামা, আপনাদের কোন ক্ষতি করবার ক্ষমতা আমার নাই, আমাকে মেরে কি হবে?

পরীর রাজা বলল-'বটে? তুই ভীতু কামা? হাঁ হাঁ, তোর কথা শুনেছি বটে। তোর গায় জোর নাই, কিন্তু তোর মনটাতে সাহস আছে। আচ্ছা বাছা, তোর আর অমনি করে ভয়ে কাঁপতে হবে না, আমি তোকে পালোয়ন করে দিচ্ছি।'

বলে পরীর রাজা মাটিতে একটা সিংহের চামড়া বিছিয়ে কামাকে বলল-'এর উপর শুয়ে একটু ঘুমো দেখি?' কামা সেই সিংহের চামড়ার উপরে ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর যখন তার ঘুম ভেঙ্গে ছে, তখন সে দেখে, তার আর সেই কাঠি কাঠি হাত পা নাই, সে ভারি এক পালোয়ান হয়ে গেছে। আর তার মনে হচ্ছে, যেন সে এক থাপ্পড়ে হাতি মেরে ফেলতে পারে!

তখন কামা চারদিকে চেয়ে দেখল যে, সেই পাহাড়ের উপর সে একলাটি দাঁড়িয়ে আছে। পরীদের একজনও সেখানে নাই, তার জন্য মস্ত বড় ঢাল আর বর্শা রেখে কোথায় চলে গেছে।

সেই ঢাল আর সেই বর্শা হাতে করে কামা পাহাড় থেকে নেমে ঘরের দিকে চলল। খানিক দূর এসে সে দেখল যে ভয়ঙ্কর একটা সিংহ হাঁ করে তাকে খেতে এসেছে। সে কি আর এখনর সিংহকে ডরায়? তার বর্শার এক খোঁচা খেয়েই সেই সিংহ জিব বার করে, চোখ উলটিয়ে মরে গেল।

সেই সিংহটাকে কাঁধে ফেলে, ঢাল আর বর্শা হাতে যখন কামা গ্রামে এসে উপস্থিত হয়েছে, তখন ত তাকে দেখে আর কারুর মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। গ্রামের জোয়ানেরা এসে তার ঢাল আর বর্শা আর সিংহটাকে নিয়ে কত টানাটানি করল, কিন্তু কেউ তাকে একটু নাড়াতেও পারল না!

for more books visit www.rashal.com

গ্রামের সর্দার আগে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, এখন সে তাকে কি করে আদর দেখাবে, তাই ভেবে ঠিক করতে পারছে না! তখনি সে তাকে একখানি ঘর আর অনেকগুলি ষাড় দিয়ে দিল।

এখন আর কামার কোন দঃখ নাই। সে সেই ঘরখানিতে তার মাকে নিয়ে থাকে। আগে যারা বলত 'ভীতু কামা'-এখন তারা বলে 'কামা পালোয়ান।'

for more books visit www.rashal.com